অখণ্ড সংহিতা বা

চতুর্ব্বিংশ খণ্ড

শ্রী শ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের

উপদেশ - বাণী

ওঁ

অখণ্ড-সংহিতা

বা

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের

উপদেশ-বাণী

চতুর্ব্বিংশ খণ্ড

তৃতীয় সংস্করণ, মাঘ, ১৪১৪

ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী

ও

ব্রহ্মচারী স্নেহময়

সম্পাদিত।

—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—

—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, লাক্সা, বারাণসী-১০

ধর্ম্মার্থ শুল্ক : পঁচাশি টাকা (মাশুলাদি স্বতন্ত্র)

মুদ্রণ-সংখ্যা ২,০০০ (দুই হাজার)
প্রকাশক—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী

প্রিন্টার :—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী,
অযাচক আশ্রম প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
ডি ৪৬/১৯এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, রামাপুরা,
বারাণসী-২২১০১০, দূরভাষ : (০৫৪২) ২৪৫২৩৭৬

: পুস্তকসমূহের প্রাপ্তিস্থান :

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-২২১০১০ (উত্তর প্রদেশ)

গুরুধাম
পি-২৩৮, সি-আই-টি রোড, কাঁকুড়গাছি,
কলকাতা-৭০০০৫৪ ● দূরভাষ-২৩২০-৮৪৫৫

অযাচক আশ্রম
"স্বরূপ ভবন", ৯৯, হাসপাতাল রোড, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং

অযাচক আশ্রম
পোঃ মনুপুর, ধর্মনগর, ত্রিপুরা (উত্তর)

অযাচক আশ্রম
২০বি, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা (পশ্চিম)
দূরভাষ : (০৩৮১)২৩২৮৩০৫

অযাচক আশ্রম
হাসপাতাল রোড, শিলচর-৭৮৮০০১, দূরভাষ : (০৩৮৪২) ২২০০০০
"স্বরূপ কুঞ্জ" : হীরাপুর, ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড ● দূরভাষ-০৩২৬ ২২০৩২২৮

দি মাল্টিভার্সিটি
পোঃ—পুপুন্কী আশ্রম, জেলা—বোকারো, ঝাড়খণ্ড, পিনকোড : ৮২৭০১৩

ডাকে নিতে হইলে ২৫% অগ্রিম মূল্যসহ বারাণসীতেই পত্র দিবেন।

চতুর্ব্বিংশ খণ্ডের নিবেদন

"অখণ্ড-সংহিতা" ২৩শ খণ্ড পর্য্যন্ত ইতোমধ্যে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। এই মহাগ্রন্থ স্বমর্য্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত। সুতরাং ইহার পরিচয়-প্রসঙ্গে কোন কথা বলিবার প্রয়োজন দেখি না। যে কোনও এক খণ্ডের আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে সহৃদয় পাঠক নিজ-গুণেই তাহা অবগত হইবেন। দেশে সদ্‌গ্রন্থ-পাঠকের অভাব, ইহা কোনও যুক্তিই নয়। সদ্‌গ্রন্থের একান্ত অভাব, ইহা হয়ত সত্য। সদ্‌গ্রন্থকে সর্ব্বজনের সম্মুখে যোগ্য ভাবে উপস্থাপিত করিবার দক্ষতার আমাদের অভাব, ইহা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত কথা। যাহা পাঠ করিলে সঙ্কুচিত চিত্ত প্রসার লাভ করিবে, মনোবুদ্ধি স্ফূর্ত্তির দীপ্তি পাইবে, স্বার্থ-পরায়ণা রুচি পরার্থ-প্রাণতা লাভ করিবে, তেমন গ্রন্থ অন্ধ অভিভাবকেরা কিশোর পুত্রকন্যাদের হাতে তুলিয়া ধরিতে মোটেই আগ্রহী নহেন, ইহা ততোধিক গুরুতর সমস্যা। তদুপরি আমরা ভিক্ষা করি না, চাঁদা তুলি না, অভাবের কথা কাহারো নিকটে প্রকাশ করি না, এই জন্য আমাদের যাত্রাপথ বড়ই দুর্গম।

আচার্য্যবরিষ্ঠ শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব আমাদিগকে পথ দেখাইয়াছেন স্বাবলম্বনের, মন্ত্র দিয়াছেন অভিক্ষার, ব্রত দিয়াছেন অযাচকত্বের,—সুতরাং এই খণ্ডখানা প্রকাশিত হইতে হইতে ১৩৮৬ সনের বৈশাখ মাস হয়ত আসিয়া যাইবে। অবশ্য ইহার বিশেষ বিশেষ বাণীগুলি মাসিক পত্রিকা "প্রতিধ্বনি"র মারফত গড়ে প্রতিমাসে পনের বিশ

হাজার গ্রাহকের নিকটে পৌঁছিতে থাকিবে। ঐটুকুই আমাদের সান্ত্বনা। "প্রতিধ্বনি" চরিত্র-গঠন-আন্দোলনের মুখপত্র। কিমধিকং ইতি—বৈশাখ, ১৩৮৫

বিনীত—

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ স্ট্রীট
বারাণসী

ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
ব্রহ্মচারী স্নেহময়

অখণ্ড-সংহিতা চতুর্ব্বিংশ খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

দীর্ঘ সাত বৎসর পরে চতুর্ব্বিংশ খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইল। প্রথম সংস্করণ বৈশাখ ১৩৮৫ সনে দুই হাজার ছাপা হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণে প্রকাশিত 'অখণ্ড-সংহিতা' চতুর্ব্বিংশ খণ্ডের ইহা হুবহু পুনর্মুদ্রণ মাত্র। দ্বিতীয় সংস্করণে ইহা পাঁচ হাজার মুদ্রিত হইল। দুই হাজারখানা বিক্রয়ের জন্য রাখিয়া বাকী তিন হাজার খানা বিতরণের জন্য রাখা হইল। অখণ্ড-সংহিতার বিশেষত্ব-সমূহ সম্পর্কে অন্যান্য খণ্ডের নিবেদনেই যাহা বলিবার বলা হইয়াছে।

এক লক্ষ অখণ্ড-সংহিতা বিনা মূল্যে বিতরণের মহৎ প্রকল্প সংসাধনের জন্য যাঁহারা নিঃস্বার্থভাবে দান করিতেছেন, সেই সকল মহানুভব দাতাদের দানের পরিমাণ ও নামের তালিকা "প্রতিধ্বনি" মাসিক পত্রিকায় নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে এবং হইতেছে।

অখণ্ড-সংহিতা বাণী-সমূহকে গ্রামে গ্রামে, গৃহে বহন করিয়া নিবার জন্য আমাদের প্রকাশিত "প্রতিধ্বনি" মাসিক পত্রিকা বিগত ৩৩ বৎসর যাবৎ "অখণ্ড-বাণী" নামে প্রকাশিত করিয়া সাধ্যমত নিজ কাজ করিয়া যাইতেছে। ইতি—অগ্রহায়ণ, ১৩৯১ বাংলা।

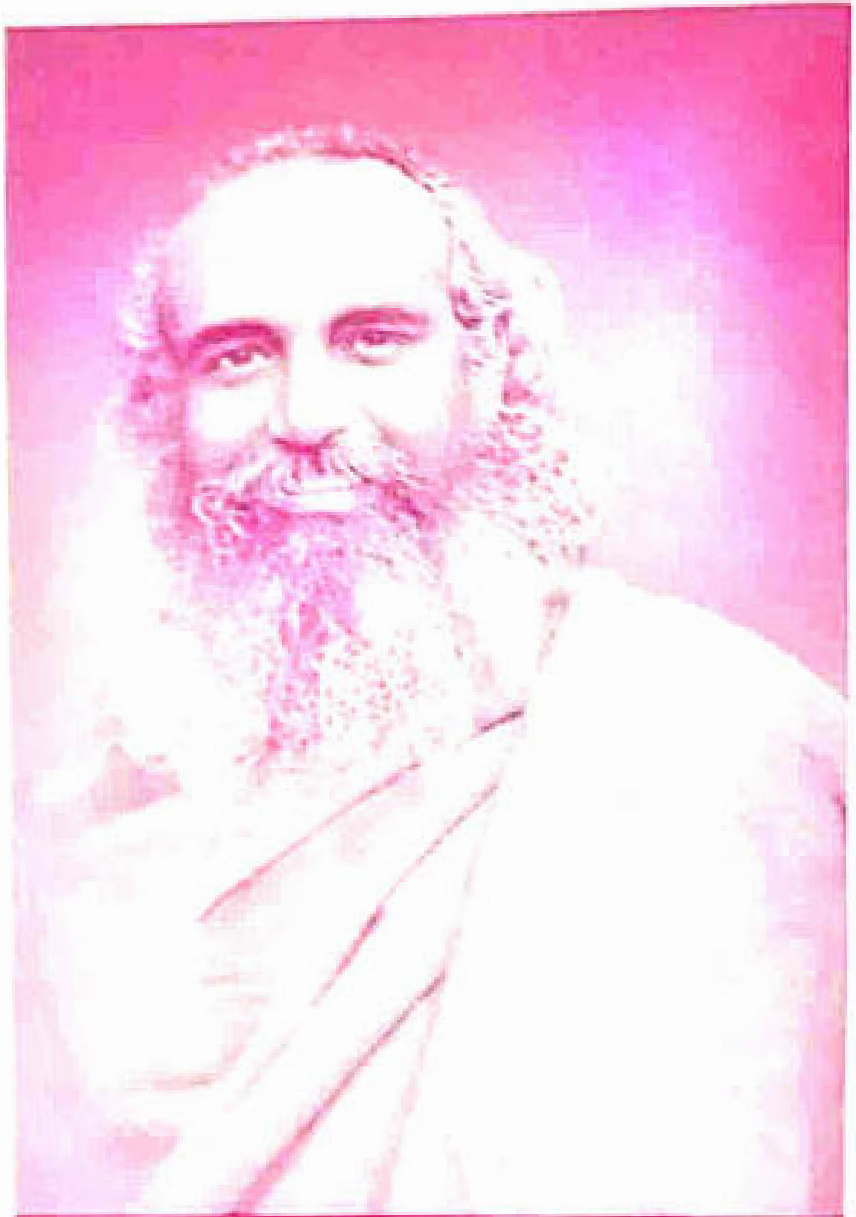
বিনীত—

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ স্ট্রীট

ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
ব্রহ্মচারী স্নেহময়

তৃতীয় সংস্করণের নিবেদন

অযাচক সন্ন্যাসী, ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম্মের অভিনব সমন্বয়কারী, স্বাবলম্বনের মূর্ত্ত বিগ্রহ, মহাকর্ম্মযোগী, সমদর্শী, স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে আচণ্ডাল ব্রাহ্মণে মহাওঁকার মন্ত্র ও ব্রহ্মগায়ত্রী মহামন্ত্রের অধিকার প্রদাতা, অসাম্প্রদায়িকতার মূর্ত্ত প্রতীক, আবাল্যব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারী ও ব্রহ্মচর্য্যের প্রচারক, অনন্য চরিত্রগঠন আন্দোলনের প্রবর্ত্তক, সুমহৎ অখণ্ডআদর্শ ও অখণ্ডসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা, অযাচক আশ্রম নামক অভিনব সেবা প্রতিষ্ঠান এবং দি মালটিভারসিটি নামক অনবদ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্রষ্টা, জগৎকল্যাণ-অভীপ্সাকে ব্রাহ্মণত্বের লক্ষণ স্বরূপ নির্দ্দেশকারী ও জগৎকল্যাণসাধনে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্তকে উৎসর্গকারী, ভবিষ্যৎ দেবমানবজাতির স্বপ্নদ্রষ্টা এবং সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়ণের পথনির্দ্দেশক বিশ্বত্রাতা


অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ওঁ

অখণ্ড-সংহিতা

বা

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ

পরমহংসদেবের

উপদেশ-বাণী

(চতুর্ব্বিংশ খণ্ড)

লাকসাম (ত্রিপুরা)
৩২শে আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ১৩৪৩
(১৬ই জুলাই, ১৯৩৬)

সন্তানের চরিত্র-গঠনে পিতামাতাই মূলাধার

প্রাতের ট্রেণে অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব লাকসাম পৌঁছিয়াছেন। বেলা সাড়ে তিন ঘটিকায় লাকসাম হাইস্কুলের মাঠে বিশাল জনতার সমক্ষে

একটী জনসভা হইল। স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী সভাপতিত্ব করিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পুত্রকন্যা যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন পিতামাতার মনে কত না আনন্দ! কত না উচ্ছ্বাস! কত না স্নেহাকুল আবেগ! কিন্তু ক্ষণকাল পরেই তাঁদের অন্তরে এই শঙ্কা জাগে, হবে ত' এরা মানুষ! মানুষ হ'লে ত' বংশ উজ্জ্বল হ'ল। কিন্তু মানুষ না হ'য়ে যদি হয় জন্তু-জানোয়ার, তবে ত' বংশের নাম ডুবল। চিন্তাশীল পিতামাতার মনে এই প্রশ্ন জাগে যে, এদের প্রকৃত জন্মকালে অর্থাৎ মাতৃগর্ভে প্রবেশ-কালে ছিলাম ত' আমরা পবিত্র চিন্তার অনুশীলনে ব্রতী? পিতামাতা যখন সন্তান-জননকালে পুণ্যময়ী চিন্তার অনুশীলন করেন, তখন স্বভাবতই এমন জীবাত্মা মাতৃজঠরে ভ্রূণ-রূপে প্রবেশ করে, যার পূর্ব্ব-জীবনে সংকৃতিত্ব, পুণ্যানুষ্ঠান এবং অশেষ সাত্ত্বিকতা ছিল। অর্থাৎ বর্ত্তমান পিতামাতার সচ্চিন্তানুশীলনের শুভফলে পূতিগন্ধময় অন্ধকার নরকও দেবজন-বাঞ্ছিত বৈকুণ্ঠ-ধামের সৌরভ, সৌন্দর্য্য ও মর্য্যাদা আহরণ করে। সুতরাং তোমাদের কাছে ব্রহ্মচর্য্যের কথা বলতে আসার আগে আমার উচিত ছিল, তোমাদের পিতামাতাদের কাছে যাওয়া। জনে জনে কথা শোনাতে হ'লে তোমাদের ঘরে ঘরে যেতে হয়। কিন্তু আমার জীবনের পরমায়ু কতটুকু? তোমাদের পিতামাতারাও গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত, বিব্রত। তাই, তোমাদেরই আজ শোনাবো আমার কথাগুলি এবং প্রত্যাশা করব, এর ফলে তোমাদের প্রত্যেকের ভবিষ্যদবংশীয়েরা উত্তোরোত্তর অধিকতর শুভ-

সম্ভাবনা নিয়ে জগতে জন্মগ্রহণ করবে। চরিত্র-গঠনের ব্যাপারে পিতামাতা, পিতামহ-পিতামহী, প্রপিতামহ-প্রপিতামহী প্রভৃতির অন্তরে সঞ্চিত হ'য়ে রয়েছে ভবিষ্যতের যাবতীয় গৌরব,—এই ব্যাপারে পিতামাতাই মূলাধার। তোমরা প্রত্যহ পিতৃমাতৃ-প্রণাম কত্তে ভুলে যেয়ো না।

চরিত্র-গঠন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমি যে চরিত্রবান্ হচ্ছি, তার প্রমাণ কিসে পাব? কালকে আমি যা ছিলাম, আজকে আমি তার চাইতে ভাল হয়েছি কিনা, হচ্ছি কিনা, নিয়মিত ভাবে এইটী অনুসন্ধান ক'রে যাওয়ার নামই চরিত্র-গঠন। কালকে আমি তিনটা মিথ্যা কথা বলেছি, আজকে আমি মাত্র দুটা মিথ্যা ব'লেই রেহাই পেলাম, এইখানে আমার চরিত্রোন্নতির সূচনা। কালকে আমি দশটা কুকথা বলেছিলাম, আজকে বিশটা বলার মত প্রলোভন ছিল কিন্তু বলিনি, প্রাণপণ যত্নে রসনা সম্বরণ করেছি, মাত্র তিনটা কুকথা ব'লেই রেহাই পেয়েছি। নিশ্চয়ই আমার চরিত্রোন্নতি হচ্ছে। কাল থেকে আমৃত্যু যাতে আর একটাও কুকথা না বলি, তার জন্য আমি চেষ্টায় রত হলাম এবং এজন্য জিদ করলাম,—আমার চরিত্রগঠন আরম্ভ হ'ল। কালকে আমি একটা কুকাজ করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু লোকে দেখে ফেলবে ভয়ে কুকাজ করিনি,—আজকে কুকাজ করার যথেষ্ট সুযোগ ছিল, প্রলোভন ছিল কালকের চাইতে

প্রবলতর, কেউ দেখে ফেলবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না, তবু আমি কুকাজ করিনি। বুঝতে হবে আমার চরিত্র উন্নতির দিকে চলেছে। ইন্দ্রিয়-চর্চ্চা, পরদ্রব্য অপহরণ, মদ্যপান প্রভৃতি সবই নিতান্ত জঘন্য কুকার্য্য। কেউ দেখতে পায়নি ব'লেই এ সকল পাপকার্য্য সৎকার্য্য হয় না। কেউ জানতে পাবে না ব'লেই অন্যায় কখনো পুণ্যকার্য্যে পরিণত হয় না। এই বোধকে অন্তরে জাগ্রত রেখে সদা সতর্ক ভাবে চলতে পারলে তুমি হবে চরিত্রবান্! দেশ চরিত্রবান্ নরনারী চায়।

চরিত্রহীন জাতি চির-পরাধীন থাকে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যার যা বৈধ ভাবে প্রাপ্য নয়, সে যদি তা পেতে চায়, তবে তাকে অসচ্চরিত্রতার পথে নামতেই হয়। পুরুরাজকে জব্দ করার জন্য সিন্ধুরাজ আলেক্‌জাণ্ডার দি গ্রেটকে আমন্ত্রণ ক'রে এনেছিলেন। ফল শুভ হয় নি, পৃথ্বীরাজকে নাকাল করার জন্যে জয়চাঁদ মহম্মদ ঘোরীকে ডেকে এনেছিলেন, ফল শুভ হয় নি। সিরাজউদ্দৌলার সিংহাসনটী কেড়ে নেবার জন্য মীরজাফর ইংরাজকে ডেকে এনেছিলেন। ফল হয়েছে পৌনে দু'শ বৎসরব্যাপী পরাধীনতা। কেউ কেউ মনে করে, এই পরাধীনতা আমাদের পক্ষে উত্তম, কেউ কেউ মনে করে, "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়?" দুই দলের

মধ্যে কারা সত্যচিন্তক, ইতিহাস একদিন তা ব'লে দেবে। আমাদের তা ব'লে দরকার নেই। অপেক্ষা করাই ভাল। কিন্তু ভারত যেদিন স্বাধীন হবে, একদিন ত' হবেই, তখন যদি নেতারা হন চরিত্রহীন, লোভী, কামুক, প্রতিহিংসা-পরায়ণ, দিগ্বিদিক্-বিবেচনা-বর্জ্জিত অমানুষ, তাহ'লে বড় মাছগুলি ছোট মাছগুলিকে গিলে গিলে খাবে, নির্ব্বিচারে অনাচার ক'রে চলবে। মুষ্টিমেয় কয়েক জনের বেপরোয়া উচ্ছৃঙ্খলতার নিগড়ে শক্তিহীন, বুদ্ধিহীন, ঐক্যহীন জাতি একটার পর একটা ক'রে নূতন নিগড়ে আবদ্ধ হ'তে থাকবে। পাঠান যুগেও আমাদের চরিত্রের আবশ্যকতা ছিল, মোগল যুগেও আমাদের চরিত্রের আবশ্যকতা ছিল, মারাঠা, মহীশূর, শিখ অভ্যুদয়ের যুগেও চরিত্রের আবশ্যকতা ছিল। আজকের এই ইংরাজ আমলেও চরিত্রের আবশ্যকতা পড়েছে। ভারত যখন স্বাধীন হবে, তখনও চরিত্রের আবশ্যকতা বিন্দুমাত্র কমবে না। যতক্ষণ চরিত্র আছে, ততক্ষণই আমরা বেঁচে আছি। যখন চরিত্র-ধন যাবে, তখন আমাদের সব যাবে।

বক্তৃতা তিন ঘণ্টাকাল চলিল।

লাকসাম

১লা শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৩৪৩

(১৭ই জুলাই,, ১৯৩৬)

লাকসামের ঠিকানায় শ্রীশ্রীবাবামণির নামে অনেক চিঠিপত্র আসিয়া জমিয়া রহিয়াছে। শেষ রাত্রে শয্যাত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি লেখনী লইয়া বসিলেন।

মহামানবের মহাভাবনা

ঢাকা কালীগঞ্জ-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আমার ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কাজ করিতে লিখিয়াছ, কিন্তু বাছা, তুমি কি জান যে, বড় বড় মহামানবেরও নিজ নিজ সৃজিত প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেক দুশ্চিন্তা আছে? তিনটী ত্রিলোকবিজয়ী বাঙ্গালী মহাজন ভারতের তিনটী স্থানে তিনটী পৃথিবীখ্যাত প্রতিষ্ঠান গড়িয়াছেন,—বেলুড় মঠ, শান্তি-নিকেতন ও পণ্ডিচেরী আশ্রম। কি হইবে ইহাদের ভবিষ্যৎ, মনে কি করিতেছ যে, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দকে তাঁহাদের ভবিষ্যৎ নিয়া কখনো অপার দুশ্চিন্তায় পড়িতে হয় নাই বা হইবে না? যিনি যাহাকে যেই রূপে চাহিয়াছিলেন, তিনি তাহাকে সেই রূপে পাইয়াছেন বা পাইবেন কি? কে হইবে প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ কর্ণধার, এবং সেই নূতন নায়কত্বে প্রতিষ্ঠান কোন্ দিকে গতি লইবে, কি তাহার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটিবে, এসকল সম্পর্কে তাঁহারা কি উদাসীন থাকিতে পারিয়াছেন বা পারিবেন? হাঁ, মানুষ তাহা পারে এবং পারে মাত্র তখন, যখন দেখিতে পায় যে, নিজ বুদ্ধি, বিবেচনা, অভিজ্ঞতা, অনুমান ও প্রয়াস-সামর্থ্যের বাহিরে সব ব্যাপার চলিয়া যাইতেছে এবং এখন আর পরমেশ্বরে পরম নির্ভর না দিয়া কোনো উপায় নাই। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দ,—ইঁহারা সকলেই মানুষ।

মানুষ মাত্রেরই যাহা স্বভাব-ধর্ম্ম, তাঁহাদের মধ্যে তাহার বিদ্যমানতা স্বাভাবিক। সুতরাং অবস্থা বেহাল দেখিয়া ইঁহাদের মতন বিরাট পুরুষের মহৎ ব্যক্তিত্বও যদি স্তব্ধ হইয়া শেষ পর্য্যন্ত অজানা মহাশক্তির অজ্ঞাত ইচ্ছার হাতে সব ছাড়িয়া দিতে হয়, তবে তাহা অসঙ্গত বা অনুচিত কিছু হয় না। আমি এইরূপ অনুমান করিতেছি। ইঁহারা অসাধারণ ঈশ্বর-পরায়ণ বলিয়া ঈশ্বরের চূড়ান্ত বিধানকে মান্য করিয়া অন্তরে আত্মপ্রসাদ আহরণ করিতে পারেন। ইহাই ইঁহাদের দেবত্ব। যেখানে বড় বড় প্রতিষ্ঠানের স্রষ্টারা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের ভবিতব্য সম্পর্কে একেবারেই অসহায়, সেখানে আমার মতন সামান্য এক অভিক্ষাপন্থী নগণ্য কর্ম্মীর গড়া প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ কি হইবে বা হইতে পারে, তাহা নিয়া গবেষণা করিবার মত আমার কি রুচি বা প্রবণতা হইতে পারে? ভবিষ্যতের ব্যাপারে আমি কিছু হয়ত আশা পোষণ করিতে পারি কিন্তু প্রকৃত ভবিতব্যটুকুকে আমি ছক্ কাটিয়া তাহার নক্সা আঁকিব কি করিয়া? আমার লক্ষ্য দেবজাতির আবির্ভাব। আমার আকিঞ্চন তজ্জন্য আপ্রাণ প্রয়াস। আমার চেষ্টা সেই প্রয়াসে সমস্ত দেহ-মনঃ-প্রাণ অর্পণ করিয়া নিজ সুখ, নিজ শান্তি, নিজ তৃপ্তি ভুলিয়া যাওয়া। আমি তোমাকে মাত্র অতটুকুই বলিতে পারি। সম্রাট শাহ্জাহান তাঁর পুত্র আওরঙ্গজেবকে বাদশাহী পরিচালনার যোগ্য করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং সাম্রাজ্য পরিচালনার যোগ্য একটী মানুষ তৈরীও করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি কি ঘুণাক্ষরেও

(অঃ সং ২৪)—২

জানিতেন যে, তিনি তাঁর এই পুত্র দ্বারাই বন্দী হইয়া দুর্দ্দশায় শেষ জীবনের বাকী কয়টা দিন কাটাইতে বাধ্য হইবেন?

তোমাদের পন্থা নির্ব্বিরোধ

ঢাকা ব্রজযোগিনী-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমাদের পন্থা নির্ব্বিরোধ। সুতরাং তোমরা কোনও অবস্থাতেই পরনিন্দায় লিপ্ত হইতে পার না। বলিতে পার যে, সত্য উদ্ঘাটনের নাম নিন্দা নহে, বরং উহার নাম দেওয়া উচিত যথার্থ ভাষণ। এই কথার যাথার্থ্য আমি অস্বীকার করি না। যখন ব্যাপারটা একটা সাধারণ মানুষ সম্পর্কে ঘটে, তখন অন্যের অগোচরে গোপনে তাহাকে কথাটি এই উদ্দেশ্যে বলিতে পার যে, তার চরিত্রের সংশোধন ঘটুক। যখন জনপ্রিয় মহামান্য কোন সুখ্যাত ব্যক্তি সম্পর্কে ঘটে, তখন সহসা কোন কাজ করিতে নাই। তখন হিসাব করিয়া কথা বলিতে না পারিলে দ্বন্দ্ব, সংঘাত, সংঘর্ষ ও প্রাণান্তকর বিবাদ অবশ্যম্ভাবী। এই সব ক্ষেত্রে কাল-প্রতীক্ষা করিতে হয়। দেখিতে হয় মূল অভিনেতা মহাশয় নিজের ভুল-চালেই হঠাৎ একদিন কুপোকাৎ হন কিনা। তাঁহার পাপের সঙ্গীরাই তাঁহাকে জনসমক্ষে ধরাইয়া দেয় কিনা। যখন এই সকল ঘটনা কোন মঠ, আশ্রম বা মন্দিরাদি সম্পর্কে ঘটে, তখন শক্তিমান্ পুরুষের আবির্ভাবের জন্য প্রতীক্ষা করিতে হয়। শক্তিমান্

পুরুষেরা ভাঙ্গিতে আসেন না, আসেন গড়িতে। গড়িবার গান তাঁহারা এমন করিয়া গাহেন, যাহার নির্ঘোষের নীচে পড়িয়া ভাঙ্গার গান অদৃশ্যে আপনা আপনি চলিতে থাকে। আমাদের চরিত্র-আন্দোলন এই জন্যই একটী আন্দোলন। যাহাতে কাহারও জুগুপ্সা নাই কিন্তু যাহা বেগবান্ ও ক্লান্তিহীন। এই আন্দোলন চলুক এবং চলিতেই থাকুক, থামিতে দেওয়া হইবে না। ইহা আমি একাই চালাই বা তোমরা দশ জনে মিলিত হইয়া ইহাকে ব্যাপকতরই কর; কিম্বা লক্ষ কণ্ঠে একই মন্ত্র যুগপৎ উচ্চারিত হইয়া কোটি কোটি বজ্রনির্ঘোষে ভূমণ্ডল চমকিতই করিতে থাকুক অথবা ইহা যদি কখনও অমিত কখনও স্তিমিত বেগে চলে, তবু চলুক। ইহাকে চালু রাখিতেই হইবে। মদের দোকান সংখ্যায় যত বাড়িবে, প্রতিবাদকারী আমরাও তত অধিকতর গর্জ্জন-মুখর হইব, হইতে থাকিব, থামিয়া যাইব না। মানুষকে আমরা নিন্দা করিব না, আমরা নিন্দা করিব সুরাপানের অভ্যাসটাকে, আমরা নিন্দা করিব ব্যভিচারের প্রবণতাকে, ব্যভিচারের ষড়যন্ত্রকে, বীর্য্যক্ষয়ের চপলতাকে, দুর্ব্বলতা-সঞ্চারক প্রত্যেকটী উপকরণকে এবং অপকারণকে। যে কারণ হইতে যে পাপের সৃষ্টি, সেই কারণের বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রাম করিব। যুদ্ধে যখন নামিয়াছি, তখন যতকাল সৃষ্টি থাকিবে, ততকাল আমরা যুদ্ধ করিব এবং এই যুদ্ধ ছড়াইয়া পড়িবে সমগ্র পৃথিবীর সকল দেশে।

ভিন্ন সম্প্রদায়ের পাপ ও মালিন্য দূর করা সম্পর্কে

ঐ পত্রেই শ্রীশ্রীবাবামণি আরও লিখিলেন,—

"তোমাদের অভিযোগটা যখন হইতেছে একটা দেবমন্দির সম্পর্কে, একটা মঠ, আখড়া বা সম্প্রদায়-বিশেষের পূজাস্থান সম্বন্ধে, তখন আমার মনে হয়, যেই সম্প্রদায়ের লোকের দ্বারা এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হইয়াছিল, যেই সম্প্রদায়ের লোকেরা উহাতে পূজা-পাঠ-কীর্ত্তন-উৎসব প্রভৃতি অনুষ্ঠান করেন, যাঁহারা প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মী ও কর্ম্মচারীদিগের অন্ন-সংস্থান, অর্থ-সরবরাহ, তৈজস-পত্রাদি দান করিয়া উহার ভাণ্ডার-ঘরকে স্ফীতোদর করিতেছেন, প্রতিবাদ চিন্তা তাঁহাদের মনেই আগে আসা উচিত। যেখানেই জুয়াখেলা হয়, মদ্যপান হয়, নরনারীর সঙ্গম-সম্ভোগের ব্যবস্থা হয়, ধর্ম্মচর্চ্চার নামে ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতি বিষোদ্‌গার করা হয়, যেখানে গেলে মদ্যপ মদ আর ছাড়িতে পারে না, যেখানে গেলে ইন্দ্রিয়-সম্ভোগের কুপ্রবৃত্তি মাথা চাড়া দিয়া ওঠে, অসত্যাচরণ ও মিথ্যাকথন যেখানে একেবারে জল-ভাত, কথায় কথায় যেখানে ক্রোধ এবং অভিসম্পাত, এমন প্রতিষ্ঠান প্রাচীনকালের ব্যাস-বাল্মীকিকে পরাজয়ে সমর্থ কোন সিদ্ধ মহাপুরুষের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইলেও, তাহা তোমাদের গম্য স্থান নহে। তোমরা সন্তর্পণে ইহার সহিত সংশ্রব বর্জ্জন কর। ইহার নিন্দা করিয়া

আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া কোন লাভ নাই। তোমরা নিজেরা নিজেরা চরিত্রবত্তার সাধনা করিয়া অপর প্রতি-বেশীদিগকে এই সাধনার প্রতি আকৃষ্ট করিলে বেশী লাভবান্ হইবে।

"তোমরা প্রশ্ন করিতে পার, এই অপরাধী লোকগুলোর চরিত্র-সংশোধন করিব না? বলিতে পার, ইহাদের ধর্ম্ম ও সাধনা যে সম্যক্ ভ্রান্ত, ইহা কি বুঝাইয়া দিব না? আমি বলিব, না, তাহা বুঝাইতে হইবে না। তোমার নিজের ধর্ম্ম ও সাধনা যে অভ্রান্ত, এই কথা আগে বুঝিয়া লও। তখন তোমার দৃষ্টান্ত দেখিয়া সমগ্র জগৎ ভুল শোধরাইবে। অব্যাপারেষু ব্যাপারং অনেক ক্ষেত্রে অশোভনও বটে। আচ্ছা বল, হিন্দুর মেয়েরা যেমন প্রত্যেকে আমার মা, মুসলমানের মেয়েরাও কি তেমন প্রত্যেকে আমার মা নয়? "মা" এই মন্ত্রময় শব্দটী আমি যেরূপ দরাজ গলায় উচ্চারণ করি, তাহাতে পৃথিবীর সকল জাতির সকল নারী আমার মা ছাড়া আর কিছু হইতে পারেন না। মা মানে শুধু জননীই নহে, মা শব্দের স্নেহঘন অর্থ হইতেছে কন্যা। হিন্দুর মেয়েরা যেমন মাতা এবং কন্যা, মুসলমানের ঘরের মেয়েরা তেমন কি আমার মাতা ও কন্যা নহেন? হিন্দু মেয়েদের পতি-বিয়োগের পর সম্পত্তিতে অধিকার থাকে না বলিয়া আমরা প্রতিবাদ করিয়া থাকি, কারণ ইহাতে মনে দুঃখ আসে। এই বিষয়ে মুসলমান মায়েরা সৌভাগ্যবতী বলিয়া থাকি। কিন্তু মুসলমান মায়েরা

আরেক দিক দিয়া কি অত্যন্ত অসহায়া নহেন? স্বামী হঠাৎ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, তালাক, তালাক, তালাক, বিবাহ ভাঙ্গিয়া গেল। কল্যকার স্বামিবতী আজ পতিহীনা হইল। তিনি কোথায় যাইবেন, কার আশ্রয়ে থাকিবেন, এই অবস্থা কি দুরন্ত এক দুরবস্থা নহে? ইহা কি অবমাননাকর ও অসম্মানজনক নহে? ইহার দ্বারা নারী জনসমাজে হেয় হইলেন না? এই ব্যাপারটা কি প্রতিবাদের অযোগ্য? নারী-জীবনের এই বিপর্য্যয়কর অবস্থা আমাদের অন্তরে বেদনা সঞ্চার করে। কিন্তু আমাদের পক্ষে প্রতিবাদে ফাটিয়া পড়া কি সুশোভন? ইহা কি কালোচিত বা বুদ্ধিমানের কার্য্য হইবে? কিন্তু মুসলমান স্বামী পত্নী-পরিত্যাগের পর নিজের ভুল বুঝিয়া সেই পত্নীকে ফিরিয়া পাইতে চাহিলে এবং পত্নীর পক্ষ হইতে পুনর্মিলনের আপত্তি না থাকিলে এই মহিলাটিকে সামাজিক যে আচরণের মধ্য দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া স্বামীর ঘরে আসিতে হয়, তাহা যে-কোন নারীর পক্ষে এত মর্ম্মপীড়াদায়ক যে ভাবিতেও আমরা ব্যথায় মূহ্যমান হই। এই প্রথার পরিবর্ত্তন প্রয়োজন কিনা, তাহা নিয়া মুসলমান সমাজের মধ্য হইতে যদি না চিন্তার স্ফূরণ ঘটে, তবে, পরের নাকে আঙ্গুল ঢুকাইবার আমাদের কি অধিকার আছে? আধুনিক শিক্ষা-সুপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে হয়ত অর্দ্ধশতাব্দীকাল পরে মুসলমান মায়েরা নিজেদের মনের কথা নিজেরাই কহিবেন।

"ঠিক এই রকমই হইতেছে ব্যাপারটা। শাক্তেরা বলিবেন,

মদ আমরা খাইবই, শুধু খাইবই নহে, অপরকে খাইতে শিখাইবও। পীত্বা পীত্বা পুনঃপীত্বা যতক্ষণ ভূতলে না গড়াগড়ি যাইব, ততক্ষণ ছাড়িব না, কারণ ইহা শাস্ত্রের বচন। তুমি প্রতিবাদ করিবার কে হে? শাক্ত বলিবেন, কেবল পাঠা কেন, মহিষ পর্য্যন্ত বলি দিব, আইনে না ধরিলে নরবলি দিতেও ছাড়িব না। বলি দিব, কৃত্বা রুধির-কর্দ্দমম্। কারণ, ইহা শস্ত্রের বচন। তুমি আমাদের পিছনে লাগিলে কেন হে?

"গুপ্তাচারী বৈষ্ণব বলিবেন, পাইকারী হারে নরনারী মিলিয়াছি দুপুর রাতে হরি ভজন করিতে, ইহা গুরুর আদেশ। গুরুর্বচঃ সত্যমসত্যমন্যৎ, তোমার বাপু উঁকি মারিবার প্রয়োজন কিহে?

"তোমরা নিজেরা নিজেদের চরিত্রকে সমৃদ্ধ কর এবং বল বাড়াও, পরনিন্দায় সময় নষ্ট করিও না। প্রথম প্রথম দেখা যাইবে, তোমরা বুঝি হারিয়া যাইতেছ, কিন্তু পরিণামে তোমরাই জয়ী হইবে। সত্যেরই জয় হয়, অসত্যের নহে। সংখ্যা-বলে তোমরা ক্ষীণ, ইহা দুঃশ্চিন্তার বিষয় নহে। তোমরা যদি তোমাদের নিষ্ঠা ছাড়িয়া দাও, তবেই দুশ্চিন্তার কারণ ঘটিতে পারে। তিনটী বা পাঁচটী প্রাণী যদি নিষ্ঠাযুক্ত হইয়া তিন বছর বা পাঁচ বছর চরিত্রের চর্চ্চা ক'রে, গুরুবাক্য পালন করে, সদাচার অভ্যাস করে, কদাচার পরিহার করে, তাহা হইলে তিন বছরে বা পাঁচ বছরে এই অল্প কয়েকটা লোকই সচ্চিন্তা-সমুজ্জ্বল সুসমৃদ্ধ, সুবিশাল সাম্রাজ্য সৃষ্টি করিতে পারে।

অলৌকিকত্ব ও লৌকিক জীবন

হাওড়া জেলার ডিংশইপাড়া-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"অলৌকিক কাহিনীর দ্বারা মহাপুরুষদের জীবনীকে প্রচ্ছন্ন করার একটা রীতি, শুধু এই দেশে কেন, সকল দেশেই প্রচলিত আছে। আমার সম্পর্কে এই রীতিটি পরিহার করিও। মানুষের স্নেহশ্রদ্ধা পাইবার জন্য আমার লৌকিক জীবন যদি যথেষ্ট না হইয়া থাকে, তবে শুধু গাল-গল্প ও কল্পিত-কাহিনী দ্বারাই কি লোকমনে আমাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে? সব অলৌকিকই মিথ্যা নহে, ইহা স্বীকার করি কিন্তু লৌকিক জীবন হইতে দূরে সরিয়া গিয়া যদি অলৌকিক দিয়াই কাজ চালাইতে হয়, তাহা হইলে বাস্তব জগৎ কি একেবারে মায়া হইয়া যাইবে না? কায়া নহে, ছায়াই যদি প্রধান হয়, তবে ত' সকল কল্যাণকর্ম্ম একদা অবাস্তব পাগলামীতে পরিণত হইবে। কে কোথায় কবে কতটুকু অলৌকিক ব্যাপার ঘটাইয়াছেন, তাহা দিয়া দেশের দিব্য জীবনের উন্মেষকে বিচার করিও না। কে কোথায় তাঁহার লৌকিক জীবনের সাধারণ আচরণের মধ্য দিয়া সর্ব্বসাধারণের পক্ষে অনুকরণের উপযোগী সদ্‌দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, কেবল তাহারই খোঁজ করিও। কারণ, সেই খোঁজাখুঁজির ফলস্বরূপে অতি সাধারণ নিম্নস্তরের অক্ষম-প্রায় ব্যক্তিরাও ক্রমশঃ নিজ নিজ জীবনের কলুষ-পঙ্কিল

ঝাড়িয়া ফেলিয়া শুচিশুভ্র সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবন-যাপনের দিকে অগ্রসর হইবার সাহস পাইবে, চেষ্টা করিবে এবং তাহাতে সফলকাম হইবে। একজন আর দুইজন লোক অলৌকিক শক্তির আধার হইয়া দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ দুর্ব্বলতা ও দুঃখ দূর করিয়া দিতে কখনও পারেন না। অথচ অতি দরিদ্র, অতি সামান্য, নিতান্ত নগণ্য ব্যক্তিরাও নিজ নিজ লৌকিক আচরণকে শুদ্ধতায় মণ্ডিত করিয়া লইয়া প্রাণপণে ঐক্যবদ্ধ হইলে আল্‌পস পর্ব্বত জয় করিতে পারিবে, ওয়াটারলুর যুদ্ধ জয় করিতে পারিবে, ফ্রান্সের রাজসিংহাসন ধূলায় লুটাইয়া দেশে প্রকৃত স্বাধীনতা ও সাধারণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে। জগৎ-ইতিহাসের বড় বড় সকল ঘটনা সাধারণ লোকদের ঐক্যবদ্ধ লৌকিক চেষ্টার ফলেই ঘটিয়াছে। ইন্দ্রজালের বিস্ময়কারী শক্তিতে নহে। এই সহজ-বোধ্য কথাটা তোমারা মনে রাখিও। একজন মহাত্মা তোমাকে শূন্য হইতে ধরিয়া আনিয়া একটা টাট্‌কা রসগোল্লা খাওয়াইয়া দিয়া অবাক্ করিতে পারেন, কিন্তু চির-দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট বিশাল দেশের প্রত্যেকটী ক্ষুধার্ত্ত নরনারীর উদর কি পূরণ করিয়া দিতে পারেন? কেহ হয়ত তোমারই শূন্য পকেট হইতে একমুষ্ঠি টাট্‌কা আবির বাহির করিয়া তোমার চোখে মুখে মাখাইয়া দিয়া আশ্চর্য্য বাহাদুরী অর্জ্জন করিতে পারেন, কিন্তু তিনি কি সর্ব্বসাধারণের মন হইতে পাপের গ্লানি ও অপরাধের অনুতাপ মুছাইয়া দিয়া তাহাদিগকে এক দিনে দিব্য জীবন দান করিতে পারেন? অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ দেখাইয়া জ্ঞানাঞ্জন-শলাকার সার্থকতা সম্পাদন করিলেন, কিন্তু কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে

আত্মবিসর্জ্জন-কারী অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের মধ্যে আর কাহাকেও কি ত্রাণ করিতে গেলেন? গেলেন না এইজন্য যে, সাধারণ মানুষেরও নিজ মুক্তির জন্য নিজের শ্রম করিবার প্রয়োজন আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে স্পর্শদান মাত্র ব্রহ্মবিবেকী আত্মজ্ঞানী মুক্ত-পুরুষে পরিণত করিয়াছিলেন কিন্তু কলিকাতার তৎকালের অধিবাসী দুই লক্ষ লোকের মধ্যে আর একজন সম্পর্কেও ইহা করিলেন না কেন? করিলে কি তাহা তিনি করিতে পারিতেন না? আমি মনে করি যে, তিনি তাহা পারিতেন। কিন্তু তিনি তাঁহার লৌকিক জীবনে যে সব সাধারণ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে এত সব বস্তু অনুকরণীয় রহিয়াছে, যাহার চিহ্ন দেখিয়া পথ চলিলে লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ নিজের শ্রমের মহিমাতেই নিজের তপস্যার দৌলতেই মুক্তি লাভ করিতে পারিতেন, পারেন বা পারিবেন। মহাপুরুষদের আলৌকিক শক্তিকে এই দৃষ্টিতে বিচার করিও, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, আস্তে আস্তে অতি সাধারণ মানুষেরাও ক্রমশঃ মহাপুরুষের পর্য্যায়ে উন্নীত হইতে যহিতেছে এবং তাহা সুনিশ্চিতই সমগ্র মানবজাতির পক্ষে লাভজনক, মানবসভ্যতার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ উন্মেষের পক্ষে সৌভাগ্যব্যঞ্জক।"

উপাসনাকে উপাসনাই থাকিতে দাও

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত রসুলপুর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"উপাসনা এবং অঞ্জলির সারল্যের মধ্যে নানা প্রকার দেশপ্রচলিত বিচিত্র প্রথার সংমিশ্রণ ঘটাইলে ভবিষ্যতে অখণ্ড-সাধকদের মধ্যে বহু মত এবং বহুদল সৃষ্টি হইয়া যাইবে। সুতরাং সুকৌশলে এই সকল হইতে বিরত থাকাই ভাল। ওঙ্কার-বিগ্রহে জল ঢালা, দুধ ঢালা, ডাবের জল ঢালা প্রভৃতি একবার আরম্ভ হইয়া গেলে গড্ডলিকা-প্রবাহের গতিরোধ করিতে বহু মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইবে। সুতরাং তোমাদের উপাসনাকে উপাসনাই থাকিতে দাও, ইহাকে বিমিশ্র ব্যাপারে পরিণত করিতে দিও না অথবা ইহা লইয়া তর্কের ঝড় উঠিতে দিও না। সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে ধর্ম্মীয় ঐক্য-সাধন সম্ভব কিনা, ইহা লইয়া বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান এবং মুসলমান ধর্ম্ম-প্রচারকেরা প্রত্যেকেই দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রচেষ্টা চালাইয়াছেন। ইহার ফলে সমগ্র জগৎ এক ধর্ম্মাবলম্বী হইল কিনা, তোমরাই বল। শুনিয়াছি, ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বীদের নিজ ধর্ম্মে টানিয়া আনিবার প্রয়াস নাকি ইহুদীদের নাই। হিন্দুদের ত' ইহা একেবারেই নাই। কিন্তু হিন্দু জাতিও নির্ম্মূল হয় নাই, ইহুদী জাতিও নিশ্চিহ্ন হয় নাই, হইবেও না। সুতরাং নিজ সাধন-ধর্ম্মের মধ্যে লোক-মনোরঞ্জনের জন্য অপরের প্রথা ঢুকিতে না দেওয়াই উচিত। খ্রীষ্টধর্ম্ম রোম হইতে কন্‌স্টানটিনোপলে আসিয়া খ্রীষ্টোপাসক-দের সংখ্যা বাড়াইবার অত্যাগ্রহে স্থানীয় লোকের মধ্যে প্রচলিত বহু গ্রাম্য প্রথাকে অবলম্বন করিয়াছিল। ইহার ফল মূল খ্রীষ্টিয় সমাজের পক্ষে কুশলদায়ক হয় নাই

বলিয়া অভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ইস্‌লাম ধর্ম্ম মক্কা-মদিনার বাহিরে ছড়াইবার পরে নানা দেশের নানা প্রথার সহিত আপোষ করিবার প্রয়োজন ঘটিয়াছিল কিন্তু মুসলমানেরা সেই প্রয়োজনের দাবীকে স্বীকার করেন নাই। ইহার ফলে ধর্ম্মে ধর্ম্মে রেষারেষি হয়ত বাড়িয়াছে কিন্তু মুসলমান সর্ব্বদেশে আচারে অনুষ্ঠানে, মেজাজে ও আকাঙ্ক্ষায় প্রায় একরূপই রহিয়া গিয়াছেন,—ইহা ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত। ধর্ম্মীয় দর্শনে দর্শনে মতামতের বিনিময় সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উভয় জীবনে লাভজনক, সন্দেহ নাই। কিন্তু সাধনধর্ম্মে বা পরমেশ্বরের সহিত অন্তরের যোগ-সাধনের কৌশলগুলির ব্যাপারে এই রকমের Compromise বা আপোষ যে-কোনও ধর্ম্মাবলম্বীর সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উভয়বিধ জীবনে একনিষ্ঠার হানিকারক নানা রোগের ও উপসর্গের সৃষ্টি করিতে পারে।"

মানব-জীবনের উদ্দেশ্য কি

অপরাহ্ণ সাড়ে তিন ঘটিকায় লাকসাম হাই ইংলিশ স্কুলের সম্মুখস্থ ময়দানে লাকসামের এবারকার দ্বিতীয় সভাটী বসিল। জনতার সংখ্যা বিশেষভাবে লক্ষণীয় হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জীবনটা আমাদের কি, তা আমরা জানি কি? নিজের মৃত্যু নিজে কখনও দেখিনি, তাই মৃত্যুটা যে কি, তা অপরের মৃত্যু দেখে আমরা অনুমান কত্তে চেষ্টা করি মাত্র। যুক্তি টানি, রাম মরেছে, শ্যামও মরেছে,

যদুও মরেছে, মধুও মরেছে, সুতরাং হয়ত যাদবও একদিন মরবে, মাধবও একদিন মরবে, রাঘবও একদিন মরবে। শুনতে পাওয়া যায়, জ্ঞানীরা বলেছেন, জীবমাত্রেই মরণশীল, জন্মগ্রহণ করলেই মরতেও হয়, জীবের পক্ষে মৃত্যু একটী শাশ্বত সত্য। মরা মানুষ আবার জন্ম গ্রহণ করতে নাও পারে, কিন্তু জীবিত মানুষকে একদিন মরতে হবেই হবে। মৃত্যুর হাত থেকে কারও রেহাই নাই। তবে কি জন্মগ্রহণ করা আর মরে যাওয়া, এটাই কি জীবনের সম্পর্কে শেষ কথা? মানবজীবন সম্পর্কে এর চাইতে বেশী কিছু কি বলবার বা ভাববার নেই? জন্মালাম আর মরে গেলাম, ব্যস? না, এটাই শেষ কথা নয়। যে সময়টুকু জীবিত রইলাম, সেই সময়টুকু আমি কিভাবে ব্যবহার করলাম, সেটাই হ'ল আসল কথা। পশুপক্ষী কীটপতঙ্গেরও জীবন আছে, মৃত্যু আছে। কিন্তু তারা জীবন সম্পর্কে এভাবে চিন্তা করে কিনা, আমাদের তা জানা নেই। আমরা মানুষ হ'য়ে জন্মেছি। মানুষ মাত্রেই কখনও না কখনও এভাবে চিন্তা করতে বাধ্য হয়। তার প্রধান কারণ এই যে, দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, মনন প্রভৃতি কার্য্য-সাধনের অন্তরেন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়গুলি ব্যবহার ক'রে ক'রে সে ইন্দ্রিয়গুলির পৃথক অস্তিত্ব সম্বন্ধে সজাগ হয়। এর ফলে সে বস্তুর এবং তত্ত্বের পার্থক্যবোধ ও একত্ববোধ নানা ভাবে আস্বাদন করে। আর, পূর্ব্বপুরুষেরা যে বিষয়ে জ্ঞান বা নৈপুণ্য সঞ্চয় করেছেন, তা বংশানুক্রমে আস্তে আস্তে পরবর্ত্তী পুরুষ-সমূহে সঞ্চারিত হ'তে থাকার ফলে তাদের বহু-শতাব্দী-সঞ্চিত জ্ঞানের কণাগুলি আমরা

বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের কয়েকটা বৎসরের মধ্যে আয়ত্ত ক'রে ফেলতে পারি। অর্থাৎ পূর্ব্বপুরুষদের অর্জ্জিত সম্পদ আমরা প্রায় অনায়াসে যৎসামান্য অভিনিবেশের ফলে একসঙ্গে পেয়ে যাই। এ যেন কয়েকবার পথ হাঁটাহাঁটি ক'রে লটারী অফিসের লক্ষ মুদ্রা পুরস্কার পেয়ে যাওয়া। মানুষের এই সুযোগ, এই সৌভাগ্য, এই সামর্থ্য আছে। ভগবানের সৃষ্ট এই জগতে মানুষ সব চাইতে সৌভাগ্যশালী প্রাণী। সুতরাং একথা ভাবাই স্বাভাবিক, মানুষের জীবন আমরা হেলায়-খেলায় কাটিয়ে দেবার জন্য পাই নাই।

মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য আত্মদমন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রাচীনেরা যে সকল সদ্‌গুণের চর্চ্চা ক'রে সংগুপ্ত আকারে আমাদের মধ্যে রেখে গেছেন, সেইগুলিকে একাগ্র অনুশীলনের দ্বারা অধিকতর মহত্ত্বে মণ্ডিত ক'রে আমরা তা বর্দ্ধিতাকারে পরবর্ত্তী পুরুষগণের জন্য নিশ্চয়ই রেখে যেতে পারি। সন্ন্যাসী একাজটী কত্তে পারেন শিষ্য-প্রশিষ্যানুক্রমে, সংসারী একাজ কত্তে পারেন পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে। যেভাবে জীবনটাকে ব্যবহারে আনলে, এই কাজটীতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরতা এবং সর্ব্বব্যপকতা আসতে পারে, নিজেদিগকে আপ্রাণ যত্নে সেইরূপ কার্য্যে নিয়োজিত ক'রে রাখার যে তপস্যা, সেইটিই হচ্ছে মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ

সদ্ব্যবহার। ধর্ম্মকার্য্যে, স্বদেশসেবায়, জনকল্যাণে জীবনকে নিয়োজিত রাখার চেষ্টার মধ্য দিয়ে এই উদ্দেশ্য সফল হ'তে পারে। হাতকে ডেকে বল, হে আমার হাত, তুমি অসৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়ো না, একমাত্র সৎকার্য্যেই তোমাকে লেগে থাকতে হবে,—এটা আমার আদেশ। অভ্যাসবশে কুপথে পরিচালিত হতে তোমাকে আমি দেব না। পাকে ডেকে বল, হে আমার চরণদ্বয়, বিপথে বা কুপথে বা জুগুপ্সিত পথে আমি তোমাকে চলতে দেব না, তোমাকে সৎপথেই চলতে হবে। কারণ তুমি মনুষ্যদেহের একটী অংশ, যেই মানুষের অধিকার আছে দেবত্ব অর্জ্জন করার। নয়নদ্বয়কে ডেকে বল, হে চক্ষু, তোমাকে আমি কুদৃশ্য দেখতে দেব না। কর্ণদ্বয়কে ডেকে বল, হে কর্ণ, তুমি কুকথা শুনো না। রসনাকে ডেকে বল, হে জিহ্বা, লোভ সংবরণ কর, মিথ্যা থেকে বিরত হও, পাপ-কথা উচ্চারণ ছেড়ে দাও, মৃতপ্রায় কোটি কোটি ভারতবাসী তথা জগৎবাসীকে পুনরুজ্জীবিত ক'রে তোলার মহা সঞ্জীবন মন্ত্র তোমাকেই উচ্চারণ কত্তে হবে, তোমাকেই গাইতে হবে। এক সময়ের পশুগুলি ক্রমবিবর্ত্তনের ধারা বেয়ে আজ মানুষরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, কিন্তু আমরা বনমানুষ না হ'লেও অর্দ্ধমানুষই রয়েছি। বলতে হবে, হে কণ্ঠ, দিগ্‌বিদিগ্ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত ক'রে নবজাগরণের সাম-সংহিতা আজ গেয়ে উঠ। —এই শিক্ষা আত্মদমনের শিক্ষা।

আত্মদমন বনাম আত্মোৎকর্ষ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —এই আত্মদমন প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মখণ্ডন নয়, নিজেকে খর্ব্বিত করা নয়, —নিজেকে অধিকতর মূল্যবান ক'রে গড়ে তোলা। পশুমানবের কি মূল্য আছে? সে সভ্যতার সম্পদ নয়, সে সভ্যতার বিপদ, সে সভ্যতার গৌরব নয়, সে সভ্যতার বিপর্য্যয়, সে সভ্যতার সৌরভ নয়, সে সভ্যতার ন্যক্কার। শ্রেষ্ঠ মানব আস্তে আস্তে দেবমানব হবেন। সেই দেবমানবই মানুষের যোগ্য পরিণতি।

বক্তৃতা তিন ঘন্টা কাল চলিল। শ্রোতারা যেন মন্ত্রমুগ্ধবৎ বসিয়া রহিলেন। কিন্তু আকাশে ঝড়ের হাওয়া বহিতে লাগিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বক্তৃতা বন্ধ করিলেন।

লাক্‌সাম
২রা শ্রাবণ, শনিবার ১৩৪৩
(১৮ই জুলাই, ১৯৩৬)

উচ্চাকাঙ্ক্ষী হও

অপরাহ্নে সেই একই মাঠে আর একটী বক্তৃতা হইল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—"জীবনের লক্ষ্য স্থির কর। লক্ষ্যহীন জীবন আর কর্ণধারহীন নৌকা সমান। তরঙ্গ-সঙ্কুল স্রোতাবর্ত্ত-জটিল খরধার নদীর বুকে হালহীন নৌকা পরিচালনা এক দুরন্ত রকমের বিপজ্জনক ব্যাপার। জীবন যখন ক্রিয়াশীল এবং চঞ্চল, তখন শক্ত হাতে এর হাল ধরা উচিত। তারই

নাম লক্ষ্যস্থির করা।) তুমি উকিল হবে, না ডাক্তার হবে, তুমি চাকুরীজীবী হবে, না ঠিকাদার হবে, এটা স্থির করার নাম লক্ষ্যস্থির করা নয়। তুমি সমাজের পক্ষে, দেশের পক্ষে, জাতির পক্ষে একটী গৌরবের সামগ্রী হবে, না কি কলঙ্কস্বরূপ একটী দুর্জ্জন হবে, সেইটা স্থির ক'রে নেওয়ারই নাম লক্ষস্থির করা। তুমি সৎ যদি না হও, সচ্চরিত্র যদি না হও, অধ্যবসায়ী যদি না হও, দৃঢ়সঙ্কল্প যদি না হও, তা'হলে তুমি বি.এ., এম.এ., যতই পাশ কর, তুমি জাতির জঞ্জাল। বিপথে অর্থ অর্জ্জন ক'রে অনেক চতুর লোক ধনবান্ হয়, এটা সত্য। অবৈধ ঘুষ খাইয়ে অনেকে ভাল চাকরী পায়, এটাও হয়ত সত্য। পরীক্ষার হলে নকল ক'রে বা অন্যের খাতা টুকে অথবা খাতা বদল ক'রে দুই চারটা শয়তান ছাত্র কদাচিৎ ভাল পাশ করে, এমন ঘটনাও কখনো কখনো ঘটে। এগুলো সত্যই বড় লজ্জাকর ব্যাপার। এই সকল লজ্জার গ্লানি থেকে নিজেদিগকে মুক্ত রাখার সাধনা তোমরা কর। তার জন্যই তোমাদের প্রয়োজন উচ্চ লক্ষ্য স্থির করা। জজ, ম্যাজিস্ট্রেট হওয়া তোমাদের লক্ষ্য হতে পারে না। তার চাইতেও বড় হওয়ার লক্ষ্য তোমাদের হওয়া উচিত। সে লক্ষ্য পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভের। শ্রীকৃষ্ণ কি পূর্ণ? শ্রীরামচন্দ্র কি পূর্ণ? যীশুখ্রীষ্ট কি পূর্ণ? তোমাদের যদি এই মত হয় যে, এঁরা পূর্ণ মানুষ, তবে এদের চাইতে বড় হবার চেষ্টা তোমাদের কর্ত্তে হবে। ভরত, লক্ষ্মণ, ভীম, অর্জ্জুন প্রভৃতি কি পূর্ণ মানুষ? যদি বল হ্যাঁ এঁরা পূর্ণ মানব, তবে আমি বলব, এঁদের চাইতেও বড় তুমি

হ'তে পার কিনা সেই লক্ষ্য তুমি স্থির কর। লক্ষ্য স্থির হওয়ার পরে ভগবদ্দত্ত যাবতীয় দৈহিক শক্তি, সমগ্র মানসিক শক্তি, প্রকটিত ও অপ্রকটিত সর্ব্বশক্তি ওই একটী উদ্দেশ্যে অকৃপণ হস্তে ঢেলে দাও। লক্ষ্য যদি থাকে উচ্চে, তোমার চরিত্র আস্তে আস্তে উচ্চতরের হ'য়ে যাবে, তোমার চিন্তা চেষ্টা উচ্চতম গ্রামে আরোহণ ক'রে তোমার সমস্ত দেহকে দেবদেহে রূপান্তরিত করবে, এই ক্ষণভঙ্গুর নশ্বর জগতে জন্মলাভ ক'রেও তুমি হবে একটা অবিনশ্বর শাশ্বত বস্তু। যে একটী মাত্র লক্ষ্যে স্থির থাকে, দশ দিকে মন ফিরায় না, সে একদা তার পক্ষে সুদুর্লভ প্রার্থীতকে লাভ করেই করে। একথা বিশ্বাস কর। যার লক্ষ্য বহু দিকে, বহু বস্তু যে চায়, তার অধ্যবসায়, চিন্তা ও চেষ্টা দিকে দিকে বিভক্ত হ'য়ে ছড়িয়ে পড়ে, তার মন ছিন্নতা আর বিচ্ছিন্নতায় শক্তিহীন হয়ে পড়ে, —ফলে একটা প্রাপ্যও সে পায়না। প্রার্থনীয় সব কিছু থেকে আস্তে আস্তে সে বঞ্চিত হয়। স্বপ্ন দেখ সুনিশ্চিত উন্নতির। সেই স্বপ্ন একদা সফল হবেই হবে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা হচ্ছে সেই মহাবীজ, যা বপন করলে, যাকে মৃত্তিকাবক্ষে দীর্ঘকাল ধ'রে রাখলে সফলতার কল্পলতা অঙ্কুরিত হবেই হবে, পল্লবিত হবেই হবে, ফল-ফুল-সম্ভারে শোভমানা হবেই হবে। হৃদয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান থাকলে তবে ত' তুমি প্রয়াস পাবে অগণিত অপ্রত্যাশিত বিরূপতার বিরুদ্ধে লড়াই ক'রে জয়ী হতে। দুরাকাঙ্ক্ষাকে দূর করে দাও, কারণ দুরাকাঙ্ক্ষা দুশ্চরিত্রতার দিকে ঠেলে দেয়। অপরের উপরে অন্যায় প্রভুত্বের স্পৃহা,

অসঙ্গতভাবে ধনার্জ্জনের স্পৃহা মানুষকে দুশ্চরিত্রতার পথে ঠেলে নিয়ে যায়। দুরাকাঙ্ক্ষা ও অনাবিল সুখ কখনো একসাথে চলে না। মহৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়ে বিরুদ্ধ পরিস্থিতির দরুণ অকৃতকার্য্য হয়েছ ব'লে লজ্জার কিছু নেই। তুমি যদি মহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'তে কুণ্ঠা কত্তে, তবে তোমার এই দ্বিধা প্রকৃত লজ্জার কারণ হ'ত। লক্ষ্য যদি কাহারও নীচ, হীন, জঘন্য হয়, তাহ'লে সাফল্য তার যত বড়ই হউক, সমগ্র পৃথিবী জুড়ে তার বিরুদ্ধে ধিক্কারধ্বনি উত্থিত হবে। লক্ষ্য রাখ সৎ, উন্নত ও মহৎ। আর বিশ্বাস কর, কোনও উন্নতিই তোমার জীবনে অলভ্য নয়। জীবন-বিকাশের যতগুলি দিক আছে, প্রত্যেকটাতেই কেউ একসঙ্গে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হ'তে পারে না। কারণ মানুষের পরমায়ু অতি অল্পকালব্যাপী। কিন্তু চেষ্টা করলে মানুষ বহু দিক দিয়েই যোগ্যতা অর্জ্জন কত্তে পারে। অবশ্য একটী বা দুটী দিক দিয়ে সে সমগ্র জগতে অতুলনীয় হতে পারে। তার জন্যে যার প্রয়োজন সব চাইতে বেশী, সেইটা হচ্ছে,—সচ্চরিত্রতা, অধ্যবসায়, নিরলস কর্ম্মশীলতা ও অফুরন্ত আত্মবিশ্বাস। তোমাদের ভিতরে আমি এই জিনিসগুলি চাই। তাই তোমাদের মধ্যে এসেছি। প্রতিজ্ঞা কর, তোমরা চরিত্রবান হবে, অসত্য-বর্জ্জনকারী হবে, পরদ্রব্য সম্পর্কে নির্লোভ হবে, নারীমাত্র সম্পর্কে সন্তানভাব-সম্পন্ন হবে, মাতৃবুদ্ধি-সমৃদ্ধ হবে, সংযমী হবে, সাহসী হবে, দেহে ও মনে পবিত্র হবে। একটীমাত্র কথা বা একটীমাত্র শব্দ, একটীমাত্র চিন্তা বা একটীমাত্র দৃষ্টান্ত যদি তোমাদিগকে ইন্দ্রিয়ের

ফল-সুখ-স্পৃহা বিস্মরণে সাহায্য করে, তবে জানবে তুমি দিব্য জীবনে প্রবেশ কচ্ছ স্বর্গীয় নিষ্কলুষতা তোমার প্রাপ্য।

৩রা শ্রাবণ, রবিবার, ১৩৪৩
১৯শে জুলাই, ১৯৩৬

আমার কাজের ধারা

শ্রীশ্রীবাবামণি ছয়টা চল্লিশ মিনিটের ট্রেইনে দৌলতগঞ্জ ত্যাগ করিলেন। চাঁদপুর গেলেন। লাক্‌সাম জংশনে জনৈক পরিচিত অনুরাগী ব্যক্তি বলিলেন,—আপনাকে কিছুদিন পরে পরেই এইদিক সেইদিক ছুটাছুটি করতে দেখ্‌ছি ব্যাপারটা কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—কাটছি ঘোড়ার ঘাস। তার উপরে আবার ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো। টাকা রুজির ধান্ধা নেই, সুতরাং কারও অধীন নই। কিন্তু দেওয়ালের গায়ে পেরেক ঠুকছি, কম ওজনের ছোট্ট হাতুড়ী, ইচ্ছা থাকলেও জোরে ঠুকবার উপায় নেই। বেশী জোরে ঠুকলে আবার পেরেক বেঁকে যাবে, দেওয়াল শক্ত কিনা? তাই ক'দিন পরে পরে এসে নূতন ক'রে ঠুকছি। মানে, Hammering করছি। তাই ছুটাছুটীর বিরাম নেই।

জিজ্ঞাসু জিজ্ঞাসা করিলেন, এতে কি হবে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এতেই সব হবে। আমি রোজ রোজ একই কথা বলি, কিন্তু বলি বিভিন্ন ঢংয়ে। আমি দেখতে পাচ্ছি যে, আমি এককথাই বলছি, আর ওরা শুনে

ভাবছে,—একেবারে আনকোরা নূতন কথা শুনছি যে,—বক্তৃতার ইন্দ্রজাল সৃষ্টি ক'রে একই জনকে, একই স্থানকে, একই লোক-সমষ্টিকে নানান কথার মত ক'রে একটী কথাই শোনাচ্ছি। এভাবে শ্রম না করলে এদের ভিতরে কথা ত' হৃদয়ের পরতে পরতে গেঁথে থাকবে না। সাময়িক হুজুগে ত' চরিত্র-গঠন হয় না। চরিত্রগঠন ছাড়া ত' কোন জাতির আমূল পরিবর্ত্তন বা ব্যাপক দিব্যায়ন কখনও সম্ভব হয় না। ধর, মার, কাট,—এটাই যদি আমার আন্দোলনের মূল কথা হত, তা'হলে একই জনের কাছে বার বার আসতে হতো না। রজোগুণ-সম্বর্দ্ধিত এক বলবান দুর্দ্ধর্ষ জাতি সৃষ্টি আমার আন্দোলনের লক্ষ্য বটে, কিন্তু আমার আন্দোলন তমোবর্জ্জিত সাত্ত্বিক।

জিজ্ঞাসু প্রশ্ন করিলেন,—কতকাল এইভাবে ছুটাছুটী করবেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যতকাল প্রাণটা শরীরটাকে বহন করতে সমর্থ হয়।

প্রশ্ন হইল,—আপনি লেখেন কখন? অনেক ত' বই বেরিয়েছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—লিখি শেষ রাত্রে ঘরে বসে। যখন ট্রেনে থাকি, তখন বড় ষ্টেশানে ট্রেন থামলে। দেখতে পাচ্ছেন না, এই Plywood এর Piece খানা, এটা আমার Portable Table, এটার উপরে কাগজ রেখে কমপক্ষে এক লক্ষ চিঠিতে স্বাক্ষর দিয়েছি। ষ্টীমারে উঠলে ত'

কথাই নাই। সেখানে যতক্ষণ খুশী লিখতে পারি। এইজন্য ষ্টীমারে ভ্রমণ আমি বেশী পছন্দ করি। গরীব ব'লে প্রথম শ্রেণীতে যেতে পারি না, থার্ড ক্লাসেই আস্তানা গাড়ি।

জিজ্ঞাসু প্রশ্ন করিলেন,—কি লিখছেন, তার দিকে লোকেরা তাকিয়ে থাকে না?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—থাকেন, তবে ওতে আমার ক্ষতি কিছুই নাই। কারণ, আমি কারো কাছে বোমা বা বারুদের ফরমূলা লিখছি না। লিখছি চরিত্র-গঠনের কথা,—যে কথায় ছাত্রেরও প্রয়োজন, শিক্ষকেরও প্রয়োজন, চোরেরও প্রয়োজন, পুলিশেরও প্রয়োজন, রাজারও প্রয়োজন প্রজারও প্রয়োজন, আমারও প্রয়োজন, তোমারও প্রয়োজন অর্থাৎ পত্র লেখকেরও প্রয়োজন, পত্রপ্রাপকেরও প্রয়োজন। গ্রীষ্মের দাবদাহে যদি জলসত্র খুলি, তখন আমার সেই শীতল পানীয় নিয়ে চোরের দরকার, পুলিশেরও দরকার, সাধুরও দরকার, ভক্তেরও দরকার। আমি চোরকে শীতল জল বিলিয়েছি ব'লে দারোগার অধিকার নেই আমার পিঠে চাবুক মারার। অসাম্প্রদায়িক অরাজনৈতিক কাজ কচ্ছি, আমার আবার ভয় কাকে? তবে হ্যাঁ, ষ্টীমারে ব'সে যখন চিঠি লিখি, তখন দর্শকদের মধ্যেই দুজন একজন স্বতঃপ্রণোদিত হ'য়ে ভীড় সরাতে ব'লে থাকেন, দয়া ক'রে ভাই একটু দূরেই সরে বসেন না, ভদ্রলোককে তাঁর চিঠি শেষ করতে দিন। এই হলো আমার কার্য্যের প্রকরণ। বিনে মাইনের চাকরী,

ভবিষ্যৎ—অন্তহীন পরিশ্রম। তাই চোখ বুজে দিবারাত ক'রে যাচ্ছি, সময় গময় নাই।

বেলা নয়টা পঁয়ত্রিশে ট্রেন চাঁদপুর বড় ষ্টেশনে পৌছিল। পাণ্ডুলিপি দৃষ্টে মনে হয়। শ্রীশ্রীবাবামণি পুরাণ বাজারে শ্রীরামদী পল্লীতে শ্রীসুরেশ চন্দ্র ঘোষের গৃহে উঠিলেন।

অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকায় পুরাণ বাজারের হরিসভাতে সভাধিবেশন হইল। পুরাণ বাজারের মত ব্যবসায়-বহুল স্থানে জনতা কল্পনাও করা যায় না। দিনটী রবিবার, সুতরাং নানাস্থানে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের গতি অবাধ ছিল।

অতীতের শিক্ষা

শ্রীশ্রীবাবামণি ভাষণ-প্রসঙ্গে বলিলেন,—সকল দেশেরই একটা অতীত আছে। কিন্তু এত বৈচিত্রপূর্ণ পুরাতন ঐতিহ্যের স্মৃতি অন্য কোন দেশে সম্ভবত নাই। খ্রীষ্টের জন্মের তিন হাজার বছর পূর্ব্বেকার ভারতীয় রচনায় যে সকল শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, আজও সে সকল শব্দের অনেকগুলি আমাদের বর্ত্তমান কালের কোন কোন ভাষায় অবিকৃত উচ্চারণে ও অপরিবর্ত্তিত অর্থে ব্যবহার হচ্ছে, এটা কি আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়? আবার যতগুলি সভ্যতার সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার সংঘর্ষ বা সঙ্কর্ষণ ঘটেছে, বিন্দুমাত্র নির্য্যাতন না ক'রে প্রত্যেকটী সভ্যতার অবদানগুলিকে সাদরে নিজ বক্ষে স্থান দেওয়ার দৃষ্টান্ত অন্যত্র বিরল। এইজন্যই মহাকবিরা ভারতকে মহামানবের দেশ ব'লে থাকেন। ভারতের অতীত

সব বিরুদ্ধ সভ্যতাকে মূল্যবান জ্ঞান করতে আমাদের শিক্ষা দিয়েছে, ধ্বংস কত্তে নয়। এসকশ্বরবাদী বৈদিক আর্য্যেরা বহুঈশ্বর-পূজক অনার্য্যকে, রক্ষপূজক আদিবাসীকে, প্রেতপূজক, সর্পপূজক খণ্ডজাতিগুলিকে বা পার্থিব সভ্যতায় অভ্যুন্নত দ্রাবিড়দিগকে হত্যা করার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। তাঁরা অনার্য্যকে আর্য্য-সাধনার অনুগামী করার চেষ্টা করেছেন সাংস্কৃতিক উপায়ে। ঋষি অগস্ত্যের দাক্ষিনাত্য যাত্রা প্রবল-পরাক্রান্ত সৈন্যদল নিয়ে নয়, পরন্তু জ্ঞানের খনি বেদগ্রন্থ এবং তত্ত্বজ্ঞানের খনি প্রেমময় হৃদয়খানা নিয়ে। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের সর্ব্বত্র আর্য্যসভ্যতার বিস্তারের হেতু রণ-দামামার বজ্র-নির্ঘোষে নয়, পরন্তু "একংসৎ" এই তত্ত্বের ব্যপক বহুল প্রচারে। আর্য্য সভ্যতা অনার্য্যের উপরে ডাকাতের মত আপতিত হয় নাই, লুণ্ঠকের মত রক্ত শোষণ করে নাই। নারীকে তার নিভৃত গৃহকোণ থেকে সবলে আকর্ষণ ক'রে টেনে আনে নাই, গৃহে গৃহে অগ্নিসংযোগ করে নাই,—যে সকল কুদৃষ্টান্ত কোন কোন সভ্যতা সম্পর্কে এশিয়া ও য়ুরোপের ইতিহাসে বর্ণিত আছে। এই যে সাত্ত্বিকতার প্রাচীন পথ, এইটীই আমাদের প্রকৃত পথ। বহু-দেব-পূজনকারীদের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত না হওয়ার ফলে তাঁদের আনুষ্ঠানিক আচরণের মধ্য থেকে যে সকল জটিলতা ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে অনুপ্রবেশ লাভ করেছে, সেইগুলি মূল ভারতীয় জীবনে সাংগঠনিক ঐক্যের হয়েছে দারুণ বিঘ্ন। তথাপি সংঘর্ষ বা বলপূর্ব্বক কারও মত পরিবর্ত্তনের চেষ্টার অত্যাচার রূপ

অসুন্দর আচরণ আমরা আমাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হ'তে দিতে পারি না। প্রকৃত ভারতীয় ব'লে পরিচয় দিতে হ'লে আমাদিগকে একদিকে হ'তে হবে বীর্য্যবান্, অপরদিকে হ'তে হবে অনুদারতা-বর্জ্জিত সহিষ্ণুতার সাক্ষাত প্রতিমূর্ত্তি-স্বরূপ শাশ্বত সত্যানুসন্ধিৎসু যথার্থ ঈশ্বরপ্রেমিক। প্রকৃত ঈশ্বরপ্রেম ব্রহ্মচর্য্য-বিহীন অসংযমী হৃদয়ে থাকে না। ঈশ্বরপ্রেমের ছদ্মবেশে যে জিনিসটী সেখানে থাকে, তাহার নাম ছলনা। অতীত ভারতবর্ষকে সহস্রবার প্রণাম করি এই জন্য যে, ব্রহ্মচর্য্যের মতন একটা অদ্ভুত জিনিস তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন এবং তাকে সমাজমধ্যে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য একটা ব্যবস্থা দীর্ঘকাল চালু রেখেছিলেন। আমাদিগকে সেখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ কত্তে হবে।

৪ঠা শ্রাবণ, সোমবার, ১৩৪৩
(২০শে জুলাই, ১৯৩৬)

অদ্যও অপরাহ্ণে পুরাণবাজারের হরিসভাতে সেই একই স্থানে দ্বিতীয় বক্তৃতাটি দিতে হইল।

ব্রহ্মচর্য্য পালনের মানে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ব্রহ্মচর্য্য পালনের মানে এই নয় যে, ঘর বাড়ী ছেড়ে জঙ্গলে বা কোন মাঠে বাস কত্তে হবে। ঘরেই তোমরা বাস কর, গৃহকর্ম্মাদিতে মাতা-পিতাকে সহায়তা কর, বিদ্যালয়ে যাও, পাঠাভ্যাস কর। নিয়মমত খেলাধূলা কর, উৎসবাদি কর। কিন্তু মনকে সর্ব্বদা নীচ চিন্তার

হাত থেকে রক্ষা ক'রে চল। মনের ভিতরে কাম-চিন্তাকে ঢুকতেই দেবে না। এটা অবশ্য কঠিন কাজ। কিন্তু এটা না করলে তোমার উন্নতি কোথায়? এই সাধনায় তোমাকে সিদ্ধি অর্জ্জন কত্তেই হবে, সেই সিদ্ধি অর্জ্জনের উপায় হচ্ছে দৃঢ় সঙ্কল্প। সঙ্কল্প যার ট'লে যায়, সে সত্যবাদী নয়। যদি চেষ্টা ক'রে একবার সত্যবাক্ হ'তে পার, তা'হলে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা তোমার এমন বেড়ে যাবে যে, যে সৎকাজটী কত্তে চাও, তা তুমি কত্তে পার্ব্বেই পার্ব্বে। যারা সত্য অনুশীলন করে, একমাত্র তারাই সত্যের এই মহামহিমা জানতে পারে। এইজন্য শাস্ত্রকাররা বলেছেন "সত্যাৎ পরতরং নহি"। এইজন্যই সত্যশীলেরা ব'লে থাকেন "সত্যম্ এব জয়তে নাণৃতম্।" সত্যের সাধনা ব্রহ্মচর্য্যের সাধনাকে সহজ ক'রে দেয়।

সত্যের সাধনা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সত্যের যদি সাধনা কত্তে চাও, তা'হলে বাক্‌সংযম অভ্যাস কর। বচন-বিলাসীরা ইচ্ছায় অনিচ্ছায় অসত্যের চর্চ্চা করে। কাব্য-রচনাও একপ্রকারের অসত্য চর্চ্চা, গল্প-গুজব করাও একপ্রকারের অসত্য-চর্চ্চা। কিন্তু সমাজের হিতকল্পে রূপকচ্ছলে কল্পনা-বিলসিত বাক্যাবলীকে অম্লানবদনে সয়ে নেওয়া সভ্যতার একটা অঙ্গ ব'লে মেনে নেওয়া হয়েছে। পুরাণের অধিকাংশ কাহিনী গল্পমাত্র। দুনিয়ার যাবতীয় উপন্যাস এমন ঘটনার বিবৃতি, যা সত্য সত্য ঘটে নাই। অবশ্য ঘটলে ঘটতে পারত। ঘটলে কি

তার কুফল হত বা সুফল হত, সেইটি পাঠককে ব'লে দিয়ে তার উপকার করা যেখানে গ্রন্থকারের লেখনী-পরিচালনের পরিশ্রমটুকুর সার্থকতা, সেখানে সভ্য কিম্বা অসভ্য কোনও সমাজের লোকেরা সত্য-মিথ্যার তর্ক-বিচার তোলেন না। কিন্তু অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসই তরুণ মনে বিকার সৃষ্টি ক'রে থাকে। সুতরাং তোমরা যারা সত্যের সাধনা কত্তে চাও, তাদের এগুলি না পড়াই ভাল। প্রাণপণে চেষ্টা কর সত্যশীল হ'তে, প্রাণপণে চেষ্টা কর মিথ্যা বর্জ্জন কত্তে, তা'হলে ব্রহ্মচর্য্য তোমার পক্ষে সহজ হবে। সত্য-শীলের জীবনে গোপনতার স্থান নাই। সে এমন কিছু গোপনেও করে না, যা অপরে দেখতে পেলে তার পক্ষে লজ্জার বা নিন্দার কারণ হ'তে পারে। মনে মনে বারংবার উচ্চারণ কর যে, গোপনতাই দুর্ব্বলতা, গোপনতাই পাপ,—রাজনীতির কথা বলছি না। রাজনীতির পথে যারা পদসঞ্চারণ করেন, তেমন লোকদের পরম দুর্ভাগ্য এই যে, চরিত্রবত্তায় আদর্শস্থানীয় হওয়া সত্ত্বেও তাঁদিগকে অনেক সত্য গোপন কত্তে হয় এবং একটা মিথ্যাকে সমর্থন ক'রে পাঁচটা মিথ্যা বলতে হয়। যাঁরা খোল-করতাল বাজিয়ে বাজিয়ে রাস্তায় রাস্তায় হরিনাম কীর্ত্তন ক'রে বেড়ান, তাঁদের মধ্যে স্বদেশপ্রেমিক নেই, এমন কথা মনে ক'রো না। কিন্তু তাঁদের কাউকে স্বদেশসেবার রাজসিক পথে টেনে আনা এই জন্য শক্ত যে, এ পথে কিছু না কিছু মিথ্যা ছাড়া উপায় নাই। মহাসত্য লক্ষ্যের সঙ্গে মিথ্যা ও চাতুরীর উপায়কে সংমিশ্রিত কত্তে গেলে সত্য ক্ষুণ্ণ হয়। রাজা যুধিষ্ঠির "ইতি গজ" ব'লে

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধস্থলে সত্যের বাপান্ত করেছিলেন বা শ্রাদ্ধ সেরেছিলেন। সত্যের সাধনায় সিদ্ধিলাভ ব্যতীত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া শক্ত অথবা অসম্ভব। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানুষেরাই সমাজের মেরুদণ্ড। চিরচঞ্চল-মনোবৃত্তি-সম্পন্নেরা সমাজের আবর্জ্জনা। সত্যশীলেরা সমাজের অলঙ্কার, সুতরাং ব্রহ্মচর্য্য পালনে যত্নশীল হও।

অদ্যই রাত্রি আটটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে ট্রেন ধরিয়া ফেণী যাইতে হইবে বলিয়া বক্তৃতা সংক্ষেপ করিতে হইল।

ফেণীর ছয়টী বক্তৃতা

১৩ই শ্রাবণ হইতে ১৮ই শ্রাবণ, ২৯শে জুলাই হইতে ৩রা আগষ্ট এই ছয় দিন জয়কালী বাড়ীতেই শ্রীশ্রীবাবামণির ধারাবাহিক ছয়টী বক্তৃতা হইল। এই বক্তৃতাগুলির কোনও নোট কেহ রাখেন নাই। অনুমান করিয়া কিছু লেখাও সম্ভব নহে। বক্তৃতাবলি এমনই উচ্চগ্রামের হইয়াছিল যে, ফেণী কলেজের অধ্যাপকেরা টুকিতে বসিয়া টোকার কথা ভুলিয়াই গেলেন। এই বক্তৃতাবলির এমন একটুখানি ভূমিকা আছে, যাহা কৌতূকোদ্দীপক বলিয়া নিম্নে লিখিত হইল কিন্তু তদুপলক্ষে এক ভদ্রলোকের নামটী একটু পরিবর্ত্তিত করিয়া দেওয়া হইল।

ফেণীতে চিত্র-প্রদর্শনী উদ্‌ঘাটন করিবার জন্য ট্রেন হইতে ষ্টেশন-প্ল্যাটফর্মে নামিবামাত্রই শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র মালাকার কহিলেন,—বাবামণি, এবার আপনার সভা কি রকম জমবে, বুঝতে পারছি না।

শ্রীশ্রীবাবামণি কিছু বলিলেন না, হাসিলেন মাত্র। অবশ্য ব্যাপারখানা কি, তাহা তিনি তখনো জানিতেন না।

স্থিতিস্থানে আসিয়া পৌঁছিলে শ্রীযুক্ত রেবতী মোহন পোদ্দার বলিলেন,— জোর জনরব এই যে, এবার আপনার বক্তৃতা জমবে না।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—বক্তৃতার ত' প্রয়োজনই হবে না। আমার চিত্র প্রদর্শনীর একশত আটখানা ছবি যা বলবার ব'লে যাবে। এজেন্ট দিয়ে যে কাজ হয়, সে কাজ আমি নিজে না করলে ক্ষতি কি ? চিরকালই কি আমি গলা ফাটাব আর বক্তৃতা দেব? আগামী কয়টী দিন আমাদের অঙ্কিত ছবিগুলিই আমার কথা বলবে। ছবিগুলি আমি একা আঁকিনি, এঁকেছে অনেকে। কিন্তু প্রত্যেকটী ছবি আমার কথাই ত' বলবে। তাতেই হবে।

শ্রীযুক্ত রমেন্দ্র নাথ মুখার্জ্জী আসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণিকে বলিলেন,—স্বামী অভিজাতানন্দ নামে একজন দারুণ বিদ্বান্ সন্ন্যাসী এখানে এসেছিলেন, তিনি বিলাতের তিনটী বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ-ডি। আমেরিকার কোন একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি, লিট। সাতটা ভাষা জানেন, ছটা বিষয়ের এম, এ। কণ্ঠস্বর মধুর, চেহারায় কন্দর্পকান্তি। তিনি এমনভাবে শহর মজিয়ে গেছেন যে, আপনি এবার বক্তৃতা জমাতে পারবেন না,—বলছেন শহরের অনেক লোক। কথাটা বলবনা বলবনা ক'রে আপনাকে বলতেই হ'ল। আমি লজ্জায় এতক্ষণ কথাটা তুলিনি।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—ভালই হ'ল। শহরটা ঘোড়-দৌড়ের মাঠ হ'ল। আমি একজন জকি, আর অভিজাতানন্দজী আর একজন জকি। কার ঘোড়া বাজী জেতে, এইটা দেখাই ত' শহরবাসীর উদ্দেশ্য! মানে জুয়াখেলা হ'ল। জুয়ার নেশা দারুণ নেশা। তাহ'লে এবার আমার বক্তৃতা শুনতে বেশী লোকের ভীড় হবে, এটা বুঝা গেল।

রমেন্দ্র বলিলেন,—আমার কিন্তু ভয় হচ্ছে, লোক হবেই না। আপনি যদি কয়দিন আগে আসতেন, তবে বড় ভাল হ'ত।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমি সকলের পিছে থাকতেই ভালবাসি। সকলের পিছে থাকার দরুণ যদি আগে কখনো না যেতে পারি তবে দোষ নেই, কিন্তু পিছে থাকা সত্বেও কোনও প্রকারে যদি এক কদমও আগে বাড়তে পারি, তবে সেটা মস্ত ক্রেডিট।

অপর এক সময়ে শ্রীযুক্ত হরিমোহন দে বলিলেন,—অভিজাতানন্দ স্বামী এসে শহরটাকে মাৎ ক'রে গেছেন, লোকটা সত্যই পণ্ডিত, বক্তাও বটে। কিন্তু আমরা আপনার ভক্তেরা, ভাবনায় পড়েছি।

এই বলিয়া শ্রীযুক্ত হরিমোহন শহরের নানা জনের নানা মতামত বলিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—আহা, আমি হারলে ক্ষতিটা কি? জুয়াখেলার সব দানে আমিই জিতব, আমি

একবারও হারতে পারব না, এটা ত' অন্যায় দাবী। আসল কথা ত' সমাজসেবা, কেউ বেশী কত্তে পারেন, কেউ কম পারেন। যিনি কম পারেন, তিনিও কৃতার্থ, যদি তাঁর কাজ হয় নিস্কাম, নিঃস্বার্থ।

যাহা হউক, নির্দ্দিষ্ট তারিখে প্রথম বক্তৃতাটী আরম্ভ হইল। দৈবক্রমে ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাস্থলে উপস্থিত। তিনি ফেণী হাইস্কুলের হেডমাস্টার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের অতিথি। সম্পর্কে পরস্পর গুরুভাই, গোরক্ষপুরের বাবা গম্ভীরনাথের তাঁরা শিষ্য।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়বাবু বলিলেন,—ভীড় যথেষ্ট হয়েছে তবু একটু এগিয়েই বসি। বাবামণির যত কাছে থাকতে পারি, ততই ভাল।

এমন বক্তৃতা জীবনে শুনি নাই। ময়মনসিংহে একবার ধারাবাহিক দুই সপ্তাহ এই বক্তৃতা আমি শুনেছি।

মণীন্দ্র বাবু তেমন গরজ করিলেন না। তিনি বলিলেন,—স্বামী স্বরূপানন্দজীর বক্তৃতা আমি আরও শুনেছি।

কিন্তু বক্তৃতারম্ভ হইবার মিনিট তিন চারি পরে দেখা গেল যে, মণীন্দ্র বাবু-ভীড় সরাইয়া আগাইয়া আসিতেছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বক্তৃতা থামাইলেন। মণীন্দ্রবাবু এবং অক্ষয়বাবুর সম্মুখে বসিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া পুনরায় বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন।

দুঘণ্টা পরে বক্তৃতা শেষ হইলে শ্রীযুক্ত অক্ষয়বাবু মণীন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—শুনলেন ত'? অভিজাতানন্দ স্বামী বড় বক্তা, না স্বরূপানন্দ স্বামী বড় বক্তা, বলুন।

কাজ না করিয়া প্রশংসা

সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইয়া মণীন্দ্রবাবু জনতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—সহৃদয় শ্রোতৃবর্গ, আমারই মতন আপনারা অনেকে বক্তৃতারম্ভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বোধ হয় এই ভ্রান্ত ধারণাই পোষণ কচ্ছিলেন যে, আজকের বক্তার চাইতে বড় একজন বক্তা দু' সপ্তাহ আগে এই শহর ঘুরে গেছেন। কিন্তু আজকের বক্তৃতা শুনে বুঝা গেল, স্বরূপানন্দজী অপরাজেয়।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—আপনারা স্নেহবশতঃ আমাকে প্রশংসা ক'রে প্রকারান্তরে গালই ত' দিলেন। কাজ করলুম না কিছু, কেবল কতগুলি কথা বললুম। এমন কথার জন্য আমাকে প্রশংসা করা ত' নিরর্থক। আশীর্ব্বাদ চাই, যাতে কাজ ক'রে প্রশংসা অর্জ্জন কত্তে পারি।

মণীন্দ্রবাবু ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন,—আপনি আশীর্ব্বাদ করুন যে, যে কথাগুলি আপনি শোনালেন, তা' যেন পালন কত্তে পারি।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়বাবু বলিলেন,—আপনি স্বর্গের দেবদূত, তাই দিব্য জীবনের বার্ত্তা নিয়ে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। দেখতে ত' পাচ্ছি, কর্ম্মই আপনার পরম লক্ষ্য, কর্ম্মই আপনার প্রাণ, চাঁদা সংগ্রহেরও তাগিদ নাই, পাথেয় সংগ্রহেরও গরজ নাই। এমন নিঃস্বার্থ জনসেবক আমরা কোথায় পাব?

ইহার পরে শ্রীশ্রীবাবামণি ফেণীতে একই স্থানে আরও পাঁচটী বক্তৃতা দেন।

ঠাণ্ডা-কালীবাড়ী
২১শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪৩
(৬ই আগষ্ট, ১৯৩৬)

নূতন পৃথিবী গড়িব

শ্রীশ্রীবাবামণি প্রাতের পাঁচটা চল্লিশ মিনিটের ট্রেণে চাপিয়া ঠাণ্ডা-কালীবাড়ী আসিয়াছেন। সেখানে বেলা দু'টাতে একটী সভাধিবেশন হইল। এই অঞ্চলের লোকেরা সকলেই ফেণীতে চিত্র-প্রদর্শনী দেখিতে গিয়াছেন কিন্তু বক্তৃতাবলি শুনিতে যাইতে পারেন নাই। তাঁহাদের একান্ত আগ্রহে ফেণীর ছয়টী বক্তৃতার সারমর্ম্ম বর্ণনা করিবার পরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ব্রহ্মচর্য্য ভারতীয় সভ্যতার শুদ্ধতম আদর্শ বা মেরুদণ্ড। ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির শাশ্বত স্তম্ভ হইতেছে ব্রহ্মচর্য্য। নিজ নিজ আশ্রম ও পরিবেশ অনুযায়ী ব্রহ্মচর্য্য পালিবার ভঙ্গী এক একজনের পৃথক্ হ'তে পারে, কিন্তু পালনকারীর পক্ষে মহাশক্তির-উৎস হচ্ছে ব্রহ্মচর্য্য। কায়িক সংযম, বাচিক সংযম, দৃষ্টি-সংযম, শ্রুতি-সংযম, মনঃসংযম প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার সংযমই ব্রহ্মচর্য্যের উপাঙ্গ। নারীমাত্রের প্রতি মাতৃবুদ্ধি, পরদ্রব্যের প্রতি নির্লোভিতা, ক্রোধের উত্তেজক কারণ থাকা সত্ত্বেও ক্রোধদমন সম্যক্ ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার সহায়ক। একটা মানুষও যদি ব্রহ্মচর্য্য পালন করবার চেষ্টা করে, তবে তার

অজ্ঞাতসারে চতুর্দ্দিকস্থ দশটা লোক ইচ্ছায় অনিচ্ছায় আপনা আপনি সেই মহাদাদর্শের পানে আকৃষ্ট হবেই হবে। ব্রহ্মচর্য্য স্পর্শমণির স্বরূপ। যার জীবনে যে অপূর্ণতাই থেকে থাকুক, সে যদি ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি অকপট ভাবে অনুরাগী হবার চেষ্টা করে, তা'হলে একদা তার শূন্য ভাণ্ডার নানা আধ্যাত্মিক সম্পদে ভ'রে উঠবেই উঠবে। ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি অন্তরের অনুরাগই তার সব শূন্যতা দূর ক'রে দেবে। নিয়ত ঈশ্বর-স্মরণ ব্রহ্মচর্য্যের ধ্রুবনক্ষত্র। আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস ব্রহ্মচর্য্যের রাজবর্ম্ম। নিজ শরীরের প্রতি অণু-পরমাণুকে জগৎ-কল্যাণকর্ম্মে বিনিয়োজনের আমূল আগ্রহ ব্রহ্মচর্য্য-সাধনার প্রারম্ভ-বেদী। শুধু ব্যক্তিগত হিতসাধনের জন্য নয়, শুধু নিজেরই উৎকর্ষটুকুর জন্য নয় পরন্তু জগদ্বাসী অগণিত নরনারীর পরম কুশলার্থে আত্ম-গঠনের আবেগ থেকে ব্রহ্মচর্য্য-রুচির সার্থক সৃষ্টি। ব্রহ্মচর্য্য কথাটা ভারতের অতীতের এক কীর্ত্তি আর জগমঙ্গল-সাধনার তত্ত্ববিদ্যা ভারতে অতীতের এক কৃষ্টি। সেই কীর্ত্তিকে সেই কৃষ্টির সাথে সংযুক্ত ক'রে নূতন ক'রে আমরা পৃথিবী গড়ব এইটিই আমাদের সাধনা হউক।

২৫শে শ্রাবণ, সোমবার, ১৩৪৩
(১০ই আগষ্ট, ১৯৩৬)

গতকাল শ্রীশ্রীবাবামণি লৌহজং আসিয়াছেন এবং অদ্য মাদারীপুর-পৌছিতেছেন। স্টীমারে যাত্রী খুব কম। ভিড় নাই। সুতরাং পত্র লিখিবার অফুরন্ত অবসর। গত কয়টা দিন ঠাণ্ডাকালীবাড়ী (ত্রিপুরা), লৌহজং (ঢাকা) বিদ্যুদ্বেগে ভ্রমণ

করিয়াছেন এবং প্রত্যেকস্থানে একটী বা দুইটী করিয়া ভাষণ দিয়াছেন। স্তূপীকৃত চিঠিপত্রের একখানারও জবাব দিতে পারেন নাই। ২১।২২।২৩।২৪ শ্রাবণ চারিটা দিন যেন শরীরটার উপর দিয়া ঝড় বহিয়াছে। কিন্তু মাদারীপুর-গামী ষ্টীমারে বেশ একটানা ঘুম ঘুমাইয়া নিবার-পরে শ্রীশ্রীবাবামণির শরীরে নববল আসিয়াছে। তিনি প্রাতঃস্নান ও উপাসনা সারিয়া পত্র লিখিতে বসিলেন।

তোমরা পরস্পরের ভাই

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত শ্রীকাইল-নিবাসী জনৈক পত্রলেখককের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"মনোভঙ্গ বা মতভেদ যাহাই ঘটিয়া থাকুক না কেন, এই সত্যটা সর্ব্বোপরি থাকিয়াই যায় যে, তোমরা পরস্পর পরস্পরের ভাই। এই সত্যটা সর্ব্বাবস্থায় অমর। আজ হউক, কাল হউক, তোমাদিগকে এই সত্যের চরণে প্রণতি জানাইতেই হইবে। নতুবা মানুষে আর পশুতে পার্থক্য রহিল কোথায়? রুক্ষ ব্যক্তিত্ববোধ, উগ্র সাম্প্রদায়িকতা, পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিবার লুব্ধ প্রবৃত্তি ছলনা করিয়া তোমাদিগকে বিবাদে প্ররোচিত করিতেছে। এই সত্য একদা বুঝিতেই হইবে। অনন্তকাল মানুষ নিজেদের ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতরে বা বিশাল পরিধির বাহিরে রাখিতে পারে না। কেবল কলহই করিবে, ইহা স্বাভাবিক নহে, ইহা মানবিকও নহে। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলির সৎলোকের সঙ্গে মেলামেশা কর, তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ

শিখাইতে হইবে। এই ব্যাপারে কিছু না দিয়া কিছু নিও না, কিছু না নিয়া কিছু দিও না। দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণ করিতে হইলে তেলেগু, তামিল, কন্নাড় এবং মালয়ালাম এই চারিটী ভাষা জানা না থাকিলে দেশভ্রমণ আলুনি থাকিবে। সাহিত্যিক উচ্চচিন্তার জগতে বিচরণ করিতে হইলে বাংলা, হিন্দী, গুজরাতি, মারাঠী, তামিল আদি কয়েকটী ভাষার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকিলে ভারতীয় সারস্বত বন্দনার পুষ্পপাত্র পূর্ণ হয় না। আর, ইংরেজী না জানিলে যেমন বর্ত্তমানে বিশ্বসাহিত্যের দুয়ার খোলা যায় না, সংস্কৃত না জানিলে তেমন লক্ষ বছরের প্রাচীন ভারতবর্ষকে চেনা যাইবে না। নানারূপ বিপত্তিকর ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও সংস্কৃতই লক্ষ বছরের অতীতকে সগর্ব্বে এদেশে বক্ষে ধরিয়া রাখিয়াছে,— এ কাজ মিশরের প্রাচীন ভাষা করিতে পারে নাই, মিট্টানির ভাষাও নহে, ব্যাবিলনের ভাষাও নহে। প্রাচীন সংস্কৃত যেভাবে আজ পর্য্যন্ত আধুনিক সংস্কৃতে এবং সর্ব্বাধুনিক বাংলায় বাঁচিয়া রহিয়াছে, প্রাচীন গ্রীক বা ল্যাটিন ভাষা আধুনিক গ্রীক বা ইটালিয়ান ভাষার ভিতরে সেইভাবে নাই, অর্থাৎ আজও সংস্কৃত ভাষা জীবিতই আছে। সুতরাং কোন অবস্থাতেই সংস্কৃত ভাষাকে ভুলিয়া যাইও না। প্রতি সপ্তাহে দু'টা একটা নূতন শব্দরূপ ও ধাতুরূপ শিখিতে চেষ্টা করিও। একদা হয়ত ভারতবর্ষে বহুভাষা একত্র মিলিয়া বিচিত্র-বৈশিষ্ট সম্পন্ন একটী ভাষায় পরিণত হইতে পারে। আমরা যদি ভাষার ব্যাপারে বলদর্পিত না হই, জিগীষু-মনোবৃত্তি না রাখি, বিশ্বেষ

বুদ্ধি বর্দ্ধন করিয়া সেবকের ভাব লইয়া প্রত্যেক ভাষাভাষীরা নিজ নিজ ভাষাকে প্রসারিত করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে এইরূপ অমৃতময় ফলটি প্রত্যাশা করা হয়ত অলৌকিক হইবে না। বহু-শব্দ-সমন্বিত বিরাট এক মহাভাষার ষড়ৈশ্বর্য্য-সজ্জিত অতুলনীয় সৌন্দর্য্য একদা হয়ত সমগ্র বিশ্বকে বিমুগ্ধ করিতে পারে। সেই সেতুবন্ধ রচনার প্রধান উপকরণ এবং উপাদান হইতে পারে একমাত্র সংস্কৃত ভাষা। ভারতীয় ভাষা-সমূহের সহিত বিদেশীয় ভাষা-সমূহের প্রতিভা সমগোত্রীয় হইবে না বলিয়াই ইংরাজীকে সেই সেতু বলিয়া কেহ মানিবে না, যদিও সমগ্র বিশ্বের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক, বৈজ্ঞানিক যোগাযোগ রক্ষা করিবার ব্যাপারে ইংরাজী ভাষা ব্যতীত আপাততঃ আমাদের গত্যন্তর নাই।"

কর্ম্মে বিরতি দিও না

চট্টগ্রাম জেলান্তর্গত আমিলাইস-নিবাসী জনৈক পত্র-প্রেরকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কাজ বন্ধ করিও না, কাজে ঢিলা দিও না, কাজ অবিরাম অবিশ্রাম চালু রাখ। মানুষের মন মোমের মতন নরম। নখ দিয়া রেখা টানিলে দাগ ধরে। কিন্তু গরম পড়িলেই দাগ মিলাইয়া যায়। মোমের পরত ভেদ করিয়া তোমাকে মনের পাষাণে খুদিতে হইবে। ঠুক ঠুক করিয়া হাতুড়ি পিটিয়া খোদাই করিয়া দাও,—মনুষ্যজাতির সামূহিক উন্নয়নের জন্য আমরা পুরুষানুক্রমিক ভাবে কাজ করিয়া যাইব, মাঝে মাঝে

দম লইবার প্রয়োজন ব্যতীত আর থামিব না। কত বর্ষা-শরৎ-হেমন্ত যাইবে, কত শীত-বসন্ত-গ্রীষ্ম আসিবে, তাহারা যেমন চলিবে আর চলিবে, আমরাও তেমন চলিব আর চলিব, থামিব না। কচিবয়সীরা বৃদ্ধ হইব, পক্বকেশীরা নবজন্ম গ্রহণ করিব এবং একের হাত হইতে মশাল জ্বালাইয়া লইয়া আলোক-পুলকের ঝলকে অন্ধকার তাড়াইতে তাড়াইতে ঘোষণা করিয়া যাইতে থাকিব যে, মানবজাতির সামূহিক রূপান্তর আমরা ঘটাইবই ঘটাইব, না ঘটাইয়া ছাড়িব না।"

ভাগ্যবান্

চট্টগ্রাম জেলান্তর্গত খরন্দীপ-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সে-ই প্রকৃত ভাগ্যবান্, যে বৃদ্ধবয়সেও বলিতে পারে,— যৌবনে শক্তির অপচয় করি নাই। অর্থের অপব্যয় ঘটাই নাই, কাজের সময় বৃথা বহিয়া যাইতে দেই নাই, এমন ব্যক্তির সুদীর্ঘ জীবন স্বর্গসুখ-সমন্বিত হয়। পরমায়ুর সবটুকু অপচয় করিয়া তারপরে আসিয়া বিরাগীর ভেক ধরিলাম, ইহা ত' একপ্রকারের আত্ম-প্রবঞ্চনা। শঙ্করাদি কৈশোরে, বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য আদি যৌবনে ঈশ্বরপ্রেমে মত্ত হইয়া সংসারের সুখ ভুলিয়াছিলেন। গৌতমবুদ্ধ এবং জিন মহাবীর অতীব দীর্ঘ পরমায়ু পাইয়াছিলেন। তাঁহারা অতীত জীবনের দিকে তাকাইয়া বলিতে পারিতেন,—সময় নষ্ট করি নাই, সুযোগকে হারাইয়া যাইতে দেই নাই, যৌবনের অপচয় করি নাই, তাই আজ

আমি কৃতকৃত্য, আজ আমি আনন্দ-পারাবার। এরূপ বার্দ্ধক্যই কামনীয়। যৌবনে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া যে স্বর্গবাসী হইয়াছে, সে ধন্য। আদর্শের চরণ-সেবা করিতে করিতে তুষানলে দগ্ধ হইয়াও যেজন আদিষ্ট ও অভীষ্ট কর্ম্মে লিপ্তই রহিয়াছে, সে ধন্য, সে ভাগ্যবান্। দেশ আজ সুধন্য মানুষে পূর্ণ হউক।"

সমবেত উপাসনাই আমাদের বল ও ভরসা

শ্রীহট্ট জেলান্তর্গত হরনগর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"উপাসনার বল যেন আমাদের অটুট থাকে। সমবেত উপাসনায় যোগদান করিতে আমাদের একজনও যেন কদাচ কুণ্ঠিত না হয়। সমবেত উপাসনাই আমাদের বল ও ভরসা। ব্রহ্মচর্য্যই আমাদের জীবনের বুনিয়াদ ও নির্ভরশীলা। আমরা যেন সংঘের এই সত্যিকারের মূলটিকে কদাচ উচ্ছিন্ন হইতে না দেই। চিন্তায়, বাক্যে, আচরণে আমরা যেন ব্রহ্মচর্য্য-ভিত্তিক এই সমবেত উপাসনাকে কেবলই সম্বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টা পাই। যে উপাসনায় ব্যক্তিমাত্রেই পূজক, দর্শক একজনও নাই, সেই উপাসনার মধ্যে আমরা যেন মায়ামৃগরূপ মারীচকে দেখিয়া স্বর্ণমৃগে প্রলুব্ধ না হই। নাচ, গান, বক্তৃতা প্রভৃতি নানারূপ উপসর্গ জুটাইয়া আমরা যেন ইহার অক্ষত দেহে ক্ষতের সৃষ্টি না করি। ধূনচি লইয়া, প্রদীপ লইয়া, শঙ্খ-ঘণ্টা-

মৃদঙ্গ বাজাইয়া, বাঁশী বাজাইয়া, হর্ণ হাঁকাইয়া আমরা যেন তাহার উপর তাড়কা রাক্ষসীর উৎপাত সৃষ্টি না করি। উলুধ্বনি বা শঙ্খনাদের কিছু সুযোগ ইহাতে আছে কিন্তু তাহা বিশেষভাবে সীমিত। কিন্তু এগুলি ছাড়াও সমবেত উপাসনা চলে। সমবেত উপাসনাকালে যাহা যাহা আমাকে করিতে দেখিয়াছ, তাহার অতিরিক্ত নূতনত্ব সঞ্চারণার চেষ্টা তোমরা করিও না। পঞ্চান্ন ভোগ দান, অন্নকূট সাজানো, প্রহরে প্রহরে বিগ্রহের মস্তকে শরবৎ, ডাবের জল, দুগ্ধ প্রভৃতি সিঞ্চন, ঘণ্টায় ঘণ্টায় ভোগ সরানো এবং তজ্জনিত হৈ-চৈ প্রভৃতি অনাবশ্যক আড়ম্বরকে ঠাঁই গাড়িতে দিও না। পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেণীর সাধককে আমরা আমাদের উপাসনার আসরে আমাদের সহিত একত্র বসিতে দিব বলিয়াও ঐগুলি বর্জ্জন করিয়া চলা আমাদের প্রয়োজন। বাহুল্য জটিলতাকে বাড়ায়। সারল্য কঠিন কাজকে সহজ করে। গায়ের জোরে পৃথিবীকে বশ করিতে পারিব না। সেই জনবল, সেই ধনবল আমাদের নাই। কিন্তু সারল্য তপোবলকে বর্দ্ধিত করে। আমরা তপোবলে বিশ্বকে জয় করিতে চাই। আড়ম্বর-বর্জ্জিত সরল আমাদের হইতেই হইবে। কেহ কুতর্ক করিও না, আমার কথায় কেহ প্রতিবাদ তুলিও না, অন্ধের মতন নির্দ্দেশ পালন কর। রিয়াং, কাইফেং, মলসুং প্রভৃতি আদিবাসীরাও আমাদের আপনার জন। ইংরাজ-জার্ম্মাণ-ফরাসী-মার্কিন প্রভৃতি বংশাবতংসেরাও আমাদের আপনার জন। আমরা আমাদের সমবেত উপাসনার

আসরে তপোবলে সবাইকে টানিয়া আনিব, আড়ম্বরের চমক দেখাইয়া নহে, চালাকীর কুহকে মজাইয়া নহে।"

পূর্ব্বসংস্কারের প্রভাব-মুক্তি

বরিশাল জেলান্তর্গত কীর্ত্তিপাশা-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কেহ কেহ মনে করে যে, তীর্থযাত্রা করিলে বা দেবতা-বিশেষের পূজা দিলে কিম্বা কোনও নির্দ্ধারিত প্রসিদ্ধ মন্দিরে হত্যা দিলে, মানত শোধ করিলে বিপদ কাটিয়া যাইবে। ইহার যৌক্তিকতা ও অযৌক্তিকতা নিয়া তর্কে নামিবার প্রয়োজন নাই। যাহার যেমন বিশ্বাস, তদনুযায়ী তাহাকে চলিতে দিতেই হইবে, যতদিন না জ্ঞানের উন্মেষ হয়। কেননা এইটী না করিলে দীর্ঘকাল মনের খুতখুতি থাকিয়া যাইবে। কেহ দেবমন্দিরে হত্যা দিবার পরে সত্যই ফল পায়। সে মনে করে যে, এই দেবতা জাগ্রত দেবতা, এই তীর্থ জীবন্ত তীর্থ। কেহ কেহ মন্দিরের কৃত্যাদি করিবার পরেও বিফল হয়, এবং মনে করে যে দেবতার বা তীর্থের কোন দোষ নাই, যত দোষ সব নিজের অদৃষ্টের। শতকরা সত্তর জন যেখানে বিফল-মনোরথ হইয়াছে, সেখানে তীর্থের বা প্রথার কোনও বদনাম হয় না। কেননা, শতকরা যদি ত্রিশজনেরও প্রার্থনা মঞ্জুর হইয়া থাকে, তাহা হইলে ত্রিশজনের কলকণ্ঠ প্রচারের ফলে তীর্থ বা প্রথা চিরজাগ্রত রহিয়া যায়। কেহ কেহ বিফল-মনোরথ হইয়াছে বলিয়া দেশজোড়া সকলের কখনো অবিশ্বাস

আসে না। মহামহিমান্বিত তীর্থ-সমূহের বা প্রথাগুলির সম্পর্কে আবাল্যশ্রুত এবং আকৈশোর-শ্রদ্ধিত তীর্থ বা প্রথাগুলির এই জন্যই বিলোপ ঘটে না। ইহাদের সঙ্গে লড়াই করিয়া সমাজ-সংস্কারকেরা বৃথা সময়ের অপচয় কেন করিবেন? সত্য, প্রেম, পবিত্রতা প্রচারের যেখানে প্রয়োজন সর্ব্বাধিক, সেখানে উহাই ত' আসল কাজ। ধর্ম্মের নামে নোংরামির যাহাতে প্রশ্রয় না ঘটে, আমাদের শুধু ততটুকুই লক্ষ্য করিবার রহিয়াছে। একদা ব্রাহ্ম-সমাজ মহা-উদ্যমী সংস্কারকদের প্রচারণার মাধ্যমে হিন্দুর তীর্থগুলি তুলিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়। কিন্তু তীর্থগুলি উঠিয়া যায় নাই। মোগল-পাঠানের রাজত্বকালে রাজার জাতির লোকেরা এবং বাদশা-নবাবদের নিয়োজিত সৈন্যেরা অনেক তীর্থে হানা দিয়াছেন। কিন্তু তীর্থগুলি লুপ্ত হয় নাই। লুপ্ত হয় নাই এই জন্য যে, বন্যার্ত্ত বিপন্ন মজ্জমান ব্যক্তি স্রোতে ভাসমান তৃণখণ্ড দেখিলে তাহাকেই জড়াইয়া ধরে। অলীক বস্তুকে বাস্তব-সহায় জ্ঞান করিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরার যৌক্তিকতা নাই। কিন্তু ইহা মানসিক প্রবণতার দিক হইতে কাহারও কাহারও জীবনে আংশিকভাবে সার্থকতা দিতেও পারে। আমি যতটুকু জানি, ততটুকুই যে পৃথিবীর শেষ সত্যজ্ঞান, তাহা জোর করিয়া ভাবিবার প্রয়োজনটা কোথায়? অল্পজ্ঞান ব্যক্তি বা অজ্ঞান মানব কাঠখড়ের একটা দেবতাকে কিম্বা ধাতু-প্রস্তর-নির্ম্মিত একটী বিগ্রহকে অর্চ্চনা করিয়া যদি সঙ্কটের আতঙ্ক হইতে মুক্তি পায়, তবে তাহার এই মানসিক চিকিৎসাকে আমি ব্যাহত করিতে যাইব কেন?

তাহাকে উপহাসই বা করিতে বসিব কোন্ যুক্তিতে? কাহারও আবাল্য সংস্কারের বা পরিবেশলব্ধ বিশ্বাসের উপরে অস্ত্রাঘাত করিবার আমার কোন প্রয়োজন? সে যদি আমার ধর্ম্মাচারণের উপরে আঘাত না করিয়া নিজ বিশ্বাসের অনুসরণ করে তবে আমার কলহ করিবার কিছু নাই। অপরের বুকে আঘাত না হানিয়া জ্ঞানকে প্রচার কর। অপরের মনে ক্ষোভ সৃষ্টি না করিয়া নিজ বিশ্বাসকে অনুসরণ কর। কেহ যুক্তিনিষ্ঠধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অযৌক্তিক পথে অগ্রসর হইলে তুমি হৃদয়গ্রাহী যুক্তির দ্বারা তাহার মত-পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিতে পার। কিন্তু তাহার সরল-বিশ্বাসে আঘাত করিয়া কথা কহিতে পার না। মুসলমান চিরকালই মক্কায় হজ করিবে, বৈষ্ণব চিরকালই বৃন্দাবন-তীর্থের ধূলি মুকে মাথায় কণ্ঠে পৃষ্ঠে ছোয়াইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া ছুটিবে,—ইহাকে বাধা তুমি দিতে পার না। ধর্ম্মোদ্দেশ্যে কেহ পশু বা পক্ষী হত্যা করিবে কিনা, সে বিষয়ে নিয়া তর্ক তুলিও না, নিজে যাহা ক্ষতিকর মনে কর, তাহা করিও না। এই বিষয়ে তুমি কঠোর হও"।

বারংবার মত-পরিবর্ত্তন

শ্রীহট্ট জেলান্তর্গত ইটখোলা-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যে-কোনও কাজ আরম্ভ করিতে বরং বুদ্ধি-পরামর্শ একটু বেশী সময় নিয়া কর, কিন্তু কাজ আরম্ভ করিবার পর বারংবার মতিবদল, দিক-বদল, গতি-পরিবর্ত্তন করিও না। বরং কাজ ধীরে ধীরে চলুক, যাহাতে নিত্যনবাগত পরিস্থিতি

অনুযায়ী কর্ম্মকৌশল পরিবর্ত্তিত করিয়া লইবার অবকাশ থাকে। বারংবার লক্ষ্য পরিবর্ত্তন করিও না। সুতরাং কাজ ধরিবার প্রাক্কালে লক্ষটী স্থির করিবার জন্য প্রকৃত উদ্দেশ্যটী নির্ণয় করিয়া নিবার জন্য বেশী সতর্কতার প্রয়োজন। এই সতর্কতার মানে কুতর্কাশ্রয় নহে। এই সতর্কতার মানে হইতেছে যেন অত্যুৎসাহ-বশতঃ ভুল পথে অমিতশক্তি অপচয়িত করিয়া না দেই। এই সতর্কতাকে ভীরুতা মনে করা ভুল। এই সতর্কতাকে হিসাবীবুদ্ধি কলিতে পার। অন্যেরা চমকদার উপায় অবলম্বন করিয়া বাজার মাৎ করিয়া দিতেছে দেখিয়া এমন উপায় কখনো অবলম্বন করা উচিত নহে, যাহা সততা ও সরলতার বিচারে প্রশ্নাতীত নহে।"

ঐক্যবোধ বাড়াও

ঢাকা জেলান্তর্গত টঙ্গীবাড়ী-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যেখানে যখন যে কাজটুকু করিবে, তোমাদের সুস্পষ্ট লক্ষ্য যেন থাকে যে, তাহা যেন মানুষে মানুষে একত্ববোধের শ্রীবৃদ্ধি করে, আত্মীয়তার সম্প্রসারণ করে। এমন একটী কাজও কেহ করিও না, কথাও কেহ কহিও না, যাহা মানুষের সহিত মানুষের মমত্ববোধকে, সাত্ত্বিক ঐক্যভাবকে বিভ্রষ্ট, ব্যাহত বা বিধ্বস্ত করে। জগতে নানা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে ঐক্যমূলে। সেই আসল লক্ষ্য বানচাল হইয়া যায়, যদি এক সম্প্রদায়ের লোক অপর সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ

করিতে থাকে। ঈশ্বরকল্প মহাপুরুষগণের অম্লান সাধনা বিদ্বেষান্ধ অনুরাগিগণের ক্রোধাগ্নিতে ভস্ম হইতে চলিয়াছে। ইহাই বর্ত্তমান পৃথিবী। সংঘের সম্প্রসারণের নাম করিয়া ব্যক্তিত্ব-বুদ্ধি-প্ররোচিত অন্ধেরা মানুষে মানুষে নূতন নূতন কলহ সৃষ্টি করিতেছে। আমাদিগকে এই সকল বিষয়ে সতর্ক হইতে হইবে।"

সাহস চাই

মেদিনীপুর জেলান্তর্গত মহিষাদল-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"জীবনে মানুষের মতন বাঁচিয়া থাকিতে হইলে সাহস নিশ্চয়ই চাই। রাজনৈতিক কর্ম্মক্ষেত্রে যাহারা কাজ করিবে, তাহাদের চাই দুঃসাহস এবং ফলাফলকে মোকাবিলা করিবার যোগ্য তরিদ্গতি এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি। সমাজ-সংস্কারের কর্ম্মক্ষেত্রে যাহারা কাজ করিবে, তাহাদের চাই সৎসাহস এবং একান্ত আনুষঙ্গিক ভাবে চাহি স্বভাবের নম্রতা, হৃদয়ের কোমলতা প্রাণময় দরদ এবং আপাদমস্তক সততা। সাংসারিক কর্ম্মক্ষেত্রে যাহারা কাজ করিবে, তাহাদের সাহস ত' নিশ্চয়ই চাই, সঙ্গে সঙ্গে চাই ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, ক্ষমাশীলতা এবং ছোটখাট অতীত উৎপাত অনায়াসে ভুলিয়া যাওয়ার দক্ষতা। যে-কোন অবস্থায় সাহস তোমার চাই-ই-চাই।"

আরও ত্রিশ চল্লিশখানা পত্র লেখার পরে বিকাল পাঁচ

ঘটিকায় ষ্টীমার মাদারীপুরে পৌছিল। শ্রীশ্রীবাবামণি উঠিলেন রায়বাহাদুর হীরালাল মৌলিকের বাড়ীতে।

মাদারীপুর (ফরিদপুর)
২৬শে শ্রাবণ, মঙ্গলবার, ১৩৪৩
(১১ই আগষ্ট, ১৯৩৬)

অদ্য কোনও ভাষণ নাই। সুতরাং অদ্য পঞ্চাশাধিক পত্র লিখিত হইল।

হঠাৎ যাই কি করিয়া

হুগলী জেলান্তর্গত আরামবাগ-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"একান্ত অপরিচিত হইয়াও তুমি আমার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছ এবং তোমাদের ওখানে আমাকে যাইবার জন্য আহ্বান করিয়াছ। কিন্তু হঠাৎ একটা স্থানে যাই কি করিয়া? স্থানটা আমার যাতায়াতের পথের মধ্যে পড়িলে ভাবিবার কিছু নাই। পূর্ব্ব হইতে নির্দ্ধারণ করিয়া একটী তারিখে নির্দিষ্ট সময়ে নামিব এবং যদি সভা-সমিতির ব্যবস্থা রাখ, তবে গণনারায়ণকে ভাবার পুষ্প-মালিকায় বন্দনা করিয়া সঙ্গে সঙ্গেই পরবর্ত্তী স্থানে রওনা হইয়া যাইব, সময় নষ্ট হইতে দিব না, ইহাই আমার কাজের ধারা। বলিবার কালে ঐ একটী কথাই বলিব, যে কথা চিরদিন সকল স্থানে বলিয়া আসিতেছি। আমি মহাপণ্ডিত নহি, মহাজ্ঞানীও নহি, আমার

ঝোলনাতে একটীর বেশী দুটী কথা নাই। সেই কথাটী হইল, নিষ্কলঙ্ক হও, চরিত্রবান হও, চিরউজ্জ্বল হও। আমার লেখা ছোট্ট একখানা চটি বই নিয়া জনে জনে পড়িয়া শুনাও। সেই একখানা চটি বইতে যে কয়টী সৎকথা আছে সেই কয়টী কথাকে মন্থনদণ্ড করিয়া কানে কানে, প্রাণে প্রাণে সমুদ্রমন্থন চালাও। কোথাও হয়ত হলাহল উঠিবে, ভয় পাইও না। সেই হলাহলে তোমার প্রাণবিয়োগ ঘটিবে না। আমি কোটি যোজন দূর হইতে নীলকণ্ঠ মহাদেব হইয়া সে কালকূট হজম করিব। তুমি পরিণামে অমৃতই পাইবে,—বিষ নহে। অমৃত লাভ করিতে হইলে আমার একখানা চটি বই লইয়া স্থানীয় প্রত্যেকটী প্রাণীর হৃদয়-সমুদ্রে তুমুল আলোড়ন, দুর্দ্দান্ত বিলোড়ন, প্রচণ্ড ভাবসংকর্ষণ চালাইতে থাক, বিরাম দিও না, বিশ্রাম নিও না। স্বেচ্ছায় যখন অপরিচিত সেনাপতির সৈনিক হইয়াছ, তখন একাজটী তোমাকে করিতেই হইবে। আমার পয়সা নাই যে, সংবাদপত্র-সমূহের স্তম্ভের পর স্তম্ভ দখল করিব। প্রভাব নাই যে, শত শত বক্তা-কর্ম্মী প্রেরণ করিয়া ভাষণ দেওয়াইব। আমার অবসর নাই যে, প্রতিটি স্থানে যাইয়া শ্রীহট্ট ময়মনসিংহ, রংপুরের ন্যায় দেড়, দুই তিন সপ্তাহ ধরিয়া কেবল ভাষণ দিয়া ক্ষেত্র প্রস্তুত করি। সুতরাং তোমরা যদি আমাকে ভালই বাস, তাহা হইলে আমার একখানা ক্ষুদ্র পুস্তিকা হইয়া ঘরে ঘরে তোমাদিগকে যাইতে হইবে, আমি যখন ছোট্ট বই ছাড়া কিছুই লিখি নাই, তখন

তোমাকে ঐ ছোট্ট বই লইয়াই দুঃসাহসিক অভিযান চালাইতে হইবে। দুঃসাহসিক এইজন্য বলিলাম যে, আমার পূর্ব্বে হয়ত এ দেশে আর কেহ অভিক্ষার মত রুক্ষ পথে পাদস্পর্শ দেন নাই, যাহারা নূতন কিছু করে, তাহাদিগকে যে-কোন অপ্রত্যাশিত অসুবিধার বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য অতিরিক্ত কর্ম্মশক্তি সব সময়ে রিজার্ভ বা সংরক্ষিত রাখিতে হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কি একখানা বর্ণপরিচয় লিখিয়া বাংলা সাহিত্যে যুগান্তর আনয়ন করেন নাই? আমিও হয়ত তেমনই একখানা চটি বহি 'কর্ম্মের পথে' প্রকাশ করিয়া কর্ম্মযোগ-জগতে যুগান্তর সূচনা করিতে পারিব। তোমরা এই পুঁথিখানা পড়িয়া পড়িয়া হাজার লোকের কান ঝালাপালা কর। লক্ষ লোকের প্রাণ উত্তালিত কর, কোটি নরনারীর অন্ধ নয়নের সমক্ষে চিরশাশ্বত অক্ষয় জ্যোতিষ্ক ধ্রুবতারাকে ফুটাইয়া তোল। আমার যে সকল বহি বা বাণী প্রকাশিত হয় নাই, সেইগুলি হাতে লিখিয়া লইয়া রহিমপুর অঞ্চলের কর্ম্মীরা গ্রামে গ্রামে পড়িয়া শুনাইতেছে। প্রথম প্রথম তাহারা কোথাও সমাদর পায় নাই। একই স্থানে একই কাজ নিষ্ঠা-সহকারে দুই তিন দিন বা দুই তিন সপ্তাহ চালাইয়া যাইবার পরে পরম সমাদরে সম্বর্দ্ধিত হইয়াছে। ক্ষেত্র এইভাবেই প্রস্তুত করিতে হয়। যেখানে একটী প্রাণীও আমার নাম শোনে নাই, সেখানে কাজ করিতে হইলে ইহাই ত' প্রকৃত পন্থা। শুধু নিমন্ত্রণ খাইবার জন্য, রূপ দেখাইবার জন্য ত' কোথাও যাইতে পারি না। মনুষ্য-জীবন স্বল্পকালস্থায়ী। কয়দিন এই দেহটী

বাঁচিবে? গাড়ী ছাড়িবার শেষ ঘণ্টাটী পড়িবার পূর্ব্বেই ত' করণীয় কাজ সারিতে হইবে। মানুষের মনোভঙ্গী ত' এইরূপ হওয়া উচিত। এইখানে যে আসিয়াছে, তাহা কি অমনিই হইয়াছে. যাইতে হইবে আমাকে বরিশাল, পথে মাদারীপুর পড়ে। তাই, টক করিয়া মাদারীপুর নামিয়া পড়িয়াছি। যাহার গৃহে উঠিয়াছি, তিনিও আমাকে জানেন না, আমিও তাঁহাকে চিনি না। উঠিবার কথা ছিল মহকুমা হাকিম শ্রীযুক্ত—চক্রবর্ত্তীর গৃহে। কেননা, বেশ কয়েক বৎসর আগে চক্রবর্ত্তী মহাশয় সদলবলে গিয়াছিলেন বরিশাল আলেকান্দা আমাকে মাদারীপুরে লইয়া আসিবার জন্য। তখন আসিতে পারি নাই। কথা দিয়াছিলাম, মাদারীপুর আমি আসিব লৌহজঙ্গের পথে। ষ্টীমার হইতে নামিবার পরে চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, তাহার গৃহেই উঠিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, কিন্তু গৃহে পর পর তিনটী টাইফয়েড রোগী নিদারুণ সঙ্কটাবস্থায় রহিয়াছে। এবং তাহার এই দুর্য্যোগকে সুযোগরূপে গ্রহণ করিয়া মৌলিক মহাশয় তাঁহার নিজ বাড়ীতে আমাকে লুকিয়া লইয়াছেন। পৃথিবীর সকল স্থানেই আমি যাইব, নিশ্চিন্ত থাক। দুই চারি স্থানে যাইব সশরীরে এবং অধিকাংশ স্থানে যাইব অশরীরী বাণীরূপে। দুই চারিস্থানে যাইব নয়নগ্রাহ্যরূপে, অধিকাংশ স্থানে যাইব শ্রবণগ্রাহ্যরূপে,—তবে যাইবই। সকলের কাছে যাইব, সকল ভাষায় কথা কহিব। কারণ আমি একা কাহারও সম্পত্তি নহি, আমি সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের

সকলের। সাম্প্রদায়িক চিন্তা-ভাবনার উর্দ্ধে থাকিয়া আমি আমার সকল ধ্যানকে সফল করিতে চাহি। সুতরাং যাইব সর্ব্বত্রই,—আজ কিম্বা কাল। কিন্তু হঠাৎ যাই কি করিয়া? তোমরা আমার বাহন হও, অর্থাৎ তোমরা আমার বাহু হও।

ভাঁওতাতে ভুলিও না

ময়মনসিংহ জেলান্তর্গত দেওয়ানগঞ্জ-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যাঁহারা সৎ কর্ম্মী, চেষ্টা করিয়া তাঁহাদিগকে নিজ নিজ স্থানে বারংবার আনয়ন করাও এবং তাঁহাদের অর্জ্জিত সুমহৎ জ্ঞানকে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বিতরণ করাও। তাঁহাদের এই জনসেবার মধ্যে যদি সাম্প্রদায়িক বা রাজনৈতিক কোনও গূঢ় অভিসন্ধি আছে বলিয়া টের পাও, তাহা হইলে তাঁহাদের নিজেদের ক্ষেত্র নির্ম্মাণ করিয়া দিবার কাজে তোমরা উপলক্ষ্য হইতে যাইও না। অকৈতব জীবসেবার আদর্শ লইয়া যাঁহারা কাজ করিবেন, তাঁহাদের জোয়ালে ঘাড় পাতিয়া দিতে দ্বিধাবোধ করিও না। যে-কোন মত-প্রচারককে এক কথায় আনিয়া পাদ্য অর্ঘ্য দিবার চেষ্টার মধ্যে অনভিজ্ঞজনিত হঠকারিতার কুফল ফলিতে দেখা যায়। প্রচারধর্ম্মী কোন শক্তিশালী মানুষের দেখা পাইলে কিছুকাল নিরপেক্ষভাবে তাঁহাকে পর্য্যবেক্ষণ করিও। ভাগবত-পাঠের নাম করিয়া অনেকে যেমন উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব পরিবেশন করিয়া

মানবকল্যাণ করিয়া থাকেন, তেমন আবার কেহ কেহ ঐ একই উপলক্ষ্য করিয়া অশ্রদ্ধেয় অসদ্ধর্ম্ম গোপনে প্রচার করিয়া থাকেন, ইহা যখন চোখে-দেখা ব্যাপার, তখন অনুমানে কোন অনুচিত আগ্রহ না দেখাইয়া কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া প্রকৃত মহৎ কর্ম্মীকে চিনিয়া নেওয়া প্রয়োজন। যাহারা নিজেদের প্রচারকার্য্যকে বাহ্যতঃ মহদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলিয়া বর্ণায়িত করেন, তাঁহারা যদি সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের উদ্দেশ্যটিকেও সৎ রাখেন, তবেই এমন পাত্র সৎ পাত্র, তবেই এমন ব্যক্তি বিশ্বাসভাজন। তুমি যে কাহাকেও পরীক্ষা করিবার জন্য ওৎ পাতিয়া আছ, এইরূপ ভঙ্গিমা করিয়া সি,আই,ডি,-গিরি করিতে যাইও না। কেননা, তাহা চরিত্রের অধোগতি বিধান করিবে। নিষ্কাম জগদ্ধিতকল্পে যাঁহারা প্রচারকার্য্যে বাহির হন, তাঁহাদের কাজের সুবিধা-বিধান করিয়া দেওয়া প্রত্যেকের কর্ত্তব্য। কিন্তু দেশের শত্রুরা যখন দেশের অকল্যাণ-সাধনের জন্য পঞ্চম বাহিনী বা চরগুলিকে প্রেরণ করে, তখন সাবধান থাকিতে হইবে। গান শিখিতে, নাচ শিখিতে শিক্ষকের হাতে পুত্রকন্যাকে সঁপিয়া দিলে, আর ইহারা গোপন-পদসঞ্চারে সুকৌশলে তরুণ মনগুলির মধ্যে প্রবেশ করিল এবং সকলের অজানিত ভাবে তলে তলে ইহাদের জীবনকুম্ভে উগ্র বিষ ঢালিয়া গেল, এমন ঘটনা কি জগতে অহরহ ঘটিতেছে না? অতিথিরূপে গৃহস্থের গৃহে

প্রবেশ করিয়া করাল কৃতান্তরূপে নরহত্যা করিয়া, নারীধর্ষণ করিয়া গৃহস্থের আতিথ্যের ঋণ শোধ করিল, এমন ঘটনা কি প্রায়ই ঘটিতেছে না? মুখের মধুকে প্রাণের মধু বলিয়া ভ্রম করিও না। কিন্তু সত্যিকারের খাঁটি মকরন্দ যাহার অন্তরের ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, এমন মানুষ-রতনকে চিনিতে পারিলে তাঁহাকে মকরন্দ বিতরণের আনন্দটুকু অবশ্যই পাইতে দিও। একজন যে সৎকথা বলেন, ইহাও কম কথা নহে। অনেক সৎ কথা বলিতে বলিতে, অনেক সৎকথা শুনিতে শুনিতে শ্রোতার বা বক্তার অথবা শ্রোতা বক্তা উভয়ের সৎকাজ করিবার রুচি একদিন হয়ই হয়। বিষয়টী এইদিক দিয়াও বিচার করিতে হইবে। ভাঁওতায় ভুলিও না কিন্তু সৎগুণের সম্মান রাখিতেই হইবে।"

পিতৃমাতৃ-বিরোধ করিও না

পাটনার অন্তর্গত গুলজারিবাগ-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ঈশ্বরপ্রেমিক হও, স্বদেশসেবক হও, পরোপকারী নিষ্কাম সেবাব্রতী হও, কিন্তু পিতৃমাতৃ-বিরোধ করিও না। অনেক পিতা-মাতা ঈশ্বর-সাধনে বাধা দেন। অনেক পিতামাতা দেশসেবার কার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদন করেন। অনেক পিতামাতা জনসেবার কাজকে গর্হিত মনে করেন। কিন্তু তাই বলিয়া কি কর্ত্তব্য কার্য্য হইতে বিরত হইতে পার? নিশ্চয়ই পার না।

তথাপি মন হইতে পিতৃমাতৃ-বিরোধ-কল্পনাকে দূর করিয়া দিয়া কাজ করিতে হইবে। পিতামাতারা অনেক সময়ে মনের গঠনের দিক দিয়া অজ্ঞান শিশুই থাকেন। এই কারণে তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারেন না যে, তাঁহাদের পুত্র বা কন্যা সৎপথে ধাবিত হইয়া ভাল কাজই করিতেছে। তাই, তাঁহারা তিরস্কার করেন। এই তিরস্কারকে আশীর্ব্বাদের ফুলমাল্য বলিয়া গণনা করিতে হইবে। প্রহলাদ হরিনাম ছাড়েন নাই, কিন্তু পিতামাতার প্রতি ভক্তিও কদাচ হারান নাই। এই দৃষ্টান্তটী লক্ষ্য কর।"

আসল লক্ষ্য কি

ঢাকা জেলান্তর্গত পাঁজদোনা-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যখনই যে কাজটী কর, তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখিও,

(১) কাজটী যেন সৎ হয়, এবং

(২) কাজটী যেন তোমাদের সহিত সকল মানবের ঐক্যসাধনের সহায়ক হয়।

"সৎকাজ তাহার সৎ হইবার দরুণই বিপুল আত্মবিশ্বাস প্রদান করে। ঐক্যবদ্ধতা সৎকাজের প্রয়াসকে ব্যাপক ভাবে, বিপুল ভাবে সুদীর্ঘকালব্যাপী প্রসার দান করিবার যোগ্যতা প্রদান করিয়া থাকে নিখিল জগতের অপার কুশল এবং মানব-জাতির ভাবী অভ্যুদয়কে সুনিশ্চিত করিবার জন্যই এই দুইটীতে তোমার প্রয়োজন। প্রতিটি কর্ম্মের গতি হইবে ছন্দোময়, মূর্ত্তি

হইবে শোভনীয় এবং লক্ষ্য হইবে নিরন্তর শুচিতা ও শুদ্ধতা অর্জ্জন। কাজ যতই কর বা যতই করাও আসল লক্ষটীকে আগে স্থির কর। কর্ম্মের পথে চলিবার কালে পূর্ণ অবিসংবাদিতা হয়ত তোমাদের নাও মিলিতে পারে কিন্তু কর্ম্মের পরিণামফল যেন বিধ্বংস ও বিভ্রান্তি না হইয়া হইতে পারে সম্যক্ পবিত্রতা লাভ ও পাপস্খালন, তার দিকে দৃষ্টি রাখিও।"

ক্ষমা এবং সহিষ্ণুতা

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত গৌতমপাড়া-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সতীর্থ বা সহকর্ম্মীদের দোষ-ত্রুটি খুঁজিতে যাইও না। ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া চল। যে অপরাধ ক্ষমা করিলে গোলযোগ সহজেই মিটে, তাহা ক্ষমা না করিয়া কেবলই ঘোঁট পাকাইতে থাকিলে আসল কাজ করিবে কি করিয়া? কূটিলতা যাহাদের স্বভাব, এই জন্যই তাহারা সর্ব্বত্র সৎকর্ম্মের ক্ষতি করিয়া থাকে। তাহারা অনর্থক জটিলতার সৃষ্টি করিয়া প্রতিটি কর্ম্মসূচীকে কেবলই বিলম্বিত করে। বরং তোমরা কম লোকে কাজ কর, তবু ঝগড়া-কলহ বাধাইবার দায়িত্বে যাইও না। দুঃশীল সঙ্গীকে নিয়া তীর্থ-ভ্রমণে বাহির হইলে দুষ্ট দস্যুদল তোমাকে আক্রমণ করিবার অনেক আগেই তোমার সতীর্থ-ভায়া তোমার রত্ন অপহরণ করিবে। অতএব

কাজ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই মানুষ-বাছাইয়ের কাজটী সারিয়া ফেল। কাজ আরম্ভ করিবার পরে যেন তোমাকে কেবলই থামিতে না হয়, কেবলই ঠকিতে না হয়। যাহার ভিতরে দোষের অল্পতা আছে আর গুণের আছে আধিক্য, তাহার ছোট ছোট দোষ ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার দ্বারা সংশোধিত করিয়া নেওয়া যায় কিনা, তদ্বিষয়ে একবার দুইবার তিনবার করিয়া চেষ্টা করিয়া দেখ। ক্ষমাশীল মন লইয়া কাজ করিলে লক্ষ লোককে তুমি সঙ্গে পাইবে। দোষ-ত্রুটি খুঁজিবার যুক্তিহীন খুঁতখুঁতি থাকিলে প্রিয় সহকর্ম্মীরাও তোমাকে পরিত্যাগ করিবে। ইহা আমার চিরকালের প্রদত্ত উপদেশ। হঠাৎ হাল ছাড়িয়া দিও না। মাঝ-দরিয়ায় নৌকা আনিয়া যদি ঝড়ের মুখে দেখ যে সঙ্গীরা সব মাতাল হইয়া টাল-মাটাল কাণ্ড আরম্ভ করিয়াছে, তখন কি হঠাৎ করিয়া হাল ছাড়িয়া দিয়া সবাই মিলিয়া ডুবিয়া মরিবে? এমন বিপত্তির সময়ে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় বড় কঠিন কাজ। কিন্তু সেই নিদারুণ সময়ে তোমার ভগবৎ-সাধন-লব্ধ প্রজ্ঞা তোমাকে পথ-প্রদর্শন করিবে। বিরুদ্ধকারীর সম্পর্কে দৃঢ় হও, কঠোর হও কিন্তু ক্ষমাহীন বা নিষ্ঠুর হইও না। হয়ত এমন গোপন কারণ আছে, যাহা তুমি জান না, এবং সেই গোপন কারণই তাহাকে নৌকাডুবির নায়ক করিয়া তুলিয়াছে। কর্ত্তব্য-কার্য্য কঠোর হস্তে সম্পাদন কর কিন্তু তাহার প্রতি অন্তরের দয়া এবং কারুণ্যকে

বিনষ্ট হইতে দিও না। এমন ব্যাপার মানুষের এক কঠোর পরীক্ষার স্থল কিন্তু তুমি ত' মার্জ্জার নহ, তুমি পুরুষ-সিংহ।"

চিত্তশুদ্ধি ও ঐক্যবোধ

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত উরশিউড়া-নিবাসী জনৈক পত্রলেখিকার পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যখন যেখানে যে কাজটুকু কর, তাহা নিজের চিত্তশুদ্ধি-বিধানের অনুকূল ও সতীর্থগণের সহিত ঐক্যবৃদ্ধির সহায়ক-রূপে করিতে চেষ্টা করিবে। কাজ ত' মানুষকে সমগ্র জীবন ব্যাপিয়াই করিতে হইবে, কিন্তু সেই কাজটাই প্রকৃত সার্থক কর্ম্ম, যাহার পরিণাম-ফল প্রত্যক্ষ রূপে আত্মশুদ্ধি এবং পরোক্ষরূপে মানুষের সহিত মানুষের সমত্ব, মমত্ব, একত্ব ও অভিন্নত্বের বোধ-বুদ্ধি। ইহাকেই ধরিয়া নাও কাজের সার্থকতার মানদণ্ড। আহার করিলাম আর ভাবিলাম, জগন্মঙ্গল হউক,—শয়ন করিলাম আর ভাবিলাম, জগদ্বাসীর কুশল হউক, শয্যাত্যাগ করিলাম, ভাবিলাম, সমগ্র বিশ্বব্যাপিয়া আত্মোৎসর্গ ও স্বার্থোৎসর্গ চলিতে থাকুক। আমাদের প্রতিটি কর্ম্মকে এই লক্ষ্যের সহকৃত করিয়া নিতে হইবে। ইহা অভ্যাসের ব্যাপার, ইহা বচনের বাহার নহে। অভ্যাস করিতে থাকিলে দু সপ্তাহ পরেই টের পাইবে যে, তোমার জড়পিণ্ড এই শরীরটা একটা চৈতন্যময়ী সত্তার অধিকারী হইতে চলিয়াছে। ইহা আমার অভিজ্ঞতা-লব্ধ উপলব্ধি।"

নিশ্চিন্ত থাক

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত কাকসার গ্রাম-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"নিশ্চিন্ত থাক। আস্তে আস্তে সকল সঙ্কট হইতেই মুক্তি পাইবে। বিপদ চিরজীবন তোমার দুয়ার আগলিয়া বসিয়া থাকিবে না। অনন্ত কালই তুমি বাসনার ক্রীতদাস হইয়া নিজ গৃহের অন্ধকার কোণে বন্দী হইয়া থাকিবে না। অন্তরে যখন অনুশোচনা জাগিয়াছে, তখন তুমি নিশ্চিতই মুক্তি পাইবে। মুক্তিতে তোমার শাশ্বত অধিকার এবং সেই অধিকারের অভ্রান্ত দাতা হইতেছেন পরমেশ্বর স্বয়ং। নিশ্চিন্ত হও এবং তাঁহার নামের জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া হুহুঙ্কার করিতে করিতে অর্গলবদ্ধ গৃহদ্বার ভাঙ্গিয়া ফেল, ছুটিয়া বাহির হও সেই রণাঙ্গনের দিকে যেখানে পরম-পৌরুষ-প্রবুদ্ধ শ্রেষ্ঠ মানব-সন্তানেরা পৃথিবীর দুঃখার্ত্ত দশা দূর করিবার জন্য আত্ম-বিসর্জ্জনের ব্রত নিয়া স্ব স্ব জীবনকে হোমানলে আহুতি দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। অবহেলে যাহারা বিসর্জ্জন দিয়াছে নেতৃত্ববুদ্ধি, লাভ-লোভ, খ্যাতি-প্রতিপত্তির আগ্রহ, তাহাদের কর পদাঙ্কানুসরণ।"

সর্ব্বজীবে দাও ভালবাসা

দিনাজপুর জেলান্তর্গত বিরল-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সর্ব্বজীবে দাও ভালবাসা।
নতুবা বৃথাই ভবে আসা—
নতুবা বৃথাই জ্ঞানলাভ,
চাই আগে প্রেমিক স্বভাব।
নিজহিত নহে লক্ষ্য তব
বিশ্বহিতে তোমার বৈভব;
বিশ্ববাসী হইবে উন্নত,—
ইহাই ত' তব সদাব্রত!
সবাই লভিবে মুক্তিধন,
তবে তব হ'ল জাগরণ।
কর্ম্মী যারা মোহ-তমসায়
আচ্ছাদিয়া চক্ষু নিদ্রা যায়,
জ্ঞানী যারা অজ্ঞানের মত
কেবলি নিজের হিতে রত,
তাহারা ত' পশুর মতন
অনর্থক করে বিচরণ।
সবাই সবার লাগি' যবে
সদা তপস্যায় রত রবে,
তখনি ত' পৃথিবী-প্রভুর
উপজীবে আনন্দ প্রচুর!
তখনি ত' তাঁর সৃষ্ট ধরা
বিস্মরিবে মৃত্যু আর জরা!"

আমার অন্তরে বিদ্বেষ নাই

কাছাড় জেলান্তর্গত শিলচর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আমার প্রতি কাহারও বিদ্বেষ আছে বলিয়া আমি এক কণাও বিরক্ত নহি। বিদ্বেষও এক প্রকারের স্মরণ। অনুকূল ভাবে না হইয়া প্রতিকূল ভাবেও যদি কেহ আমাকে স্মরণ করে, তবে ত' আমার কৃতার্থ বোধ করিবারই কথা। বিরক্ত হওয়ার কথা ইহা নহে। বিলাসিতা ও অব্রহ্মচর্য্যের আমি প্রতিবাদী। যাহা ভাবিলে, যাহা কহিলে, যাহা করিলে দেশবাসীর বিলাস-পরায়ণতা বাড়িবে, ব্রহ্মচর্য্য-নিষ্ঠার হানি বা চ্যুতি ঘটিবার আশঙ্কা দেখা দিবে, তাহার ভাবুক, প্রচারক ও অনুশীলনকারীকে আমি বন্দনা জানাইতে কদাচ সমর্থ নহি। আশ্রমে আমি আমার শিয়রে দুইখানা শক্ত শক্ত ইট রাখিয়া তাহাতে ঘাড় পাতিয়া রাত্রে শয়ন করি। সারাদিন শ্রমের পরে স্বোপার্জ্জিত উষ্ণ কদন্ন ভক্ষণ করি, আমার পক্ষে অন্যায়ের সহিত আপোষ করা সম্ভব নহে। জগদ্বাসীর প্রশংসা-গুঞ্জনের আমি প্রত্যাশী নহি যে, সমালোচকদের মুখ তাকাইয়া নিজের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করিব। আমার চিন্তা, বাক্য ও আচরণ নিয়ন্ত্রিত হইতেছে জগতের মহত্তম কল্যাণে নিঃস্বার্থ আত্মবিসর্জ্জনের দুর্দ্দম আকাঙ্ক্ষার অনির্ব্বাণ তাড়না দ্বারা। জীবন-কুম্ভে আমি মধু ঢালি নাই ঢালিয়াছি আমারই মেরুমজ্জা, যাহা ঘৃতের অভাবে আমার ব্রত ও আদর্শকে

নিজে জ্বলিয়া জ্বলিয়া প্রদীপ্ত রাখিবে। কেহ আমার যশোগাথা গাহিবে না, কিন্তু আমি আমার আত্মপ্রসাদকে এই পথেই অর্জ্জন করিব। যাহারা আমাকে সেকেলে বা বস্তাপচা মালের পসারী বলিয়া বর্ণনা করিতেছে, তাহারা ভুলিয়া যাইতেছে যে, আমি জ্ঞান বিতরণ করিয়া বিনিময়ে কিছু নেই নাই বা প্রত্যাশাও করি নাই। আমার বৃত্তি স্বাবলম্বন, আমার ব্রত অভিক্ষা, আমি আবার অপরের প্রত্যাশা রাখিব কেন? চিরকাল আমার পার্থিব চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়নিচয় সজাগ সজীব ও সুসমর্থ থাকিবে না, তবু আমি আমার বৃদ্ধ কালের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া একটী কপর্দ্দক সঞ্চয় করিবার চেষ্টা করি না, আর আমি আমার ভাণ্ডারে তোমার বিদ্বেষগুলিকে সযত্নে ভরিয়া রাখিব? তোমরা যতখানি অসুন্দর ব্যবহার একদা আমার প্রতি করিয়াছ, তাহার শতগুণ সদ্ব্যবহার আমি তোমাদিগকে ফিরাইয়া দিব আমার নিঃস্বার্থ সেবা দিয়া।"

আন্দোলন

কাছাড় জেলান্তর্গত মুক্তাছড়া-নিবাসী জনৈক পত্রপ্রেরকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আন্দোলনকে ছোট ছোট অনুষ্ঠানের দ্বারাই জীয়াইয়া রাখিতে হয়, যেমন গুড়ের পাক জ্বাল দিতে হইলে অধিকাংশ সময়ে তুষের আগুনই বেশী কাজ করিয়া থাকে। আমার সংস্পর্শ লাভ তোমার জীবনে যদি কোনও উল্লেখযোগ্য আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াই থাকে, তবে বলিব, নিতান্ত অন্তরঙ্গ

ও সমমতসম্পন্ন বান্ধব ব্যতীত অন্য কাহাকেও এই আন্দোলনের সঙ্গী করিও না। আন্দোলন মাত্রেরই কতকগুলি অবশ্যম্ভাবী গুণ আছে, আবার দোষও আছে। আন্দোলন যখন যশোবৃদ্ধির কারণ হয়, তখন অনেক কর্ম্মীর অহমেদমত্ততা প্রকৃত কাজকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিবার ষড়যন্ত্র করে। আন্দোলন যখন পুনঃপুনঃ অনুশীলনের বারিসিঞ্চন হইতে বঞ্চিত হয়, তখন নিদাঘ-দাব-দগ্ধ বনাগ্নির ন্যায় সৎসঙ্কল্পকে দগ্ধিয়া পুড়িয়া ছাই করিয়া দেয়। দুই দিকই বিবেচনা করিয়া দেখিও। আজ তোমাদের জেলাতে কত সন্তর্পিত পদ-সঞ্চারে চলিতেছি, কোথায় আমি কাহার মধ্যে কি কাজ করিতেছি, তাহা না জানে সংবাদপত্র, না জানে জন-সাধারণ। কিন্তু একদা আমার কাজ তাহার নিজের ধর্ম্মেই সুব্যাপ্ত এক বাহ্য প্রকাশ নিবে, যাহার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া তোমার জেলার একটী চক্ষুও জোর করিয়া ঘরে বসিয়া থাকিতে পারিবে না। সেইদিনও এই প্রশ্নটিই উঠিবে। অনেক কর্ম্মী মিলিয়া যাহারা কাজ করিতে নামিয়াছে, তাহারা সকলে একই তালে গান গাহিতেছে ত'? না কি তাহাদের এক এক জনের এক এক তাল? নাকি তাহাদের এক এক জনের এক এক সুর? তাহাদের তানপূরা কি গোড়াতেই ঠিক সুরে বাঁধা আছে, না তানপূরার একটা তার অকল্যাণকর ভাবে চড়া, আর একটা তার অকর্ম্মণ্য ভাবে ঢিলা? আমাকে বড়ই দ্রুত কাজ করিতে হইতেছে। কোথাও দুই দিন জিরাইয়া তানপূরার তার ঠিকমত কাণ টিপিয়া বসাইবার অবসর পাইতেছি না। হয়ত পরিণামে

অনিবার্য্য বেসুরা বেঢক্ বদ-রাগ্-রাগিণী ইহার অপরিহার্য্য পরিণাম হইবে। কিন্তু আমার যে বাবা উপায় নাই। আমি যে অনিকেত, আমি যে অকিঞ্চন, আমি যে অভিক্ষু। কার গৃহে দুই দিন বিশ্রাম করিয়া গৃহস্থের আশ্রম-পীড়া উৎপাদন করিব?"

দুই তিন গ্রাম লইয়া মণ্ডলী

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত নয়নপুর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"দুই তিনটী গ্রাম মিলিয়া নিশ্চয়ই একটী অখণ্ড-মণ্ডলী গঠিত হইতে পারে। মণ্ডলী-সৃষ্টির পরে আস্তে আস্তে সদস্যসংখ্যা বর্দ্ধিত হইবার ফলে একটী মণ্ডলীই বিভক্ত হইয়া তিনটী পৃথক্ পৃথক্ মণ্ডলীতে পরিণত হইতে পারে। কিন্তু তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রীতিকর ও স্নিগ্ধ হওয়া প্রয়োজন। তিনটী লোক একত্রে মিলিত হইলেই যে জাতির লোকেরা কলহের চূড়ান্ত চর্চ্চা শুরু করিয়া দেয়, সেই জাতির হাতে ভারতবর্ষের ভাগ্যফল কি ফলিবে, অনুমান করা শক্ত। কিন্তু মণ্ডলী-গঠনের আসল উদ্দেশ্যই যে হইতেছে ঐক্যসাধনা। এই কথা কেহ ভুলিও না। কলহ করা আবহমান অতীত কালের চিরাচরিত স্বভাব বলিয়াই তাহা করিয়াই অনন্ত-ভবিষ্যৎ কাটাইতে হইবে, এমন মাথার দিব্যি তোমাদিগকে কে দিল?"

শহর ও পল্লী

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত রাজাপুর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আমি গ্রামই ভালবাসি। শহর, বন্দর, রাজধানী প্রভৃতির প্রতি মনের কোনও বিরাগ বা বিদ্বেষ না থাকিলেও পল্লীতেই প্রাণের শিকড় বিস্তারিত করিয়া দিয়াছি। পল্লীতে গেলে আমি যেন প্রাণ-রসের আস্বাদন পাই। শহরের অতিমাত্রার সভ্যতাভিমান যেন চিত্তকোণে আশঙ্কার উৎপাদন করে। অবশ্য প্রয়োজন পড়িলে শহরকেও বন্যার জলে ভাসাইয়া দিবার জন্য নিশ্চয়ই যাইব। জ্ঞান, বিদ্যা, পাণ্ডিত্য বা দৈববল নাই বলিয়া আমি কাজের সময়ে ভয় পাইব না। প্রতিটি গ্রামের প্রতিটি সরলবিশ্বাসী সাধুচরিত্র মানব-মানবীকে তোমরা আগে আমার বাণীগুলি শুনাও। শহরে-বন্দরে পরে দেখা যাইবে।"

দুশ্চিন্তার বিষয়

অপরাহ্নে জনৈক ভদ্রলোক সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। নিজের পরিচয় দিলেন জনৈক সাংবাদিক বলিয়া। তিনি প্রশ্ন করিলেন,—ফরিদপুর জেলাতে অসংখ্য হিন্দু খ্রীষ্টান-ধর্ম্মে দীক্ষিত হ'য়ে যাচ্ছে। আপনারা তার কিছু প্রতীকার কর্ত্তে পারেন না কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হিন্দু-ঘরের ছেলেমেয়ে কেউ খ্রীষ্টান হোক্ বা মুসলমান হোক, একে আমি বিপদ ব'লে মনে করি না। যে-কেউ যদি দেশদ্রোহী হয়, তবে সেটাই

আমার দুশ্চিন্তার বিষয়। কেউ যদি চরিত্রহীন হয়, তবে সেটা আমার দুশ্চিন্তার বিষয়। খ্রীষ্টান বা ইসলাম ধর্ম্ম আমার মনে দ্বেষ, শঙ্কা বা বিরক্তির সৃষ্টি করে না। মানুষগুলি যদি স্বেচ্ছাচারী হয়, স্বৈরাচারী হয়, উন্মার্গগামী হয়, বিকৃতবুদ্ধি হয়, তবেই দুশ্চিন্তার কথা। দেশমধ্যে হিন্দুর সংখ্যা বাড়্‌ল না খ্রীষ্টান বাড়্‌ল, বৌদ্ধ বাড়্‌ল না মুসলমান বাড়্‌ল, এটা একটা সমস্যাই নয়। দেশে মানুষ বাড়্‌ল না অমানুষ বাড়্‌ল, এইটাই সমস্যা। সর্ব্বজাতি সর্ব্ববর্ণের নিকট আমার অন্তরের আবেদন এই যে, মানুষ গড়ার কাজে সবাই হাত লাগাও। অন্যান্য সকল কাজ এ কাজের তুলনায় তুচ্ছাতিতুচ্ছ। আপনি একজন সাংবাদিক হ'য়ে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেশের সমস্যাকে দেখ্‌তে চাচ্ছেন কেন?

সাংবাদিক মহাশয় কিঞ্চিৎ লজ্জিত ভাব প্রকাশ করিলেন। বলিলেন,—যখন যেরূপ দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যাকে দেখ্‌লে আমাদের কাগজের কাটতি বৃদ্ধি পাবে, তখন আমরা তেমন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি। কারণ, সাংবাদিকতা আমাদের ব্যবসায়।

সাংবাদিকতা ও দেশসেবা

শ্রীশ্রীবাবামণি দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন,—না, সাংবাদিকতাকে ব্যবসায়ের দৃষ্টিতে কদাচ দেখবেন না। দেশের প্রকৃত হিত কিসে হ'তে পারে, সেইটিই আপনাদের আগে দেখা কর্ত্তব্য। সংবাদের চমক সৃষ্টি ক'রে কাগজের বিক্রয়-সংখ্যা বর্দ্ধনই

কদাচ আপনাদের লক্ষ্য হ'তে পারে না। আমরা ত' অতি সাধারণ সাংবাদিককেও একজন জনদরদী দেশহিতৈষী মহৎ সেবাব্রতী মানুষ ব'লে জ্ঞান করি। আমাদের দৃষ্টিতে সাংবাদিকতা আপনাদের জীবিকা নয়, ওটা আপনাদের ব্রত। আমার যেমন বক্তৃতা দেওয়াটা জীবিকা নয়, পরন্তু ব্রত। এই যে আমি স্থানের পর স্থান উল্কার মত ঘুরে বেড়াচ্ছি, কোথাও কি কোনো লোকের কাছ থেকে অর্থ-সংগ্রহের চেষ্টা করেছি? বক্তৃতা দান আমার জীবিকা হ'লে অনেক পয়সা নিশ্চয়ই কামাই করা যেত। কিন্তু ওটা আমার ব্রত। তাই, পয়সার লোভ নাই, পয়সার প্রলোভন আমাকে পথ-ভ্রষ্ট করে না। নির্ভয়ে আমি আমার শ্রোতৃমণ্ডলীতে অতীব তিক্ত এবং রুক্ষ কথা শুনিয়ে দিতে পারি, যদি মনে করি যে, তাতে দেশের লোকের চরিত্রোন্নতির সহায়তা হবে। ব্রত ব'লেই এটা আমি পারি। জীবিকা হ'লে কথাবার্ত্তা বলার আগে তিনবার নিজের রসনাকে সাবধান ক'রে দিতাম।

আমার কর্ম্মপন্থা অভ্রান্ত

কথা উঠিল, কলিকাতা হইতে প্রচারিত সংবাদপত্র-সমূহ চরিত্রগঠন-আন্দোলন সম্পর্কে কোনও সংবাদ কেন প্রকাশ করেন না।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পরেও হয়ত সেই লোকগুলির মধ্যে অনেকের সঙ্গে আমার দেখা হবে, যারা এখন সাক্ষাৎ ভাবে আমার কণ্ঠ-নিঃসৃত আত্মগঠনী

বাণী শুনে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে অনেকে তখন বৃদ্ধ হবে, অধিকাংশেই হবে প্রৌঢ়। কিন্তু তারা প্রতিজনে সুস্পষ্ট ভাষায় বল্‌তে বাধ্য হবে, একণ্ঠ একবার যখন শুনেছি, তখন জীবনে আর ভুল্‌ব না। এইখানেই আমি সংবাদপত্র অপেক্ষাও নিজেকে অধিকতর শক্তিশালী মনে করছি। তার কারণ এই যে, আমার কর্ম্মপন্থা অভ্রান্ত। এমনও হ'তে পারে, এখান থেকে বরিশাল যাবার পূর্ব্বেই আমার কণ্ঠ চিররুদ্ধ হ'য়ে যেতে পারে। কিন্তু তথাপি আমি আশা রাখি যে, আমার কণ্ঠের অনুরণন সেদিন পর্য্যন্ত নিশ্চিত থাকবে, যেদিন পর্য্যন্ত সমগ্র পৃথিবীতে বঙ্গ ভাষী পুরুষ বা নারী একটিও জীবিত থাকবে। চরিত্রহীনতাই যে ভারতীয় জাতির তথা পৃথিবীবাসী সকল জাতির লোকের প্রধানতম সমস্যা, একথা আরও অনেকে বুঝেছেন কিন্তু ঘর ছেড়ে বাইরে বেড়িয়ে পড়েন নি। আমি যা বুঝেছি, তাকে সুপ্রচারিত করবার জন্য নির্ভয়ে বেরিয়ে পড়েছি। আমার পথ সত্য পথ, এর জয় হবে না, ত' জয় হবে কি সংবাদ-পত্রের বিজ্ঞাপনের? আমিও কোথাও আসার আগে যথেষ্ট বিজ্ঞাপন ছড়াই। আপনাদের এখানে আসার আগে মাদারীপুরের চারদিকে আমি আস্‌ব বলে বিজ্ঞাপন ছড়িয়েছি এবং ভরসাও করি এই দাম্ভিক লোকটাকে একবার দেখে যাবার জন্য দুই এক হাজার লোক সভাস্থলে আসবেনই। আমি নিশ্চিত জানি, তাঁরা ঢিল ছুঁড়বেন না, টিটকারী দেবেন না। সভাস্থল ত্যাগ করবেন না, নিঃস্তব্ধ হ'য়ে আদ্যোপান্ত মন্ত্রমুগ্ধবৎ কথা শুনবেন এবং শেষের দিকে মনে মনে ভাববেন, আরও একদিন যদি

বক্তৃতা হ'তো! এভাবে হয়ত পাঁচ দিন সাত দিন তাঁরা বক্তৃতা শুনবেন। কিন্তু তারপরে হঠাৎ একদিন দেখবেন এ লোকটা শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে,—চলে যাচ্ছে ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ ক'রে নিয়ে নয়, চলে যাচ্ছে আত্মপ্রসাদে স্ফীত বক্ষ নিয়ে। এই দুঃসাহসের সঙ্গে কি সংবাদ-পত্রের বিজ্ঞাপন পাল্লা দিতে পারে? কখনো পারে না। মাতা সরস্বতীর বরে আমার সভাস্থলে, আর আমার দীক্ষার ঘরে আগ্রহী জনতার বিরলতা কখনো হয় নাই।

এখানেও দীক্ষা দিবেন নাকি

সাংবাদিক প্রশ্ন করিলেন,—এখানেও দীক্ষা দেবেন নাকি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—না, এখানে কাউকে দীক্ষা দেব না। এখানে কয়েক জন মহাপুরুষ মানুষকে তাঁদের আধ্যাত্মিক সেবা দিচ্ছেন। আমি তাঁদের ঘরোয়া কর্ম্মক্ষেত্রের মাঝখানে বেসুরা রাগিণী গাইব না। ভেদবুদ্ধি যাতে বাড়ে, এমন কাজ আমি করি না। যেখানে কাজ করার কেউ নেই, আধ্যাত্মিক দীক্ষা আমি কেবল সেইখানেই দেই। অন্যের চষা ক্ষেতে আমি বীজ বুনি না। অন্যের গড়া মানুষগুলিকে নিয়ে আমি টানাটানি করি না। ঐরূপ অধ্যবসায়কে আমি শকুনির বৃত্তি বলে জ্ঞান করি।

সাংবাদিক প্রশ্ন করিলেন,—এখানে দীক্ষার্থী আছে নাকি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আছে ত' নিশ্চয়ই। তবে তারা দীক্ষার খবর পায় বিজ্ঞাপনে নয়,—স্বপ্নে।

কিয়ৎকাল পরেই পাঁচ ছয় জন ভদ্রলোক শহরের নানা উপকণ্ঠ হইতে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং দীক্ষা পাইবার বাসনা জ্ঞাপন করিলেন?

সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করিলেন,—এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার কি ক'রে ঘটল স্বামিজী?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এরা সব উত্তম আধার। পিতামাতার যত্নে এদের দেহ-মন তৈরী। তবে এদের ক্ষেতে অন্য মহাপুরুষের লাঙ্গল পড়ে গেছে। এখানে বীজ বুনব না।

সাংবাদিক বলিলেন,—এ খবরটা সংবাদপত্রে প্রকাশ করতে চাই।

ম্যাজিক ও লজিক

শ্রীশ্রীবাবামণি করজোড়ে কহিলেন,—আমি প্রতিবাদ কচ্ছি। ম্যাজিকে চরিত্র-গঠন হয় না। ম্যাজিকের দৌড় আমোদ-প্রমোদের দরজা পর্য্যন্ত। আমোদ-প্রমোদের জগৎ আর চরিত্র-সাধনার জগৎ সম্পূর্ণ আলাদা। চরিত্র-গঠন কঠোর সাধনার পথ। ম্যাজিক দেখানো যৎসামান্য মনোযোগের পথ। ম্যাজিকের চর্চ্চা আমি কখনো করিনি, করবও না। আমি লজিক পছন্দ করি, আমার মূল উপপত্তি হচ্ছে, সাধনা করলে সিদ্ধি আসে। কঠোর সাধনা করলে অকল্পনীয় শক্তি আসে। ভোজবাজী আর ভানুমতীর খেল ত' রঙিন ফানুস বা ফুলঝুরি ছাড়া আর কিছুই নয়।

সাংবাদিক মহাশয়ের নাম শ্রীবীরেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মাদারিপুর (ফরিদপুর)
২৭শে শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৪৩
(১২ই আগষ্ট, ১৯৩৬)

প্রাতে শ্রীশ্রীবাবামণি নিদ্রোত্থিত হইয়াই স্নান সারিলেন এবং দীক্ষাপ্রার্থীদের ঘরে ঘরে যাইয়া দেখা দিলেন।

শহরের উপকণ্ঠগুলি জলময়। সুতরাং প্রায় স্থানেই নৌকার প্রয়োজন হইল।

আমি কলা খামু

একস্থানে একটা নৌকার ভিতরে একটা ছেলেকে তার মা মারিতেছিল। ছেলেটি চিৎকার করিয়া কাঁদিতেছিল, "আমি কলা খামু।" ছেলেটি যতবার কলা খাইতে চাহে, তার মা ততবার তাহাকে মারে।

শ্রীশ্রীবাবামণি চীৎকার করিয়া বলিলেন,—থামো মা, থামো, আমি কলা পাঠাচ্ছি।

সঙ্গী একজন ভদ্রলোক বলিলেন,—ওটা নিয়ে আপনি ভাববেন না। ও হচ্ছে বেদেদের মেয়েছেলে। ছেলেপেলেকে নির্দ্দয় ভাবে প্রহার করাই ওদের স্বভাব।

শ্রীশ্রীবাবামণি প্রথম যে ভদ্রলোকের বাড়ী উঠিলেন, তিনি সস্ত্রীক প্রণতঃ হইয়া বলিলেন,—মহাপুরুষ, তুমি নারায়ণ তোমাকে প্রণাম করি।

নারায়ণ কে

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—আমি নারায়ণ নই, নারায়ণ ঐ বেদের ছেলেটা। ওরা হিন্দু না মুসলমান, কেউ জানে না, নৌকাতেই জন্মে, নৌকাতেই সারা জীবন কাটায়। কলাগুলো নিয়ে নৌকাতে তাকে দিয়ে এস।

গৃহস্থ সানন্দে সাহ্লাদে আদেশ পালন করিলেন। ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—আমাদের দীক্ষার কি হবে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আগে থেকেই একটা ভাবের আশ্রয় নিয়ে আছ। তাই-নিয়াই আমৃত্যু নিষ্ঠায় লেগে থাক। দুনিয়ার সব লোককে আমার কাছেই দীক্ষা নিতে হবে, এমন কোনও কথা নাই।

দ্বিতীয় গৃহস্থের গৃহেও অনুরূপ অভ্যর্থনা হইল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সব রাস্তাতেই ভগবানকে পাওয়া যায়। যার যেটা হাতের কাছে, সে শুদ্ধ মনে, সুস্থ প্রাণে সেই পথ ধ'রেই এগিয়ে যাক্। জগদ্বাসী সবাই একই জগৎপতির কাছে পৌঁছে যাবে।

সংস্কৃতের মহিমা

তৃতীয় গৃহস্বামী স্থানীয় বিদ্যালয়ের সংস্কৃতের শিক্ষক। তিনি বহুবিধ সংস্কৃত স্তোত্রাদি পাঠ করিয়া এবং ধূপদীপ দিয়া আরতি করিয়া সম্বর্ধনা জানাইলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ঐ জন্যই আমি বামুন পণ্ডিত

লোকদের খুব ভালবাসি। চিকিৎসকেরা যেমন ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় রোগীদের উপকার করেন, সংস্কৃতের পণ্ডিতেরা তেমন ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় জাতির উপকার কচ্ছেন। জাতি মানে ভারতীয় জাতি, হিন্দু বা মুসলমান জাতি নহেন। এখন মুসলমানেরা সংস্কৃত কিছুই বোঝেন না, কিন্তু কালক্রমে বুঝবেন। সংস্কৃতের মেজাজ সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ, নির্ম্মৎসর। এই মেজাজটুকুর জন্য সংস্কৃত ভাষা বিশ্বহিতকারী। অধিকাংশ পুরোহিত ভুল সংস্কৃত উচ্চারণ করেন। তবু আমার সংস্কৃত শুনতে বড় মিষ্টি লাগে। অর্থ যদি নাও বুঝি, তবু সুস্বাদু মনে হয়। শ্রবণ-রসায়নী ভাষা এই সংস্কৃত ততকাল থাকবে, যতকাল হিমালয় আছে। ততকাল সংস্কৃত থাক্‌বে, যতকাল ভারত মহাসাগর আছে। "বসুধৈব কুটুম্বকম্" এটাই এর সার বাণী। স্মরণাতীত কাল থেকে সংস্কৃত ভাষা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাষ্ট্রকে এক সূত্রে গেঁথে রেখেছে। সংস্কৃতের যেদিন মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে, সেদিন এই রত্নমালা থেকে একটী দুটী করে নক্ষত্রবৎ উজ্জ্বল মহামাণিক্য আলগা হ'য়ে ছিঁড়ে খসে পড়তে পারে। নানা শ্রেণীর আর্য্যেতর জাতির এবং কেন্দ্রভ্রষ্ট কোন কোন আর্য্যগোষ্ঠির কল্পিত বা প্রথাপ্রাপ্ত দেবদেবীদিগকে কুক্ষিগত করার চেষ্টায় দ্বিসহস্রাধিকবর্ষ অতিক্রম ক'রে সংস্কৃত-সাহিত্য-শাস্ত্রীরা বিপুল সাহিত্য সৃষ্টি ক'রে সরল পথকে জটিল না করলে একেশ্বরবাদী বৈদান্তিক ধর্ম্ম যে-

কোন ব্যক্তির পক্ষে আরও সহজগম্য, সহজবোধ্য হ'ত। বুদ্ধদেব সংস্কৃত ভাষা পরিত্যাগ ক'রে শাস্ত্র-রচনা করেছিলেন। ফলে, তা জনসাধারণ্যে বোধগম্য হ'ল। এটা লাভ। কিন্তু সংস্কৃতে তাঁর শাস্ত্র রচিত না হওয়াতেই ভারতের বুদ্ধিজীবী-সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে বৌদ্ধশাস্ত্র-চর্চ্চা কমে গেল। এটা ক্ষতি। ভারত থেকে বৌদ্ধ ধর্ম্ম নির্ব্বাসনের এটাও একটা গৌণ কারণ। রাজনৈতিক হট্টরোলে বা সাম্প্রদায়িক গণ্ডগোলে বা বৃটিশের রাজশক্তির দুর্ব্বলতায় যদি ভারতের কোন অংশ বা ব্রহ্মদেশ কখনো আলাদা হ'য়ে যায়, তবে তার মধ্যে ঐক্যবোধ বজায় রাখার জন্য স্থায়ী ভাবে কার্য্যকর সদুপায় যেটি হবে, তা হ'লে, সংস্কৃত ভাষায় যোগাযোগ। ইংরেজী আজ প্রায় সমস্ত পৃথিবীর ভাষা। সুতরাং ওটা বর্জ্জন করার চেষ্টা বৈজ্ঞানিক ও রাজনৈতিক আত্মঘাত হবে। সংস্কৃত একদা আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান থেকে শুরু ক'রে আসামেরও অধিকাংশ অঞ্চলে দেবভাষা রূপে পূজিত ছিল। পতঞ্জলি ও পাণিনির জন্মভূমি আফগানিস্থান আজ প্রায় পূর্ণতঃ ইসলাম-ধর্ম্মাবলম্বীদের দেশ হলেও সংস্কৃত-চর্চ্চা বর্জ্জন কত্তে সে দেশ পারেনি। আমাদেরও বর্জ্জন করা ভুল হবে। বেনু, বীণা, বীর ও বজ্র, চারটিই সংস্কৃত শব্দ। এই চারটির সদ্‌গুণাবলী আমাদের মধ্যে যখন সামাঞ্জস্যীভূত হবে, তখনই আমরা সংস্কৃত শিক্ষাকে সার্থক করতে পারব।

দীর্ঘ আলোচনান্তে পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—আমাদের দীক্ষার কি হবে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্বপ্নে যা পেয়েছ, তাই ত' যথেষ্ট।

প্রণবের মহিমা

পণ্ডিত মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—প্রণব? যা আপনি স্বপ্নে আমাকে দিয়েছেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হ্যাঁ, প্রণব, যা আমিও স্বপ্নে বা জাগরণে সর্ব্বসময় মনে মনে জপ করার চেষ্টা করি। নামটী যে-কোনো প্রকারেই হোক্, জেনেছ। এখন অবিরাম তা স্মরণ কর। আনুষ্ঠানিক দীক্ষা আমি দিলুম বা না দিলুম, তাতে কিছুই যাবে আসবে না। এ নাম বিশ্বদেবের বিশ্বনাম। এ নাম সকল নামের সমষ্টি, সকল নামের সমন্বয়, সমাহার ও প্রাণ। এই একটী নাম সকল নামে নিত্যকাল আছে, ছিল, থাক্‌বে। এই একটী নাম জপলে সকল মন্ত্র এক সঙ্গে জপ করার ফল হয়। এ নাম জপ করলে জগতে আর কোনও মন্ত্রই জপতে হয় না, একটী নামেই সকল নামের কাজ হ'য়ে যায়, এক নামের সেবাতেই সকল নামের সেবা সুচারু রূপে সম্পন্ন হয়। এ নাম যে পায়, তার আর গুরুও লাগে না, নামই তার গুরু হ'য়ে তাকে হাতে ধ'রে আঁধার-ঘোরে নিরাপদে জীবনের পরম লক্ষ্যে চরম গন্তব্যে পৌঁছে দেয়।—তবু যদি দীক্ষা নিতে হয়, কিছু দিন পর নিও। দীক্ষার মত কাজ এত তাড়াহুড়া ক'রে সারতে নেই।

গলদশ্রুলোচনে পণ্ডিত মহাশয় আদেশ পালনে সম্মত হইলেন এবং সস্ত্রীক প্রণত হইলেন। *

সম্প্রদায় গড়িতে ভয় পাই

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেখ পণ্ডিত, আমি নূতন একটা সম্প্রদায় গড়তে ভয় পাই। জগতে অধিকাংশ ধর্ম্ম-প্রবক্তা জগদ্ব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার নাম ক'রেই দীক্ষাদান শুরু করেন। পরে ঐ শিষ্যেরা বা অনুশিষ্যেরা প্রথমে আরম্ভ করে পরধর্ম্মেদ্বেষ কত্তে, তারপরেই তারা আরম্ভ করে নিজেদের মধ্যে আবার উপদল সৃষ্টি ক'রে ভ্রাতায় ভ্রাতায় বালি-সুগ্রীবের কুস্তি লড়তে। ধর্ম্মমত-রূপ শ্রীরামচন্দ্রকে ফুসলিয়ে ফাসলিয়ে গোপনে অবস্থান ক'রে অধর্ম্ম-উপায়ে বালি বধ কত্তে বাধ্য করে। জগতের প্রায় অধিকাংশ ধর্ম্ম-সংঘের সাম্প্রদায়িক রূপটা এই প্রকার। ধর্ম্মের যে শীতল ফোয়ারা পরমপিপাসার পরিতৃপ্তি সাধনের জন্য ছিল একমাত্র অবলম্বন এবং আশা ও ভরসার আশ্রয়, সে তখন প্লাবন-বেগে স্ফীতকায় হ'তে হ'তে কূলঙ্কষা নদীতে পরিণত হয় এবং উন্মত্তা রাক্ষসীর মত দুই কূলের যেখানে যত জীবজন্তু পায়, মানুষ-গরু-ছাগল-ভেড়া, পুরুষ-নারী-বালক-বৃদ্ধ, সবাইকে ধ'রে ধ'রে জ্যান্ত চিবিয়ে খায়। তার দশন-পংক্তির ফাঁক দিয়ে অবিরল, অবিশ্রাম, টাটকা শোণিত-ধারা বইতে থাকে এবং সেই দৃশ্য দেখে

* এই পণ্ডিত মহাশয় কয়েকদিন পরে বরিশাল গিয়া কালীবাড়ী রোডে উকিল শ্রীযুক্ত রোহিণী লাল রায়ের বাড়ীতে সস্ত্রীক দীক্ষা নিয়া আসিয়াছিলেন।

পাষাণী বন্যার অন্তরে একটু দয়া বা মায়া জাগে না। সে খিলিখিলি অট্টহাসি হেসে চিৎকার করতে থাকে, আরো মুণ্ড চাই, আরো মুণ্ড চাই। সম্প্রদায় গড়ার এইখানেই মারাত্মক দোষ। এই জন্যই আমি বলি, আমার কোন সম্প্রদায় ত' নেই, সব সম্প্রদায় আমার। এই জন্যই আমি বলি, আমি গুরু নহি, গুরু ভগবানের নাম। না আমি গুরু, না আমি গতি, না আমি গন্তব্য, সব নাম একই নাম, আর এক নামের ভিতরেই সব নাম আছে। "ওম্" কথার মানে হাঁ, yes, প্রণবের ভিতর ত' সাম্প্রদায়িক ভাব নেই। প্রণব সর্ব্বতত্ত্বের স্বীকৃতি। প্রণব মন্ত্রের জাপক সকলের সব মন্ত্রকে শ্রদ্ধা করতে বাধ্য, কিন্তু সে সকলের সব মন্ত্র জপ করতে বাধ্য নহে। আমাদের সমবেত উপাসনাটাও তাই। একমাত্র প্রণব ছাড়া আর কোন বিগ্রহ সেখানে থাকবে না। কিন্তু বিশ্বসংসারের বৈচিত্র্য একসঙ্গে বিরাজ কত্তে পারে, মুদ্রিত-নয়ন জাপকেরা যদি চোখ বোজার সময়ে নিজ নিজ ইষ্টমন্ত্র নিষ্ঠার সহিত জপে যায়। বাহ্য ব্যাপার দিয়ে সব সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপন একটা ভ্রান্ত চেষ্টা। একই ব্যক্তি, তিলক, ত্রিপুণ্ড্র কণ্ঠী একসঙ্গে ধারণ কত্তে পারে কিনা, এটা একটা গোলমেলে প্রশ্ন। একই ব্যক্তি ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানে অর্দ্ধচন্দ্র-লাঞ্ছিত পতাকা, ত্রিশূল এবং প্রশ্নচিহ্ন বোধক মহাকালীর খড়্গ প্রতীক চিহ্ন রূপে ব্যবহার কত্তে পারে কিনা, এমন প্রশ্ন করাটাই একটা বিদ্‌ঘুটে কাণ্ড। শিববলয়, রুদ্রাক্ষের মালা, তুলসীর মালা এবং

নরাস্থি মালা আর তার সঙ্গে শঙ্খিনী সাপের মেরুদণ্ডের মালা একই সঙ্গে একই ব্যক্তি ব্যবহার কত্তে পারে কিনা, এরূপ জিজ্ঞাসা ত' প্রায় অবান্তব ভোগ-নৈবেদ্যের বেলা একই ধর্ম্মানুষ্ঠানে কুক্কুট-মাংস, শূকর-মাংস, গোমাংস, কচ্ছপমাংস, কুক্কুর-মাংস, শৃগাল-মাংস, মার্জ্জার-মাংস, শকুনী, গৃধিনীর মাংস নিবেদন করা যায় কিনা, এরূপ প্রশ্ন তোলবার আগেই ত' মারামারি হবে। নর-মাংস বা নারী-মাংসের কথা নাই তুললাম। কিন্তু এসব প্রশ্নের সম্ভাবনা বাদ দিয়েও ধর্ম্মানুষ্ঠান করা যায়। সেই অনুষ্ঠানটী হচ্ছে আমাদের সমবেত উপাসনা, যা আমি জোর ক'রে প্রবর্ত্তন করি নি, যা আস্তে আস্তে নানা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভক্তদের সমাগমে আপনা আপনি প্রসারিত হচ্ছে, আপনা আপনি চারদিকে প্রভাব বিস্তার কচ্ছে। আমি জানি, এমন একটা ছোট্ট কৌশলের আবিষ্কার ঘটেছে, যার সুপ্রয়োগের ফলে সব সম্প্রদায়ের লোককে একত্র করা যাবে। তাদের কারো আমার শিষ্য হবার প্রয়োজন নেই। এমন কি আমার ভক্ত না হ'লেও চলতে পারে। সে তার পরমাভীষ্ট পরমেশ্বরকে তার নিজের রুচি অনুযায়ী ভালবাসে, এজন্য সে আমার প্রিয়। সে আমার পাশখানটায় বা কাছখানটায় ব'সে তার অভীষ্টকে আবার একটু ভালবাসুক, এইটে আমার লোভ। তার ভালোবাসা যখন একেবারে উপচে উঠবে, তখন তার উথলে ওঠা হৃদয়ের একটা কণা আমার গায়েও ছোঁয়া লাগিয়ে যেতে ত' পারে। ঐখানেই ত' আমার লাভ! যে

আমার শিষ্য হবে, তাকে সপ্তাহে একদিন সমবেত উপাসনা কত্তেই হবে। এটা তার পরম দায়িত্ব। আমি সম্প্রদায় গড়তে চাই না, কিন্তু বিশ্বকে আপন করতে চাই।

মাদারিপুরের প্রথম বক্তৃতা

অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকায় স্থানীয় কালীবাড়ী প্রাঙ্গণে জনসভায় শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহার মাদারিপুরের প্রথম বক্তৃতাটি দিলেন।

ভারতীয় সভ্যতার স্বরূপ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভারতীয় আর্য্যসভ্যতার ইতিহাস এক বিচিত্র জিনিষ, যার ক্রমবিকাশ এবং বর্ণাঢ্যতা দীর্ঘকাল ধ'রে নানা অঞ্চলে আস্তে আস্তে সম্পাদিত হয়েছে। সিন্ধু-উপত্যকায় বাসস্থান নির্ম্মাণের পূর্ব্বেও সম্ভবত তাঁরা একদল আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থানের মধ্য দিয়ে সোজা মহারাষ্ট্রে প্রবেশ ক'রে আফ্রিকাগত কৃষ্ণকায় কুঞ্চিত কেশ জাতির সঙ্গে সংমিশ্রিত হ'য়ে হয়ত অন্ধ্র ও উৎকলের মধ্য দিয়ে পূর্ব্ববঙ্গ অতিক্রম ক'রে সমতটে (আসাম) প্রবেশ করেন এবং মঙ্গোলয়েড আদিবাসীদের সঙ্গে কোলাকুলি করেছিলেন। পারস্য থেকে বিতাড়িত হ'য়ে আরেক শাখা হয়ত কাশ্মীর, সিন্ধু, পাঞ্জাবের চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়েছেন। চারণভূমির অনুসন্ধানে বনজঙ্গলের দেশ ভারতবর্ষ কুঠারহস্তে জনপদে পরিণত করেছিলেন। তাঁরা কি সঙ্গে ক'রে সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে এসেছিলেন? শ্রমিক-শোষণ-নীতি কি তাঁরা

প্রবর্ত্তন করেছিলেন। ক্রীতদাসের দল বৃদ্ধি করবার জন্য বারংবার যুদ্ধায়োজন করেছিলেন? তাঁরা কি দরিদ্র-শোষণ নীতিকে চিরস্থায়ী করবার জন্যই জাতিভেদ প্রথার প্রবর্ত্তন করেছিলেন? এই সকল প্রশ্ন স্বাভাবিক এবং উত্তর এক এক জনে হয়ত এক এক রকম দেবেন। প্রমাণ আছে যে, তাঁরা রাষ্ট্রশাসনে সাম্যবাদ আনবার চেষ্টা করেছিলেন। এমন প্রমাণও ভূরি ভূরি যে, তাঁরা অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান ক'রে রাজসূয় যজ্ঞের দোহাই দিয়ে একটী পরাক্রান্ত রাষ্ট্রের রাজাকে অপর দশটি, বিশটী, পঞ্চাশটী রাজার রাজ্য অপহরণ করার কুপ্রেরণাও জুগিয়েছিলেন। সুতরাং ভারত-সভ্যতার বিচিত্র ইতিহাসে কি তাদের বিচিত্র দান তা নির্ণয় করা আরও বিচিত্রতর এক অধ্যবসায় হবে। রাজারাজড়াদের ব্যক্তিগত মহিমার কথা পুরাণ-কাহিনীতে এবং কাব্যগ্রন্থগুলিতে থাকলেও ধর্ম্মানুশাসন-শাস্ত্রগুলিতে যা পাই, তা একেবারে পৃথক্ চিত্র। অসির ঝনঝনা নয়, ত্যাগের বিষাণ সেখানে কম্বুস্বরে বাজছে। যুদ্ধাশ্বের ক্ষুরধ্বনি নয়, তপস্বীর নীরব প্রাণায়ামের গোপন বায়ুসঞ্চার সেখানকার প্রাণস্পন্দন। ভোগ্যা যুবতীর সংগ্রহ নয়, বিলাস-বাসনা চরিতার্থতাকারী মণিরত্ন আহরণ সেখানে প্রার্থনীয় নয়। কীর্ত্তি নহে, যশ নহে, মান নহে, প্রতিপত্তি নহে, জীবকুল কুশলার্থে আত্মদানের সামর্থ্যই সেখানে পরম ঈপ্সিত। প্রকৃত প্রস্তাবে এইটাই ভারতীয় আর্য্য-সভ্যতার শাশ্বত ও অবিকৃত রূপ। এই রূপের বিভা আছে, কিন্তু প্রখরদীপ্ততা নাই, এই রূপের শোভা আছে, কিন্তু

দর্পিত অহমিকার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নাই। এই রূপের তৃপ্তি আছে, কিন্তু প্রতিক্রিয়া নাই।

ভারতবর্ষের বিশেষত্বের কারণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভারতবর্ষের এই বিশেষত্বের মূলীভূত কারণ হচ্ছে তার ব্রহ্মচর্য্যের মহিমা অনুধাবন। প্রথম জীবনকে এমন দৃষ্টিতে পৃথিবীর কোন দেশ দেখেনি। দেখবার কারণ ঘটেনি। তাঁরা কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যকে জীবনের মূলদেশে স্থাপন করেছিলেন। একথার প্রতিবাদ ক'রে যে কোন শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি মহাভারত বা পুরাণ শাস্ত্র থেকে উদ্ধার ক'রে অনেক আজেবাজে দৃষ্টান্ত দেখাতে পারবেন। তার জবাব হচ্ছে এই যে, এই সকল গ্রন্থে কোন একটা নির্দ্দিষ্ট যুগ-বিশেষের রীতিনীতি বলা হয় নাই। বলা হয়েছে, এক সঙ্গে বিভিন্ন যুগের জড়ো করা কাহিনীগুলিকে বিশৃঙ্খল ভাবে কিন্তু পুরাণ-শাস্ত্রে এত রকমের কদর্য্য কাহিনী থাক্‌তেও আমাদের মন যে স্বভাবতই তপস্যার আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তার একমাত্র কারণ, প্রাচীনদের ব্রহ্মচর্য্য প্রচার-প্রচেষ্টায় একটা সূক্ষ্ম সংস্কারগত সাফল্য। প্রাচীনেরা মানুষের জীবনে চতুরাশ্রমে চারিটী চেয়ে ব্রহ্মচর্য্যকে মর্য্যাদা দিতে চেয়েছিলেন, একথার সত্যতাকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। আমার এই কথার সমর্থনে আমার যা যা বলবার, তা আমি এখনই বলছি।

বিশাল জনতা নিঃস্তব্ধ মুগ্ধতায় তিন ঘণ্টাকাল বসিয়া বক্তৃতা শুনিলেন।

মাদারিপুর
২৮শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪৩
(১৩ই আগষ্ট, ১৯৩৬)

মনঃস্থির করার শ্রেষ্ঠ উপায়

প্রাতে কয়েকটী যুবক দেখা করিতে আসিয়াছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—চুপ ক'রে বসে কিছুক্ষণ পরমেশ্বরের নাম জপো, মন স্থির হোক্, তারপরে কথাবার্ত্তা হবে।

একজন বলিল,—মন স্থির করার আর কি কোনো উপায় নেই।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হাজার হাজার আছে। কিন্তু সকল উপায়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে পরমেশ্বরের নামজপ করা।

প্রশ্ন হইল,—যে পরমেশ্বরকে মানে না?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তার পক্ষেও ঈশ্বর-স্মরণই মনঃসংযমের শ্রেষ্ঠ উপায়। তুমি আগুনকে না মানতে পার, কিন্তু হাত লাগালে হাত পুড়বেই পুড়বে। তুমি বরফের অস্তিত্বে বিশ্বাস না কত্তে পার, কিন্তু শরীরে ছোঁয়ালে ঠাণ্ডা লাগ্‌বেই লাগ্‌বে। নামজপ কত্তে কত্তে ক্রমশঃ পরমেশ্বরকে টের পাওয়া যায়।

সুতরাং বাধ্য হইয়া যুবকেরা নিজ নিজ পছন্দ মতন নাম কিছুকাল জপ করিলেন।

তৎপরে নানাবিধ আলোচনা হইতে লাগিল।

বন-পাহাড়ীদের মধ্যে কাজ

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমাদের দেশে নমঃশূদ্র জাতি বড় অবহেলিত। কিন্তু তাদের ভিতরে এক প্রকারের ঐক্যবোধ থাকাতে অনেক সমস্যা-সঙ্কুল সময়ে তারা ঐক্য-বলেই আত্মরক্ষা করে, উচ্চবর্ণের লোকদের সহায়তার প্রত্যাশা তারা রাখে না। কিন্তু আমি স্বাধীন ত্রিপুরার পার্ব্বত্য অধিবাসীদের দেখেছি, তারা নানা প্রকারে পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হওয়ার পরেও ঐক্য-বলে একান্তই দুর্ব্বল ব'লে তাদের আত্মচেতনাও জাগে নি। আমি অনেক দিন আগে থেকেই বন-পাহাড়ের অধিবাসীদের ভেতরে কাজ শুরু করেছি। আমার কাজের সুযোগ নেই, সুবিধা নেই, সহায়তাকারী নেই। একা একা কাজ। তাই ঝিনুক দিয়ে সমুদ্র সিঞ্চন ক'রে উঠতে পারছি না। কিন্তু একটী জিনিষ লক্ষ্য কোরো, এতে কিন্তু হুজুগ নেই। সুযোগ নেই এটা দুঃখের কথা, কিন্তু হুজুগ নেই এটা তার চেয়ে অনেক জরুরী কথা। আমার কর্ম্মযুগের প্রায় আদিম কালে স্বাধীন ত্রিপুরার আগরতলা শহর আমি স্বচক্ষে দেখেছি, দেখেছি হাটের দিনে শহরের বুকে মদের দোকানের বীভৎস চিত্র, দেখেছি উলঙ্গ নরনারীর কুৎসিত জড়াজড়ি, দেখেছি বন-পর্ব্বতবাসীদের দুরন্ত ভিড়, আর তাদের আত্মবিস্মৃত পশুমূর্ত্তি। কিন্তু দেখেই ক্ষান্ত হইনি, এদের মধ্যে দুএকজন যাকে দেখেছি, আংশিক প্রকৃতিস্থ, তাদের বুকে ধরে আদর

জানিয়েছি, ঘাড়ে হাত দিয়ে বলেছি, ভাই "মদ ছাড়ো।" পূর্ণ পাত্র মাটির ভাঁড়টা আমার উত্তরে তারা মুখের কাছে এনে বলে, "তুমি খাও।" আমি বলেছি, যে দিন তুমি মদ ছাড়বে, সে দিন আমি খাব, তোমাকে নিয়েই খাব। এর চাইতে অনেক ভাল জাতের মদ খাব এবং খাওয়াব। সে মদ এত মধুর যে, একবার খেলে সমস্ত জীবন আর নেশা টোটে না। সে মদ এমন ফলপ্রদ যে, একজনে পেট ভ'রে খেলে দশ জন, বিশ জন, একশ জন লোক শুধু দেখে দেখেই নেশায় ম'জে যায়। লোকগুলো ফ্যাল ফ্যাল ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে থাকত, বলত, "আবার এসো।" তাই আমি বারংবার নানা স্থানে পাহাড় অঞ্চলে এসেছি, গাছের উপরে শূন্যে বাঁধা টং-এর ঘরে তাদের সঙ্গে বাস করেছি, তাদের খাদ্য খেয়েছি, তাদের সঙ্গে জুম ফসল কেটেছি আর বলেছি, "মদ ছাড়ো।" উদয়পুরের জমাতিয়া গ্রামগুলিতে অনেকে আজ মদ ছেড়েছে। এদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। কৈলাসহর অঞ্চলে অনেক রিয়াং মদ ছেড়েছে এবং তার সুফল তারা ভোগ করছে। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে, ততই একটা জিনিষ লক্ষ্য করছি যে, বাঙ্গালীদের বিলাস-বহুল বাবুগিরি এদের চক্ষুকে বিভ্রান্ত করছে, বুদ্ধিকে কলুষিত করছে। এরা হ'তে চাচ্ছে বাঙ্গালী বাবু, আর বিদেশী বণিক ইংরাজের অনুকরণে বাঙ্গালীরা হ'তে চাচ্ছে চীনা বাজারের ট্যাশ ফিরিঙ্গী। সুতরাং পাহাড়ীদের যেমন বলতে হচ্ছে, "মদ ছাড়ো", বাঙ্গালী

বাবুদের তেমন বলতে হচ্ছে, "বিলাসিতা ত্যাগ কর"। ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়-কাকেরা ভারতোদ্ধার করতে পারবে না। স্বাদেশিকতার তীব্র চেতনা শিক্ষিত মানুষগুলিকে উদ্বুদ্ধ করুক, জগন্মঙ্গলকে মূল লক্ষ্য রেখে তারা দেশহিতে প্রাণ দান করুক। বন-পাহাড়ীরা যে মানুষ, তারা ক্রীতদাসও নয়, পশুও নয়, এই কথা বুঝিয়ে দিয়ে তা'দিগকে উন্নতি-পথচারী করা ত' আমাদেরই কর্ত্তব্য। দশটা লোক এক জায়গায় বসলে, তাদের মধ্যে যাকে সব চাইতে ছোটলোক ব'লে মনে হবে, তুমি তার কাছে গিয়ে বস,—তাকে কাণে কাণে বল, "তোমাকে বড় হ'তে হবে, মানুষ হ'তে হবে, স্বভাবে-চরিত্রে, জ্ঞানে-গুণে সকলের সম্মাননীয় হ'তে হবে। অপরের প্রতি ঈর্ষ্যাপরতন্ত্র ক'রে কাউকে বড় হবার প্ররোচনা দিও না, বিশ্বের সকলের প্রতি প্রেম-ভাব নিয়ে তাকে নিজ সংগ্রামে দুর্দ্ধর্ষ হ'তে প্রেরণা যোগাও। টাকাকড়ি দিয়ে যা হয় না, দেখো তার চেয়ে অনেক বড় কাজ তোমার মুখের কথায় হ'য়ে যাবে।

গান স্বর্গীয় বস্তু

একটী যুবক সুন্দর একটী গান করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গান এক স্বর্গীয় বস্তু। এর ব্যবহারও স্বর্গীয় হওয়া উচিত। গানের শিক্ষাদানও স্বর্গীয় হওয়া উচিত, একটা জাতির উত্থান-পতনের অনেকটা তার সঙ্গীতের মহত্ত্ব ও লঘুত্বের উপরে নির্ভর করে।

সঙ্গীত শিখিবে কাহার নিকট

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গানে মনের দুঃখ দূর হয়, প্রাণে আনন্দের সঞ্চার হয়, মনের গগন থেকে বিষাক্ত বাষ্পগুলি দূর হ'য়ে প্রাণকে স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল করে, এজন্যই গান মানুষের অত প্রিয়। সঙ্গীত যে ভালবাসে না, তাকে পশুও বলা চলে, পাষাণও বলা চলে। কিন্তু পশুরাও সঙ্গীত ভালবাসে। ময়মনসিংহে যখন প্রভাত-কীর্ত্তনে বেরুতাম, তখন দেখতাম, কয়েকটা কুকুর আগাগোড়া দলটার সঙ্গে আছে। কীর্ত্তনও বন্ধ হল, তারাও ঘরে ফিরল। এই চিত্তমনোবিমোহন অলঙ্ঘনীয় আকর্ষণ কার? সঙ্গীতেরই নয় কি? দূরাগত বংশীধ্বনি শুনে হরিণের পাল বনপথে থমকে দাঁড়ায়। কেন দাঁড়ায়? সঙ্গীতেরই আকর্ষণে নয় কি? ভোর রাতে পাখীরা গান গায়। গান ভাল লাগে ব'লেই ত' গায়? ভারতের অধিকাংশ সাধক গানের মধ্য দিয়ে পরমেশ্বরকে পূজেছেন। সুতরাং সঙ্গীত যে সযত্নে শিক্ষণীয় হবে, এটা কি কোন আশ্চর্য্য ব্যাপার? কিন্তু অসৎ লোকের কাছে গান শিখতে যেও না। অসচ্চরিত্র সঙ্গীত-শিক্ষক শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থিনীদের অনেক ক্ষতি করতে পারে। এক কালে সঙ্গীত শিক্ষাদানের অর্থোপজীবী ওস্তাদেরা অনেকেই ছিল হয় মদ্যপ, নয় গঞ্জিকাসক্ত, নয় লম্পট অথবা একাধারে সব। এদের সংসর্গে যারা যেত, তারা নরকে যেত মৃত্যুর পর। কিন্তু জীবৎকালে যেত গোল্লায়। একটী ভাল গায়কের জন্য তবলচী খুঁজতে

হ'লে মানুষকে যেতে হত বেশ্যাপল্লীতে। এই অবস্থার আস্তে আস্তে পরিবর্ত্তন হচ্ছে। ভবিষ্যতে নির্ম্মল-চরিত্র শত শত সঙ্গীত-শিক্ষাদাতা আবির্ভূত হবেন। তাঁদের সংসর্গে প'ড়ে পতিত অধমেরও চরিত্রোন্নতি ঘটবে। সেই দিন সঙ্গীত-শিক্ষা নিরাপদ হবে। আমি ত' আমার সভাস্থলে যথেষ্ট গানের ব্যবস্থা রাখি। সে গান সৎসঙ্গীত। সে গানের ভাষায় থাকা চাই সাবলীল ভাবে অর্থ পরিবেশন, দিব্য জীবন লাভের প্রণোদনা, নিয়ত সাধনশীল হওয়ার অফুরন্ত প্রেরণা। সেই গানে থাকা চাই নিখিল ভুবনবাসীর জন্য কাম-কলুষ-গন্ধহীন সজীব প্রেমভাব এবং পরদুঃখ-কাতরতার অশ্রু-নির্ঝর। চলতি বাজারে যখন এমন গান মিলে না, তখন নিজেই পছন্দমত গান রচনা ক'রে নেই।

আশা কুহকিনী, আশা সঞ্জীবনী

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আশাকে কুহকিনী বলা হ'য়ে থাকে। সত্যই আশা কুহকিনী বটে। আশার ছলনায় ভুলে কত কত প্রাজ্ঞ ব্যক্তি অজ্ঞের মত কাজ করেন, অন্ধের মত পথ চলেন এবং হঠাৎ বিপত্তির গহ্বরে পতিত হ'য়ে সারা জীবন কেবল অনুতাপ আর পরিতাপ ক'রে কাল কাটান। দুরাশা দুরাকাঙ্ক্ষা সত্যই কুহকিনী, মায়াবিনী, সর্ব্বনাশসাধিনী। কিন্তু আশাই ত' দুর্ব্বলকে বল সঞ্চয়ে উৎসাহিত করে, আশাই ত' অলসকে

কর্ম্মোদ্যমে চঞ্চল ক'রে তোলে। এ ক্ষেত্রে আশাকে মৃতসঞ্জীবনী সুধা ব'লে জ্ঞান করা উচিত। অধঃপতিত জাতি উত্থান লাভে প্রয়াসী হয় আশার-আলোক দেখে, পতনোন্মুখ জাতি বাঁচবার চেষ্টা ক'রে থাকে আশার উদ্দীপনায়। সুতরাং তোমাদের একটী প্রধান কর্ত্তব্য হবে, জীবে জীবে প্রাণে প্রাণে আশার রশ্মি ঢেলে দেওয়া। মৃত্যুপথযাত্রী অতি দুর্ব্বল নিরাশ্রয় মানুষটাও আশার বলে অনেক সচ্চিন্তা কত্তে পারে, যার অদৃশ্য প্রভাবে চারদিকের শত সহস্র মানুষ একদা হঠাৎ জাগ্রত হ'য়ে যেতে পারে। দুরাশা পোষণ কত্তে কাউকে উত্তেজনা দিও না কিন্তু সৎ আশা প্রাণে প্রাণে বিতরণ কর। দরিদ্রেরা কি চিরকালই দরিদ্র থাক্‌বে? নিশ্চয়ই না। অজ্ঞানেরা কি চিরদিন অজ্ঞানই থেকে যাবে? নিশ্চয়ই না।

ইতোমধ্যে বয়স্ক ভদ্রলোকেরাও জনা বিশ পঁচিশ আসিয়া গৃহে স্থান লইয়াছেন। তাঁহাদের প্রশ্নাবলি অন্য এক ভাবের অবতারণা করিল। শ্রীশ্রীবাবামণি যুবকদিগকে প্রস্থান করিতে উপদেশ দিলেন।

জন্মশাসনের শ্রেষ্ঠ উপায়

উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জন্মশাসনের শ্রেষ্ঠ ও নিরাপদ উপায় হচ্ছে, ইন্দ্রিয়-সংযম। এর কারণ এই যে, ইন্দ্রিয়-সংযমের দ্বারা জন্মশাসন কর্ল্লে তার প্রতিক্রিয়ায় নারীর জরায়ুতে টিউমার গঠনের সম্ভাবনা প্রায় থাকে না। কৃত্রিম

উপায়ে জন্মশাসনের চেষ্টার ফলে একদিন জগদ্ব্যাপী এমন এক মহাসমস্যার সৃষ্টি হ'তে পারে, যার ফলে অধিকাংশ স্ত্রীলোককে শারীরিক অস্তিত্ব রক্ষারই প্রয়োজনে সমগ্র জরায়ু তুলে ফেলে দিতে হ'তে পারে। এই দুরবস্থাটা এখনো সমাজ-জীবন-মধ্যে তেমন ভাবে প্রকটিত না হ'লেও এটাই একান্ত স্বাভাবিক। নারী-পুরুষের মৈথুন-মিলনের ফলে পুরুষ ও নারীর, বিশেষ ক'রে নারীর দেহমধ্যে এমন সব অত্যাশ্চর্য্য রাসায়নিক পদার্থের সৃষ্টি হ'য়ে থাকে, যাদের যোগ্য পরিণতিতে বাধাদানের ফলে নারীর ধ্বংসের একটা কারখানা শরীর-মধ্যেই সৃষ্ট হ'য়ে যায়। একদা চিকিৎসকদিগকে এই নিদারুণ কথাটা দুঃখের সঙ্গে স্বীকার কত্তেই হবে। সংযমের বলে জন্মশাসন কত্তে গেলে মনের উপরে যে বেগ পড়ে, তাকে প্রতিরুদ্ধ কত্তে গিয়ে নরনারীরা মানসিক রোগে আক্রান্ত হ'তে পারেন ব'লে যে কথাটা শোনা যায়, তার সত্যতা একান্তই আংশিক। ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ বালবিধবা আছেন, যাঁরা সমগ্র জীবন ইন্দ্রিয়-চর্চ্চা করেন নি—তাঁদের অধিকাংশেরই স্বাস্থ্য অতি চমৎকার। দারুণ ভাবে ইন্দ্রিয়-সম্ভোগ করতে করতে যাঁরা হঠাৎ বৈধব্যে লাঞ্ছিত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যেও কিছু কিছু বিধবা পরবর্ত্তী জীবনের সংযমহেতু নষ্ট স্বাস্থ্য অনায়াসে পুনরুদ্ধার ক'রে নেন। এইগুলি ত' আমাদের নিত্য দেখার দৃষ্টান্ত। সংযম পালন এক অসাধ্য ব্যাপার,—একথা অক্ষমের জল্পনা, শ্রমকুণ্ঠের কুযুক্তি, জ্ঞান-পাপীর মিথ্যাশ্রয়। এই সব যুক্তির দিকে কর্ণপাতও ক'রো না। দাম্পত্য জীবনে সংযম

অভ্যাস করলে স্বামিস্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের মধুরতা ক'মে যায় ব'লে যা বলা হয়, তা অধিকাংশ স্থলেই মিথ্যা। তোমাদের বংশে যে দেবমানবের আবির্ভাব প্রয়োজন, এই কথাটি স্মরণে রেখে যদি পথ চল, তাহ'লে সংযম হবে স্বাদিষ্ট, ইন্দ্রিয়সেবা থেকে বিরতি হবে দেহ-মন-প্রাণের সুশীতল আশ্রয়। অন্তর দিয়ে যে প্রেমকে আস্বাদন করা যায়, দেহ দিয়ে সেই প্রেমকে আস্বাদন নাই বা করা হ'ল, ক্ষতি কি? অনেকেই তীর্থস্থানে গেলে দেবতাকে একটা অতীত প্রিয় ফল উৎসর্গ ক'রে আসেন, জীবনে আর কোথাও সে ফলের আস্বাদন করার চেষ্টাটুকুও করেন না। বিবাহকে জানবে বহু তীর্থের সঙ্গম স্থল মহাকুম্ভমেলা। এই দৃষ্টি স্নিগ্ধ, শান্ত, সুরভি ও সুন্দর। এই দৃষ্টি যার এসেছে, এই চক্ষু যার খুলেছে, সে একাধারে হর-পার্ব্বতীর যুগল-রূপ, সে একাধারে রাম ও সীতা, সে একাধারে রাধা ও কৃষ্ণ, সে একাধারে অর্দ্ধনারীশ্বর-শিব-মূর্ত্তি।

সংযমের আদর্শই যাবতীয় সমস্যা সমাধানের মূলভিত্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমাদের দেশে আজ সব চাইতে বেশী যা প্রয়োজন, তা হচ্ছে সংযমের প্রতি আদর্শ মনোভাব পোষণ। নানা রূপ পরিস্থিতি তার বিঘ্ন উৎপাদন করলেও যথার্থ শিক্ষাদাতারা চিরকাল জগৎকে এই শিক্ষাই

দেবার চেষ্টা করবেন। মানুষ কি সব সময় কেবল পশুই থেকে যাবে? দেবত্বে কি সে বিবর্ত্তিত হবে না? পশুই বল, পক্ষীই বল, অন্যান্য প্রাণী বিনা প্রয়োজনে অপরকে আক্রমণ করে না, মানুষ তা করে। মানুষ শিকার করে কেন? পশু শিকার, পক্ষী শিকার। যেই চিলটার মাংস সে খাবে না, তাকেও সে গুলি করবে। যে প্রাণী তোমার শত্রুতা করে না, তাকেও তুমি ছাড়ছ না। দলে দলে পরনারীকে ধরে এনে ধর্ষণ করে কারা? মানুষেরা নয়? তোমার ধর্ম্মমতে আমার বিশ্বাস নেই ব'লে তুমি আমার মতন দশ লক্ষ লোককে ধরে এনে শিরশ্ছেদ করবে, তোমারা কারা? মানুষ নও কি? পরপীড়ক দৈত্যদানবেরা হিংসার তাণ্ডবে যখন দুর্ব্বলের ক্রন্দন ও হাহাকারকে ডুবিয়ে দেয়, তখন তাদের পৈশাচিক বর্ব্বরতাকে সম্বর্দ্ধনা ক'রে ইতিহাস লেখে কারা? মানুষেরা নয় কি? অবশ্য, এ চিত্র অধঃপতিত মানুষের। তারা উত্থান লাভ করতে পারে। কিন্তু তার জন্য একটা আদর্শবাদ চাই। সে আদর্শের ভিত্তি রয়েছে সংযমে প্রোথিত। অন্য কিছুর উপর হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ কত্তে গেলে সে ইমারত টিকবে না। যুদ্ধোন্মাদ পৃথিবী, ভোগসুখাতুর পৃথিবী, ক্ষণিক সুখতৃষ্ণায় অন্ধ পৃথিবী সংযমের পথে সকল সমস্যার সমাধান পাবে। অনেক যুক্তি তর্কের প্রয়োজন কি? কয়েকটা দিন সংযম পালন ক'রেই দেখ না। উপস্থকে বল, তোমাকে ভোগার্থে ব্যবহার করব না। চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বাকে ডেকে বল, ভোগ-বুদ্ধিতে

তোমাদের আশ্রয় নেব না, ভোগবুদ্ধির ঊর্দ্ধে যদি তোমরা থাক, তবেই আমি তোমাদের বন্ধু হ'তে পারি, তবেই আমি তোমাদিগকে বন্ধু ব'লে স্বীকার করি।

সংযম পালন সহজও নহে, কঠিনও নহে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সংযম-ব্রত পালন সহজও নয়, কঠিনও নয়। সহজ নয় এই জন্য যে, চারদিকে অনুকূল কোনও বাতাবরণ নেই। এখন দেশের বহু সংসারেই সংযম-ব্রত পালনের প্রথা, রীতি, নিয়ম, রুচি বা ফ্যাশান নেই। আগেকার ভারতে বিবাহের কথা উঠলেই যুক্তি হ'ত, পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও উঠতো, বংশগৌরববর্দ্ধক সন্তান চাই। এখন কিন্তু দুই পুরুষ পরে কি হবে, একথাও কেউ চিন্তা করে না। বাতাবরণের এই অসম্পূর্ণতার জন্য বর্ত্তমানে বিবাহিত জীবনে সংযম কঠিন। কিন্তু স্বামি-পত্নী যদি আদর্শবান্ ও আদর্শবতী হয়, তাহ'লে তাদের পক্ষে সংযত-ভাবে চলা অথবা রক্ত-মাংসের দাবীকে আধ্যাত্মিক আনন্দের অনুগামী করা অতি সহজ। আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন এজন্য বিশেষ সহায়ক। আমরা যারা ঝিনুক-ভরা জল এনে মরুভূমিতে জল-সিঞ্চনের চেষ্টা করছি, মনে ক'রো না যে, তাদের চেষ্টা নিতান্তই বিফলে যাবে। আমাদের লক্ষ্য এক পুরুষ দুই পুরুষের প্রতি নয়, আমাদের লক্ষ্য নয়টি প্রজন্মের উপর।

আমরা ধারাবাহিক চেষ্টা চালাইব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমরা ধারাবাহিক নয়-পুরুষব্যাপী চেষ্টা চালাব। আমরা কাজ যখন আরম্ভ করেছি, তখন আর থামব না। আমি যদি বর্ত্তমান মরুভূমিতে একটাও চারাগাছ সৃষ্টি করতে না পারি, তবু আমি ভাবব না যে, বিফল হলাম। আমি চলে যাওয়ার পরেও এই চেষ্টাটা যদি বেঁচেই থাকে, তবেই আমি সার্থক। আমার ফটো সাজিয়ে মন্দিরে মন্দিরে পূজার্চ্চনা প্রচলিত করবার চেষ্টায় তোমরা মত্ত হ'য়ো না। আমার সৎচেষ্টাটুকুকে তোমাদের জীবন-ভরা কর্ম্মোৎসবের সঙ্গে যুক্ত রাখার প্রয়াস পেলেই আমি তোমাদের সঙ্গে রইলাম। এদেশ মূর্ত্তি-পূজার দেশ, অবতারবাদের দেশ। নিত্য নূতন মূর্ত্তির পূজা প্রবর্ত্তন হবেই, নিত্য নূতন মানুষ পূজা পেতে পেতে অবতার হবেনই। এঁদের বিরুদ্ধে শক্তিক্ষয় ক'রে কোন লাভ নেই। কিন্তু তোমরা নয়-প্রজন্মব্যাপী ব্রহ্মচর্য্য তথা চরিত্র-সাধনার প্রসারকে লক্ষ্য রেখে বংশের পর বংশ অবলম্বন ক'রে কাজ ক'রে যেতে থাক। কে অসবর্ণ বিবাহ করল, কে করল না, তা নিয়েও তোমরা কলহে প্রবৃত্ত হ'য়ো না। বিবাহিত ব্যক্তি মাত্রেই সঙ্গত-ভাবে সংযম-ব্রত অবলম্বন ক'রে মানুষের আদিম স্বভাবের ইন্দ্রিয়-লৌল্যকে প্রদমিত ক'রে তাকে দিব্যায়িত ভগবৎ-প্রেমে রূপান্তরিত করতে পারল কিনা, তার অনুসন্ধানে মন দাও। পূজা কর এই সংযত দম্পতিকে

এবং তাঁদের দৃষ্টান্ত যাতে সর্ব্বত্র অনুসৃত হয়, তার ব্যবস্থা কর। এই সব নিয়ে আবার দল গড়তে যেয়ো না। দলহীন সমাজ-তন্ত্র যেমন একদা দেশময় রাজনৈতিক কর্ম্মপন্থা ব'লে পরিগণিত হ'তে পারে, ঠিক তেমনই দলহীন আধ্যাত্মিকতাকে তোমরা সর্ব্বসম্প্রদায়ের মানুষের মনে পুরুষানুক্রমিক সংযম-পালনে এবং মনুষ্যজাতির ব্যাপক উন্নয়নের কর্ম্মতালিকা দ্বারা প্রাণবন্ত ভাবে স্রোতোময়ী ও বেগবতী রাখ। আমাকে যদি ভালবাস, তাহ'লে এই দায়িত্বটি আগামী তিনশ বছর ধ'রে কেউ বাছাধনরা এড়াতে পারছ না। ঘোড়ার উন্নতির জন্য গবেষণা হয়, গরুর উন্নতির জন্য বৈজ্ঞানিক অনুশীলন চলে, ছাগ-ছাগী, মৎস্য, কবুতর, গিনিপিগ, গন্ধমূষিক প্রভৃতি সব নিয়ে বিজ্ঞান-চর্চ্চা চলেছে, মানুষকে নিয়ে সে চর্চ্চা কেন হবে না? মানুষ মনস্বিতা-সম্পন্ন জীব। মানুষ মননশীল প্রাণী। যুক্তির পরম্পরা সে বোঝে। সে শ্রুতিধর এবং স্মৃতিধর। সুতরাং অতীত জ্ঞানকে মনে রাখতে পারে। নিজের জ্ঞানকে ভবিষ্যতের হাতে দিয়ে যেতে পারে। এমন যে মহাপ্রাণী মানুষ, তাকে বংশানুক্রমিক ভাবে উন্নত করবার চেষ্টা একটুও করব না, এটা কি সঙ্গত? হয়ত আমার আগেও একথা নিয়ে দু'একজনে ভেবেছেন। কিন্তু পাগলামী হবে আশঙ্কা ক'রে মুখফুটে বলেন নি। আমিই হয়ত মানুষের সম্ভাব্য উপহাসকে অগ্রাহ্য ক'রে প্রকাশ্য ভাবে উচ্চকণ্ঠে হাটে-মাঠে-ঘাটে প্রচার ক'রে বেড়াচ্ছি। আমি সর্ব্বপ্রথম ব'লেই কি আমি ভ্রান্ত? না, নিশ্চয়ই আমি ভ্রান্ত নই। আমার বাক্যে অগাধ বিশ্বাস ন্যস্ত

ক'রে তোমরা কোমরে গামছা বেঁধে এই কথাটা প্রচার ক'রে যাও যে, নয়টি প্রজন্মের চেষ্টায় তিনশত বৎসরের ভেতরে সাধারণ মানবের মধ্য থেকে মহামানব রূপ বংশধরদের আবির্ভাব আমরা সম্ভব করবই করব। ভাবতে হবে সেই উপায়ের আবিষ্করণ সম্বন্ধে, যে উপায় অবলম্বন করলে তিন শতাব্দী ধ'রে এই আন্দোলন চালু থাকে। রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির সহস্র কলহ, কোলাহল, মতভেদ আদি সত্ত্বেও আমাদিগকে নির্লিপ্ত থেকে কেবলই এগিয়ে যেতে হবে। তবেই ভবিষ্যদ্-বংশীয়দের আবির্ভাব আমাদের পক্ষে কামনীয় ব্যাপার হবে। নতুবা বংশবিস্তার ত' সর্ব্বনাশের নামান্তর মাত্র।

গুরুর সাক্ষাৎকার ব্যতীতও দীক্ষা চলিতে পারে কিনা

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যদিও জাতিতে অনার্য্য বংশধর অথবা শূদ্রাধম, তথাপি একথা আমাকে অকপটে স্বীকার করতে হচ্ছে যে, একলব্যই এদেশে দারুণ এক গুরুবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন, যার বৈষয়িক প্রয়োগ হ'ল এই ভাবে যে, গুরুর সাহায্য ছাড়া যেমন ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করা যায় না, তেমনই অধ্যাত্মবেদ লাভ করাও অসম্ভব। গুরুর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মিত হল, তাঁকেই ঈশ্বরের প্রতিনিধি-স্বরূপ জেনে ধনুর্ব্বাণ চালনা শুরু হল, শব্দভেদী বাণবিদ্যা আয়ত্ত হ'ল। এই কাহিনীটির দ্বারাই

আবার প্রচারিত হ'ল যে, গুরুকে গুরুদক্ষিণা দিতেই হবে এবং দক্ষিণাটি নিতান্ত অস্বাভাবিক হ'লেও দিতেই হবে, না দিয়ে উপায় নাই। দ্রোণাচার্য্য নিশ্চয়ই ধর্ম্মবুদ্ধি-প্রণোদিত হ'য়ে একলব্যের অঙ্গুষ্ঠচ্ছেদন দাবী করেন নি। এই দাবীটি তিনি করেছিলেন অর্জ্জুনের প্রতি অসঙ্গত পক্ষপাতিত্ব বশতঃ। তিনি একলব্যকে কিছুই শেখান নি, সুতরাং দক্ষিণাও দাবী করতে পারেন না। গুরু-দক্ষিণার দাবী তাঁর পক্ষে বেআইনী। একলব্য তাঁর কোন ক্ষতি করেন নি। কিন্তু তবু তিনি তাঁর উপর যেন একটা প্রতিহিংসাই চরিতার্থ করলেন। নীচ জাতি ব'লে যাকে শিষ্য করা গেল না, তাঁর কাছ থেকে দক্ষিণা নেওয়াতে দ্রোণাচার্য্যের পাতিত্য কেন হবে না, বল ত'? নীচ জাতির দান গ্রহণ করলে কি পাতিত্য হয় না? তোমরা ত' অনেকে আমার একলব্য শিষ্য। ফটোর সামনে দাঁড়িয়ে বল্‌ছ,—"হে গুরো, ব্রহ্মবিদ্যা দাও।" আমার তাতে আপত্তি নাই। কিন্তু তোমার কাছ থেকে দক্ষিণা নেওয়ার আমার অধিকারও নেই, লোভও নেই, প্রয়োজনও নেই। গুরু স্বয়ং তোমাদের ভিতর বাস করছেন। তোমার জন্মমাত্র গুরু তোমার নিত্যসাথী। আমাকে মানো আর না মানো, তাঁকে তোমাদের মানতেই হবে। সুতরাং আমার সঙ্গে চাক্ষুষ দেখা-সাক্ষাৎ না হওয়া সত্ত্বেও যদি তোমরা একাগ্রমনে ওঙ্কার-মন্ত্র জপ ক'রে যাও, তাহ'লে আমি তোমাদিগকে আমার শিষ্য ব'লে মেনে নেব। গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ কোন ব্যবসায়ীর আদান-প্রদান নয়। এ সম্বন্ধের সূত্র শিথিল হ'য়ে যায়, যদি আদর্শগত-ভাবে না

থাকে মিল। সাধন-পরায়ণ হও, বাক্-সংযমও কর। তাহ'লে আদর্শ-নিষ্ঠা অটুট থাকবে। যে লোকটাকে দু'দশ বৎসরের মধ্যে পাবার সম্ভাবনা নেই, তাঁর ফটোর সামনে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের এইরূপ লক্ষ লক্ষ শিষ্য আছেন।

মাদারিপুরের দ্বিতীয় বক্তৃতা

অদ্য জনতা কল্য অপেক্ষা অধিক হইয়াছে। শ্রোতার আগ্রহও অত্যধিক লক্ষ্য করা গেল। অনেকেই চারিদিকে তাকাইয়া বিস্ময় প্রকাশ করিলেন।

মাতৃস্নেহ ও সন্তান-বাৎসল্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দৃষ্ট বস্তু দেখে সৃষ্টিকর্ত্তার অভিপ্রায় কতকটা নিশ্চয়ই ধারণায় আনা যায়, এতটুকু যুক্তিশক্তি ভগবান্ মানুষকে দিয়েছেন। আদিম প্রাণীর ভিতর লক্ষ্য করা যায়, নিদারুণ নিষ্ঠুরতা যা নিজ সন্তানকে পর্য্যন্ত ভক্ষণ ক'রে ফেলতে বা ধ্বংস ক'রে দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। এই নিষ্ঠুরতাই যদি ঈশ্বরের অভিপ্রেত হ'ত, তবে উন্নততর প্রাণীর স্তরে পৌঁছে আমরা মাতৃস্নেহ বা সন্তান-বাৎসল্য নিশ্চয়ই দেখতে পেতাম না। প্রাণী এক স্তর থেকে অন্য স্তরে যতই উন্নতি লাভ কচ্ছে, ততই লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, মাতৃস্নেহ হচ্ছে গাঢ়তর, সন্তান-বাৎসল্য হচ্ছে স্ফুটতর। স্নেহের এই যে ক্রমবিকাশ, তা থেকেই স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, ঈশ্বরের অভিপ্রায় কি। কেউ বলবেন, ওটা ঈশ্বর নয়, ওটা প্রকৃতি।

হাঁ, আমি স্বীকার করব, ওটা প্রকৃতি। কিন্তু জানতে ত' পারলুম, প্রকৃতির অভিপ্রায় কি। ঈশ্বর বরং গোল্লায় যান, প্রকৃতিই কি আস্তে আস্তে মানুষকে পরার্থপর করছে না? আজ যাদের ঈশ্বরে অবিশ্বাসী বলা হয়, তারাই সমগ্র পৃথিবীর মানব জাতির দুঃখ দুর্ভাগ্য দূর করার কথা ইংল্যাণ্ডে বসে, জার্ম্মেনীতে বসে, রাশিয়াতে বসে চিন্তা কচ্ছেন কেন? কারণটা হচ্ছে এই যে, এটাই জীবমাত্রের অবশ্যম্ভাবী সৌভাগ্য যে, উন্নতির উচ্চতম স্তরে গিয়ে তাকে পরার্থে আত্মোৎসর্গরূপ মহাযজ্ঞের আহুতি হ'তে হবে। এই কথাটা ভেবেই ঋষি-যুগে ভারতের আকাশে হোমের অনলের লেলিহান রসনা লক্ লক্ ক'রে উঠ্‌ত এবং ঠিক এই কথাটা ভেবেই হয়ত ইউরোপের মাটিতে কতই না হবে শোণিত তর্পণ। সব কিছুর লক্ষ্য এক দেবমানব জাতির আবির্ভাব। এত যে কাণ্ড হচ্ছে, তার যে লক্ষ্য এত মহৎ, তা কেউ জানে না। এই-ই যদি লক্ষ্য না হবে, তাহ'লে মায়ের স্তনে দুধ আসে কেন? মায়ের বুকে স্নেহ আসে কেন? এমন কি আমাদের মনে যত রকমের ভাব আসে, সবই আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদিগকে দেবমানবত্বে নিয়ে যাবার জন্যে। মাতৃস্নেহ ও সন্তান বাৎসল্য তার প্রথম ধাপ।

পরিজ্ঞাত ও অপরিজ্ঞাত জগন্মঙ্গল

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই যে বিবর্ত্তন বা ক্রমোন্নতি,

তা এতকাল হ'য়ে এসেছে মানুষের অজানিতে। এখন সেই স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে আমাদের জ্ঞাতসারে চলতে দিতে হবে। যা আপনা আপনি আস্তে আস্তে হ'ত, তাকে ত্বরান্বিত করবার জন্যে যা অল্প অল্প ক'রে হ'ত, তাকে ব্যাপকতর করবার জন্যে আজ প্রয়োজন আমাদের ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ। সাপ, শেয়াল, কুকুর, বাঘ, হস্তী, গণ্ডার, গো-মহিষ, এরা কেউ এখনও ইচ্ছাশক্তির মহিমাকে জানতে পারে নি, আমরা জানি। ইচ্ছাশক্তির মহিমায় দুর্ব্বল সবল হ'তে পারে, স্বল্পায়ু ব্যক্তি দীর্ঘায়ু হ'তে পারে, কুরূপ মানুষ সুরূপ হ'তে পারে, পশুতুল্য মানুষ দেবোত্তম হ'তে পারে। একথা আমরা জানি, ওরা জানে না। ওরা না জানা সত্ত্বেও আস্তে আস্তে উন্নীত হচ্ছে। আমরা জানি ব'লেই দ্রুততর উন্নীত হ'তে পারি। আমাদের সংকল্প করতে হবে, আমাদের জগন্মঙ্গলকারী হ'তে হবে, বহু-পুরুষানুক্রমিক সংসঙ্কল্পের ফলে আমাদের মেধা, বুদ্ধি, প্রতিভা, রুচি-প্রকৃতি, এমন কি মস্তিষ্কের যন্ত্রপাতির পর্য্যন্ত এমন পরিবর্ত্তন হ'তে পারে, যা দেবতাদেরও কল্পনায় আসে না। বিজ্ঞানই আজ স্পষ্ট ক'রে মানুষকে ব'লে দিচ্ছে যে, মানুষের ভাবী অভ্যুদয় মানুষেরই হাতে আসবার উপক্রম ঘটেছে।

আত্মশক্তিতে বিশ্বাস এবং ব্রহ্মচর্য্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আত্মশক্তিতে বিশ্বাসকে

সুপ্রতিষ্ঠিত করার এই জন্যই প্রয়োজন আছে। গড্ডলিকা-প্রবাহের ন্যায় লক্ষ্যহীন ভাবে চলার স্বভাব পশুতে থাকতে পারে, পক্ষিদল ও মৎস্যকুলে আছে। কিন্তু মানুষের পক্ষে এটা অধিকাংশ সময়েই আত্মঘাতক। কেন আমি এই ভাবে হাটব? না, আমাকে জগন্মঙ্গলকারী হ'তে হবে। কেন আমি এই ভাবে চলব? না, আমাকে জগন্মঙ্গলকারী হ'তে হবে। কেন আমি এই ভাবে গান গাইব, না, আমাকে জগন্মঙ্গলকারী হ'তে হবে। কেন আমি এই ভাবে হাসব, না, আমাকে জগন্মঙ্গলকারী হ'তে হবে। আমি ভাঙ্গা হাটের খোলাম কুচি নই। আমার মান আছে, মূল্য আছে, মহিমা আছে—এই আত্মবিশ্বাসটুকুর প্রয়োজন। আর, এই আত্মবিশ্বাসটুকুর জন্য চাই ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচর্য্যবিহীন ব্যক্তিও দু'চারটা সৎকাজ কত্তে পারে। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য-নিষ্ঠ ব্যক্তির সে সামর্থ্য সীমাহীন। তাই, আজ ত্রিভুবনব্যাপী মঙ্গল-সাধনের লক্ষ্য নিয়ে তোমাদের মধ্যে ছড়াতে এসেছি ব্রহ্মচর্য্যের বীর্য্যবাণী।

বক্তৃতা প্রায় তিনঘণ্টা কাল চলিল।

মাদারিপুর
২৯শে শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৩৪৩
(১৪ই আগষ্ট, ১৯৩৬)

শরীরটা শ্রীশ্রীবাবামণির খারাপ লাগিতেছে। এই জন্য জনসাধারণের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিলেন না। অদ্য কাহারও সঙ্গে কথাবার্ত্তাও বলিলেন না। অপরাহ্নে যথাকালে সভাস্থলে উপনীত হইলেন।

মাদারিপুরের তৃতীয় বক্তৃতা

সভাস্থলে জনতা আজ আরও অধিক হইয়াছে।

পুনরুক্তি সর্ব্বক্ষেত্রেই দূষ্য নহে

প্রথম দুই দিনের বক্তৃতার সারাংশ বর্ণনার পর শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সৎকথা বার বার বললে কারও কোন ক্ষতি হয় না বরং লাভই হয়। যুবক বন্ধুরা অনেকেই, গত দুই দিন যে বক্তৃতা চলেছিল, তা শুনতে পান নি। তাই সংক্ষেপে তাদের কাছে সব বলা হ'ল। এক শাস্ত্রে যে কথা লেখা আছে, দেখতে পাওয়া যায় যে, অন্য শাস্ত্রে সেই কথাগুলিই ভিন্ন ভাষায় বলা হয়েছে, এটা পুনরুক্তি। কাব্যে বা প্রবন্ধে পুনরুক্তি দোষ ব'লে বিবেচিত হ'তে পারে কিন্তু প্রবচনে এক কথা দশবার বলতে পারা ক্ষতিকর নয়, লাভজনক। দেওয়ালের গায়ে পেরেক ঠুকতে গেলে বারবার ঠুকতে হয়।

ব্রহ্মচর্য্য এক শাশ্বত বস্তু

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রাচীন কালে আশ্রম শব্দের মানে আখড়া, মঠ, মন্দির বা প্রতিষ্ঠান ছিল না। আশ্রম বলতে বুঝাত একটা নির্দ্দিষ্ট ধারার জীবন-যাপনের

আদর্শ, যাকে অনুসরণ ক'রে জীবনের একটা নির্দ্দিষ্ট যুগকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করতে হ'ত। ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম বলতে বুঝতে হবে সেইরূপ প্রণালীবদ্ধ একটা সংগঠন, যার সুনির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলির অধীনে প্রত্যেকের বা অধিকাংশের জীবনকে আনতেই হবে। জীবনের সেই যুগটা সম্পূর্ণ কৈশোর এবং যৌবনের প্রথমাংশ। গুরুগৃহে থাকতে হবে, সদাচারী হ'তে হবে, মিতাহার চাই-ই চাই এবং ইন্দ্রিয়-সংযম একান্তই আবশ্যিক। এটা এমন বদ্ধমূল প্রথা হ'ল, যার শাসন থেকে উচ্চবর্ণের বালকদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বটুদের কোন প্রকারে নিস্তার নেই। বলাই বাহুল্য, এই প্রথা সৃষ্টির মূলে মুনি-ঋষিদের মনে নিজেদের চাল-কলার বরাদ্দ বাড়িয়ে নেবার কোন ফন্দীই ছিল না। বরং তাঁরা ঘরের গরুর দুধ খাইয়ে, তপোবনের উৎপন্ন ফসলের খাদ্য খাইয়ে শিষ্যদের প্রতিপালন করতেন। তাঁদের লক্ষ্য ছিল মানব-জাতির সমুহিক উন্নতি। যার জন্য এই ব্যক্তি-মানুষটির উন্নতি সর্ব্বপ্রথমেই সাধন করা প্রয়োজন। পৌরহিত্য-তন্ত্র পুরোহিতের লোভ-জাত সৃষ্টি হ'লেও হ'তে পারে। এ নিয়ে তর্কের অবসর আছে। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম যে কারও ব্যক্তিগত স্বার্থলোভ চরিতার্থতার জন্য সৃষ্ট হয় নি, একথা সবাইকে স্বীকার কত্তে হবে। প্রাচীনকালে যে ব্রহ্মচর্য্যের প্রয়োজন একান্ত ভাবে অনুভূত হয়েছিল, বর্ত্তমান কালেও তার আবশ্যকতা আছে এবং ভবিষ্যতেও চিরকাল থাকবে। ব্রহ্মচর্য্য একটা শাশ্বত সত্য,

যাকে অবলম্বন করলে সর্ব্বকল্যাণ সহজে করায়ত্ত হয়। সেই কল্যাণময় পথে আমাদের চলতে হবে।

বক্তৃতা দুই ঘণ্টাকাল চলিল। শ্রোতৃবর্গ মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনিলেন।

মাদারিপুর
৩রা ভাদ্র, বুধবার, ১৩৪৩
(১৯শে আগষ্ট, ১৯৩৬)

মাদারীপুরের চতুর্থ বক্তৃতা

শনি, রবি, সোম, মঙ্গল, এই চারদিন শ্রীশ্রীবাবামণি প্রবল জ্বরে ভুগিয়াছেন। সুতরাং বক্তৃতা দিতে পারেন নাই। অদ্যও অন্নপথ্য করেন নাই। তথাপি বক্তৃতা দিতে আসিয়াছেন দেখিয়া অনেকে বিস্ময়ান্বিত হইলেন। অপরাহ্নে যথাকালে কালীবাড়ী-প্রাঙ্গণে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন।

স্থানীয় ধর্ম্মসভা বিপুল ভাবে প্রচার-কার্য্য করিয়াছিলেন, যাহার ফলে ক্রমান্বয়ে চারিদিন বক্তৃতা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও অদ্য সভাস্থলে বিপুল জনতার সমাবেশ সম্ভব হইয়াছিল।

জাতির প্রতি শাশ্বত কর্ত্তব্য

বক্তৃতা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমরা যে দিনের পর দিন স্থানের পর স্থানে চরিত্র-গঠন ও ব্রহ্মচর্য্য পালনের প্রয়োজনীয়তার কথা দৃঢ়নিষ্ঠা এবং কঠোর অধ্যবসায় সহকারে ব'লে যাচ্ছি, তার কারণ এই যে, আমরা এক সনাতন

সমস্যার শাশ্বত সমাধানকে চালু রাখতে চাই। চিরকালই মানুষ জন্মাবে এবং চিরকালই মানুষ মারা যাবে। কিন্তু ম'রেও সে মরবে না, বেঁচে থাকবে আর একটী নরদেহের মধ্য দিয়ে, যেটি তার নিজের ঔরসে বা নিজের গর্ভে জাত। নিজের জীবন-সত্তাকে এই ভাবে ক্রমবিকাশশীল রাখবার যোগ্যতা সে লাভ করবে যোগ্য কালে কামানুশীলনের দ্বারা। সেই কাম যাতে অকালে ব্যয়িত হ'য়ে, বৃথা অপচয়িত হ'য়ে, অন্যায় ভাবে প্রযুক্ত হ'য়ে মানুষের নবজীবন-সঞ্জননের শ্রেষ্ঠ সম্ভাবনাকে নষ্ট ক'রে না দেয়, তার জন্য যে আচরণের অনুশীলন প্রয়োজন, তারই নাম ব্রহ্মচর্য্য-পালন এবং তারই নাম চরিত্র-গঠন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে একটী দেহ আর একটী জড়দেহকে সৃষ্টি করছে, কিন্তু ঋষির দৃষ্টিতে ব্যাপারটা অন্যরূপ। ঋষিরা দেখেন এই যে, একটা তপশ্চার্য্যারত দেহ থেকে দিব্যতর নূতন একটা দেহ এল এবং পূর্ব্বদেহের দেহীর চাইতে উন্নততর তপস্যার অধিকারী শ্রেষ্ঠ এক জীবাত্মা নূতন দেহটীকে পার্থিব লীলার যন্ত্ররূপে লাভ ক'রে পরবর্ত্তী যুগের আর একটা শ্রেষ্ঠ জীবাত্মার লীলা-বিকাশের সুযোগ-সম্ভাবনা সৃষ্টি ক'রে দিল। কামকে করধৃত প্রহরণের ন্যায় ধ'রে রাখার সার্থকতা এইখানে। এই ভাবে মানবজাতির জড়ীয়-বিবর্ত্তন সাধনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মিক ক্রমবিকাশকে সিদ্ধ করার প্রয়োজনে আমাদের এই আন্দোলন। আজ মানবজাতি যা, একদা তা ছিল না। আজ মানবজাতি যা, ভবিষ্যতেও তা থাকবে না। অতীতে রূপান্তর ঘটেছে

আমাদের অজ্ঞাতসারে, ভবিষ্যতে রূপান্তর ঘটুক আমাদের জ্ঞাতসারে। যা প্রাকৃতিক নিয়মে হ'ত, তা ত' হবেই। আমরা ইচ্ছা না করলেও হবে। কিন্তু আমাদের ইচ্ছাশক্তিকে, সাধন-বলকে, তপশ্চর্য্যাকে তার সঙ্গে যুক্ত কত্তে পারলে ভবিষ্যতের উন্নত জীবন উন্নততর হবে, ভবিষ্যতের দিব্যায়ন দ্রুততর হবে, ভবিষ্যতের মনোহর কান্তি মহীয়স্তর হবে। সরল কথায়, সাধারণ মানুষ থেকে আমরা দেবতা হব। যে দায়িত্ব আমরা স্কন্ধ পেতে নিয়েছি, তা আমরা সমাজের কোন সাময়িক সমস্যা-সিদ্ধির প্রয়োজনে নেই নাই, বরং ভাবী মানব-সমাজের নিঃশ্রেয়স কল্যাণ এবং শাশ্বত প্রয়োজনের দিকে তাকিয়েই আমরা শ্রম করছি। তাই, পুনরায় বলছি, সমস্যা সনাতন, সেবাও তাই শাশ্বত। আমরা যখন ছিলাম না, তখন একাজ কেউ না কেউ কিছু না কিছু করেছেন; আমরা যখন থাকব না, তখন মানব-সমাজের জন্য একাজ অধিকতর বিক্রম সহকারে, ব্যাপকতর সামর্থ্য নিয়ে, পবিত্রতর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যাতে কেউ না কেউ ক'রে যান, তার ব্যবস্থা করাই আমাদের কর্ত্তব্য।

পিতামাতার দায়িত্ব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমরা যারা নিজেরা লোক-শিক্ষকের বেশ ধারণ ক'রে সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছি, দায়িত্ব শুধু তাদের একার নয়। যে পুরোহিত ঠাকুরেরা

বিবাহের আর শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়ান, একা তাঁদেরও নয়, যাঁরা দীক্ষামন্ত্র কর্ণমূলে উচ্চারণ ক'রে শিষ্য ক'রে থাকেন, একা তাদেরও নয়। যাঁরা স্কুলে, কলেজে ছড়ি ঘুরিয়ে, গাধা পিটিয়ে মানুষ করেন, কেবল তাঁদেরও নয়। দায়িত্ব পিতামাতারও প্রচুর, অন্যেরা যদি নানা যুক্তি দেখিয়ে নিজ নিজ দায়িত্ব এড়াবার চেষ্টা করেনও, তাহ'লেও পিতামাতার এ দায়িত্ব এড়াবার উপায় নাই। পিতামাতারা পুত্রকন্যাদিগকে যদি এই বিষয়ে উপদেশ দেন, উৎসাহ যোগান, তবে নিশ্চয়ই আমাদের ন্যায় তুচ্ছ জনসেবকেরা সমাজের স্থায়ী কল্যাণ-সাধনে সহযোগিতা কত্তে বিন্দুমাত্র ত্রুটী করবে না।

মাদারিপুরের পঞ্চম বক্তৃতাটী ২০শে আগষ্ট, ৪ঠা ভাদ্র বৃহস্পতিবার দিন সন্ধ্যার বদলে বেশ বেলা থাকিতেই আরম্ভ হইল। কারণ, অদ্য মহিলা শ্রোতাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হইয়াছিল।

২১শে আগস্ট, ৫ই ভাদ্র শুক্রবার দ্বিপ্রহরে মাদারিপুরে হাইস্কুলের হলে ছাত্রদের উপদেশ দান করিয়া আর একটী বক্তৃতা করা হইল। রাত্রি বারোটার ষ্টীমারে শ্রীশ্রীবাবামণি বরিশাল রওনা হইলেন।

সুধন্য বরিশাল

১৩৪৩ এর ৬ই ভাদ্র, ২২শে আগষ্ট (১৯৩৬ ইং) শনিবার প্রাতে নয়টায় শ্রীশ্রীবাবামণি বরিশাল ষ্টেশনে পৌছিলেন। ষ্টেশনে শহরের বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের অনেকেই

আসিয়াছেন সম্বর্দ্ধনা করিতে। এখানে আশ্রম হইতে ছাপান বিজ্ঞাপন পাঠান হয় নাই। ধর্ম্মরক্ষিণী সভার উদ্যোক্তারা সেই যে সন্দ্বীপ হইতে এক টেলিগ্রাম পাইয়াছিলেন যে তিনি পরে আসিবেন, এই একটুখানি আশ্বাস-বাণী শিক্ষিত নরনারীদের মর্ম্মে মর্ম্মে বিদ্যুৎ সঞ্চরণের ন্যায় কাজ করিয়াছে। কিছু পণ্ডিত ব্যক্তি, কিছু শিক্ষক ও অধ্যাপক, কিছু ব্যবহারজীবী, কিছু ছাত্র অভ্যর্থনা করিতে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি স্পষ্টই বুঝিলেন যে, কাজের জায়গায় আসিয়াছেন।

বরিশাল শহরে ৭ই ভাদ্র হইতে ২০শে ভাদ্র প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত ধর্ম্মরক্ষিণী সভায়, অশ্বিনী কুমার দত্ত টাউন হলে, নারীরক্ষা সমিতিতে, ব্রজমোহন কলেজে, হরিজন বিদ্যামন্দিরে, আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যাপীঠে, ব্রজমোহন হাইস্কুলে, স্কুল অব ফিজিক্যাল কালচারে, জগদীশ বালিকা বিদ্যালয়ে ভাষণ দিতে হইয়াছে। বরিশালে এই কয়টা দিন এত ব্যস্ততার মধ্যে কাটিয়াছে যে, আহার-নিদ্রার অবকাশ ছিল না। সুতরাং নানা বিচিত্র ঘটনার বিবরণগুলি রক্ষা করা যায় নাই। অনেকেই নিজ নিজ অভিজ্ঞতা স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। যথা, শ্রীমুকুন্দ লাল সাহা লিখিয়াছিলেন,—বরিশালের বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী এবং পিকচার হাউস নামক সিনেমা হলের মালিক শ্রীযুক্ত রাধিকা মোহন সাহা একদিন সভায় আসিয়া করজোড়ে নিবেদন করিলেন যে, স্বামীজী আপনি বক্তৃতা বন্ধ

না করলে আমার সিনেমা হল অচল হইবে, কারণ সবাই সভাস্থলে ভিড় করিতেছে, হলে কেহ ঢুকিতেছে না। ব্রহ্মচারী নাড়ুগোপাল সম্পাদিত "সংযম প্রচারে স্বরূপানন্দ" গ্রন্থের ১৪২ পৃষ্ঠার ১০ম পংক্তি হইতে ১৬১ পৃষ্ঠার ১৮ লাইন পর্য্যন্ত নিম্নে মুদ্রিত হইল। তাহাতে যিনি যাহা পাইবার, পাইবেন।

"বরিশালে স্বামীজী স্থানীয় জজকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত রোহিণী কুমার রায়ের বাসায় আতিথ্য স্বীকার করিলেন এবং শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র গুপ্তের উদ্যোগে ৭ই ভাদ্র হইতে স্থানীয় ধর্ম্মরক্ষিণী সভার হলে বক্তৃতা চলিতে লাগিল। দুই দিন যাইতেই সভাস্থলে এত ভিড় হইতে লাগিল যে, বহু পদস্থ সজ্জন হাঁটু তুলিয়া ঘেঁষাঘেষি করিয়া বসিতে বাধ্য হইলেন এবং বহু লোক বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তৃতীয় দিবসের পর হইতে এত লোক হইতে লাগিল যে, বাহিরের তৃণময় প্রাঙ্গণ ত' জনাকীর্ণ হইলই, এমনকি, সদর রাস্তায় যান-বাহন চলাচল পর্য্যন্ত বন্ধ হইল।"

এই বক্তৃতা-চতুষ্টয় সম্বন্ধে বরিশালের অন্যতম মুখপত্র "বরিশাল হিতৈষী" ১০ই ভাদ্রের সংখ্যায় লিখিয়াছিলেন,—

"গত ৭ই ভাদ্র হইতে স্থানীয় ধর্ম্মরক্ষিণী সভাগৃহে ছোটনাগপুর, মানভূম জিলার পুপুন্‌কী অযাচক আশ্রমের স্বামী স্বরূপানন্দ হিন্দু-ধর্ম্মের সদাচার ও রীতিনীতি সমর্থক বক্তৃতা দিতেছেন। বহু বৎসর পর্য্যন্ত এমন কথা শুনি নাই। সে অশ্বিনী কুমার নাই—সে ভক্তিযোগের অমৃতবাণী-প্রচারক নাই—সে

শিক্ষক নাই, যাহারা ছাত্রের চক্ষের কোণে কালদাগ দেখিলে গোপনে তাহার সহিত আলাপ করিয়া উপদেশ দিতেন। আজকাল বক্তা শুধু পুরাতন পুঁথি ঘাটিয়া বক্তৃতা সারেন। কিন্তু আজ প্রাণে গভীর আশার সঞ্চার করিয়া এই একজন সন্ন্যাসী প্রচারক বাহির হইয়াছেন। ইঁহার আজ পর্য্যন্ত জগতের পরিজ্ঞাত সর্ব্ববিধ জ্ঞানে ও প্রাচীন শাস্ত্রের প্রশ্রয়ে পাণ্ডিত্য, ভাষা-সম্পদ, পরিষ্কার উচ্চকণ্ঠ এবং বচনভঙ্গিমা লোকের মনে একটী গভীর ছাপ রাখিয়া যাইতেছে। স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতা যখন দেশকে তীরবেগে উদ্দাম স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, তখন এই সর্ব্বস্বত্যাগী অক্লান্ত কর্ম্মী বাঙ্গলার হতাশ প্রাণে নব আশাপুষ্প মুঞ্জরিত করিতেছেন। বাঙ্গলা তথা ভারতবর্ষকে স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে,—সেই ভার স্বামীজীর ন্যায় লোক গ্রহণ করিলে বিষয়টী সহজ হইবে বলিয়া মনে করি। আজ চারিদিন পর্য্যন্ত তাঁহার বক্তৃতা শ্রদ্ধার সহিত সকলে শ্রবণ করিতেছেন। আশা করা যায়, ইঁহার ন্যায় লোক দেশের আবহাওয়া কিছু পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন। যাঁহারা শুধু আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া ভিক্ষার অর্থে বিশ্রাম উপভোগ করিতেছেন, ইনি সে দলের নহেন। তাই, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইঁহার দীর্ঘজীবন ও অটুট কর্ম্মক্ষমতা ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা করি।"

পঞ্চম দিবসে সভাস্থল এতই জনাকীর্ণ হইল যে, বজ্রকণ্ঠ বক্তা স্বয়ং পর্য্যন্ত শ্বাসকষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন। অথচ কি আশ্চর্য্যের বিষয়, এত বড় ঘেঁষাঘেষি সত্ত্বেও সভামধ্যে

একটী সূচীপতনের শব্দ পর্য্যন্ত হয় নাই। ধর্ম্মরক্ষিণী সভার প্রেক্ষাগৃহের ঊর্দ্ধাংশই শুধু মহিলাদের দ্বারা পূর্ণ হইয়াছিল, তাহা নহে, নীচে নামিয়া বহু মহিলা বাধ্য হইয়া পুরুষদের সহিত ঘেঁষাঘেষি করিয়া বসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি বক্তৃতার সময় তুচ্ছতম গোলমালটুকু হয় নাই। অত্যন্ত লোক-সমাগম হেতু প্রত্যহ বিস্তর লোক ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইতেছেন, এবং যাহারা সভাতে স্থান পাইতেছেন, তাঁহারাও অতি কষ্টে অবস্থান করিতেছেন দেখিয়া স্বামীজীর ষষ্ঠ হইতে অষ্টম বক্তৃতা অশ্বিনী কুমার টাউন-হলে হইবার ব্যবস্থা হইল। টাউন-হল সিনেমা-হলের সন্নিকট বলিয়া এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব যত সভা এই টাউন হলে হইয়াছে, তাহার প্রায় সবই গোলযোগে পণ্ড হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ স্বামীজীর টাউন-হলের বক্তৃতার সাফল্য ও নিরাপত্তা সম্বন্ধে অন্তরে ঘোরতর সন্দিহান ছিলেন। স্বামীজী সর্ব্বত্র ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় বক্তৃতারম্ভ করিয়া থাকেন, বিজ্ঞাপিত সময়ের এক মিনিট আগে বা এক মিনিট পরে কেহ কখনও তাঁহাকে বক্তৃতারম্ভ করিতে দেখে নাই। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময়ের এক ঘণ্টা পূর্ব্বেই সভাস্থল জনারণ্যে পূর্ণ হইয়া গেল। শ্রীযুক্ত রোহিণী কুমার রায় এবং শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র গুপ্ত বেশ কষ্টের সহিতই স্বামীজীকে হলের মধ্যে প্রবেশ করাইলেন। বিপুল জনতাহেতু তুমুল হট্টগোল চলিয়াছে, স্বামীজী দাঁড়াইবা মাত্র যেন উন্মত্ত সমুদ্র স্তব্ধভাব ধারণ করিল। পূর্ণ দুই ঘণ্টাকাল স্বামীজী বক্তৃতা করিলেন, নিঃস্তব্ধ হইয়া সকলে শুনিলেন। বক্তৃতান্তে ব্রাহ্ম-

সমাজের প্রবীণ শ্রদ্ধেয় আচার্য্য, ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় স্বামীজীকে আবেগভরে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন,—"ধন্য আপনি, ধন্য।"

এই আটটী বক্তৃতা সম্বন্ধে ১৭ই ভাদ্র তারিখের "বরিশাল-হিতৈষী" পত্রে "বক্তৃতা" ও "কে গায় ওই" শীর্ষক দুইটী সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। আমরা নিম্নে তাহা পুনরুদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

বক্তৃতা

"ক্রমাগত আট দিন শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব হিন্দু শাস্ত্রের প্রতি অগাধ বিশ্বাস-সৃজন-মূলক, নারী-নৃত্যের অনিষ্টকারিতা, সংযম-অভ্যাসের আবশ্যকতা প্রভৃতি বিষয়ক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তিনি শুধু ভারতের প্রাচীন সাহিত্য-সমুদ্র মন্থন করেন নাই—তিনি গ্রীক, জার্ম্মাণ, আমেরিকান, ফরাসী ও ইংরেজী সাহিত্য-সাগর হইতে রত্ন খুঁজিয়া তাঁহার যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। এত বড় পণ্ডিত-বক্তা আমরা শীঘ্র দেখি নাই। আমরা পাশ্চাত্যের এতগুলি পণ্ডিতের পুস্তকাবলীর নামও জানি না—অথচ তাঁহার কর্ম্মবহুল জীবনে কোন্ ফাঁকে ফাঁকে এতগুলি গ্রন্থ শুধু পাঠ নহে হজমও করিয়াছেন, ভাবিতে গিয়া পুলক-বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছি। প্রতিদিনের বক্তৃতায় তিনি নূতন নূতন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের পুস্তকাবলীর Chapter & Verse—অধ্যায় এবং পংক্তি তুলিয়া তাঁহার মতবাদ সমর্থন করিয়াছেন। তারপর তিনি কতকগুলি

যোগাসন যুবকগণকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, পাশ্চাত্যের ভোগমূলক আদর্শগুলির অনুকরণ করিয়া এদেশ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে—অথচ সেই পাশ্চাত্য দেশ-সমূহে যে প্রতিক্রিয়া-মূলক আন্দোলন প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে চলিতেছে, তথাকার লেখক ও রাজনৈতিকগণকে যে ধ্বংসের পথ হইতে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতেছে—হিটলার এবং মুসোলিনী যে সকলকে সংযমের বন্ধনে বদ্ধ করিয়া নব নব জাতি গঠন করিতেছেন, সেদিকে ভারতীয় অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীগণের দৃষ্টি পড়িতেছে না। ইঁহার ভাষা এমন সুসংযত, সুসঙ্গত, এমন প্রাঞ্জল, এমন মার্জ্জিত যে, অতি কঠিন বিষয়গুলি ইনি সহজবোধ্য করিয়া তুলিয়াছেন অথচ ইংরেজী বা সংস্কৃত বচন উদ্ধৃত করিয়া বক্তৃতা ভারাক্রান্ত করেন নাই। প্রতিদিন ঘড়ি ধরিয়া দুঘণ্টা বক্তৃতা করিয়াছেন—কিন্তু কোনও দিন এক সেকেণ্ড তাঁহার ভাষা খুঁজিতে বেগ পাইতে হয় নাই। পরনারীর সম্পর্কে তাঁহার বক্তৃতাগুলি শ্লীলতার গণ্ডী রেখামাত্রও অতিক্রম করে নাই। অথচ তিনি অতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সমস্ত পাপ ও স্খলনের বর্ণনা করিয়াছেন।

"আমরা সংক্ষেপে তাঁহার মধুর বক্তৃতাবলীর সারাংশ প্রকাশ করিতে অক্ষম,—তাই আবার বলি, আজকালকার এই নীরব, নিশ্চল, স্রোতে-ভাসমান, সর্ব্বত্র নিন্দিত, লাঞ্ছিত বাঙ্গলার বুকে এই এক নবশক্তির আবির্ভাব হইয়াছে। বাঙ্গলার নবজাগরণে তাঁহার অমোঘ শক্তি এক নূতন অধ্যায় খুলিয়া

দিবে। আমরা এই নব আশা ও অসীম বিশ্বাস লইয়া তাঁহার নিরাময় কর্ম্মক্ষম দীর্ঘজীবন ভগবৎ-সমীপে প্রার্থনা করি।"

"কে গায় ওই"

"বহুকাল-বিস্মৃত সুখস্বপ্নের স্মৃতির ন্যায় এমধুর বক্তৃতা কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। এত মধুর লাগিল কেন? ইহার সকল কথা নূতন নহে। নূতন বলি কেন, এ অতি পুরাতন কথা। কিন্তু এত ভাল লাগিল কেন? মুহূর্ত্তের জন্য আজ যেন মনে পড়িল, এমনই কথা বাল্যে এবং যৌবনে শুনিয়াছি—তারপর বহু যুগ সে কথা বিস্মৃত হইয়াছিলাম—মনে করিতেও যেন লজ্জা আসিত। সেগুলি কি কথা, ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ, সত্যবাদিতা, নীতিবাদিতা, বেশ্যাশ্রোত্রীর মধ্যে যাত্রা গান শ্রবণ, গণিকা-সংশ্লিষ্ট থিয়েটার দর্শন অন্যায়, ব্রজমোহনের morality, সে সব ভাবিবার সুযোগ অনেক দিন আসে নাই—আজ আবার সে কথা শুনাইতে সাহস করিয়া কে আসিল, এক স্বরূপানন্দ? এই দুর্ব্বার লালসা-স্রোতে দুই দুইটী সিনেমাগৃহ, রাজপথে নারী-বাহিনীর সাবলীল অবাধ স্রোত, এই সহশিক্ষা, এই নারীনৃত্যের যুগে কে এক স্বামী আসিলেন পুরাতন স্মৃতি জাগাইয়া তুলিতে? রিপুর তাড়নার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে উপদেশ দিতে? এ যে ঘোরতর রক্ষণশীল প্রাচীনপন্থী! যে ধর্ম্মরক্ষিণী সভায় একদিন ভক্তিযোগ-গান একদা অশ্বিনী কুমার গাহিতেন, আর আচার্য্য জগদীশ লিখিয়া লইতেন, সেখানে আজ বহুকাল পরে আবার কে আসিলেন

(অঃ সং ১৪)—৯

স্বরূপানন্দ নারীনৃত্যের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতে, সংযমের কথা বলিতে? কে তিনি সেই অশ্বিনী-কুমার টাউন-হলে সিনেমার বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতে,—যেখানে অশ্বিনী কুমারের প্রিয়শিষ্য শরৎচন্দ্র গুহই সিনেমাকে প্রথম স্থান দিয়া তাহাকে কৌলীন্যে বরণ করিলেন,—যেখানে পিকেট করিতে শরৎ কুমার ঘোষ প্রায়োপবেশন করিলেন। পুলিশের লগুড়াঘাতে জর্জ্জরিত হইলেন। আজ তাই বহু পুরাতন স্মৃতি আবার স্বরূপানন্দ জাগাইয়া তুলিলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁহার মধুর কণ্ঠে মধুর ভাষায় তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, অতুলনীয় বাগ্‌বিভূতি-সহকারে বরিশাল তথা বাংলা দেশে এক নববার্তার প্রচার করিলেন—আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা বরিশালের আবালবৃদ্ধ নরনারী সে সঙ্গীত মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া শ্রবণ করিলেন। শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ বয়সে এখনও নবীন কিন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষিবৃন্দের শত শত গ্রন্থ আয়ত্ত করিয়া যুক্তির পর যুক্তি দ্বারা ভবিষ্যৎ ভারতের কর্ত্তব্য-পথ নির্দ্দেশ করিয়া গেলেন। তবে কি বাস্তব পক্ষে এই অন্ধ কালস্রোত আবার ফিরিবে? অন্ধকার সিনেমা গৃহে যুবক-যুবতী বিলাতী নরনারীর অবাধ প্রেমলীলা দর্শন করিতে করিতে নিজেদের প্রবল বাসনাসঙ্কুল লীলা-খেলার অবসান ঘটাইবে? আবার কি তাহারা আসন, প্রাণায়াম, যোগধ্যান দ্বারা শুচি শুদ্ধ হইয়া বুদ্ধ-শঙ্কর-চৈতন্য-শিবাজী-প্রতাপ প্রভৃতির জনক-জননীর যোগ্য হইবেন? আশা আছে, এই অকুতোভয় সমাজ-সেবক সাধু-পুরুষ যদি সুদীর্ঘকাল লোকশিক্ষকের পদবী গ্রহণ করিয়া তাঁহার বাণী

প্রচার করিতে থাকেন ও পারেন, তবে এই কালস্রোত ফিরিতে পারে। এই শক্তিধর মহাপুরুষ তাঁহার গভীর সাধনা, অফুরন্ত জ্ঞানভাণ্ডার যদি এমনই ভাবে দেশময় বিলাইতে পারেন, ব্রহ্মচর্য্য-সংযম-নীতির আদর আবার বাড়িবে—আবার অশ্বিনী কুমারের বিস্মৃত সাধনা—সনাতন ঠাকুরের তপস্যা—কালীশ চন্দ্রের লোকসেবা নববলে বলীয়সী হইয়া নূতন আকারে বরিশালকে ধন্য করিবে। সে আশায় উৎফুল্ল হইয়া আমরা শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের প্রতি আমাদের ভক্তিঅর্ঘ্য নিবেদন করিতেছি।"

বরিশালের মাসিক "ব্রহ্মবাদী"

ভাদ্র সংখ্যায় লিখিয়াছিলেন,—

"পুপুন্কী আশ্রমের অধ্যক্ষ, কর্ম্মযোগী, প্রসিদ্ধ বক্তা শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব ৭ই ভাদ্র এখানে আগমন করিয়া সাপ্তাহিক কাল ধর্ম্মরক্ষিণী সভাগৃহে এবং টাউনহলে মনুষ্যত্বের সাধনার পথে ব্রহ্মচর্য্য, মানসিক বলের প্রভাব, সংযম প্রভৃতি বিষয়ে সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি শাস্ত্রকে অভ্রান্ত বলেন না, পুরাণ, তন্ত্র ও আখ্যায়িকাকে নিরেট সত্য বলিয়াও প্রতিপন্ন করেন না। তবে লোকশিক্ষার জন্য এই সকলের সাহায্যে বক্তৃতা করিয়া থাকেন। তাঁহার বাগ্‌বিভূতি চমৎকার। সকল কালের ইতিহাস, পুরাণ ও বিজ্ঞানে জ্ঞান প্রসারিত। বর্ত্তমান সময়ের তরল আমোদ-প্রমোদ, নারীনৃত্য, বায়োস্কোপ, ধূমপান প্রভৃতি বিষয়ের তীব্র প্রতিবাদে

তিনি বদ্ধপরিকর। এই দিনে এইরূপ বক্তা-প্রচারকেরই অত্যধিক প্রয়োজন। আমাদের মনে হয়, স্কুল-কলেজ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইঁহার বক্তৃতার ব্যবস্থা হইলে দেশের এই বিলাস-তরঙ্গের প্রশমনে মনুষ্যত্বের কথঞ্চিত উন্মেষ হইতে পারে। আমরা এই বক্তাকে অভিনন্দন করি।"

বরিশালের অন্যতম সাপ্তাহিক মুখপত্র "কাশীপুর-নিবাসী" ৩১শে ভাদ্রের সংখ্যায় লিখিয়াছিলেন—

"ক্রমাগত আট দিন ধরিয়া শ্রীশ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস মহারাজ স্থানীয় ধর্ম্মরক্ষিণী সভা-গৃহে এবং তথায় স্থানাভাব বশতঃ অশ্বিনী কুমার হলে বক্তৃতা করিয়া গিয়াছেন। স্বামীজীর বক্তৃতার সারাংশ সংক্ষেপে উল্লেখ করাও আমাদের এই স্বল্প-পরিসর সংবাদপত্রে সম্ভবপর নহে। যাঁহারা স্বকর্ণে এই বক্তৃতা শ্রবণ করেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে সংবাদ-পত্রের স্তম্ভে বক্তৃতার বিষয় পাঠ করিয়া উপলব্ধি করার চেষ্টা আর চর্ব্বিত ইক্ষুর ছোবড়ার রস গ্রহণ করার প্রয়াস, একই কথা। যাঁহারা শহরে থাকিয়া এই সুযোগ হেলায় হারাইয়াছেন, তাঁহারা বাস্তবিকই কৃপার পাত্র। শ্রোতৃবর্গ মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্বামীজীর প্রত্যেকটী কথা তদ্‌গত চিত্তে শ্রবণ করিয়াছেন।

"স্বামীজীর বক্তৃতার প্রধান অংশই ছিল সংযম, শাস্ত্রবাক্যে আস্থা-স্থাপন ও শাস্ত্রানুমোদিত ভাবে জীবন ও সমাজ-গঠন। বর্ত্তমান সময়ে আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অধিকাংশই শাস্ত্রবাক্যে আস্থাহীন এবং শাস্ত্রই নাকি হিন্দু-সমাজের অধঃপতনের একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

তদ্দৃষ্টে অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিতগণও এই ধূয়া ধরিয়াছেন। তাই স্বামীজী প্রাচীন শাস্ত্রের জটিল প্রশ্নগুলি উত্থাপন করিয়া মাত্র গল্পাকারে দুই একটী উপাখ্যান গ্রহণ করিয়া সেই দূরদর্শী প্রাচীন হিন্দু ঋষি-মহর্ষিগণের মতবাদ কিরূপ সুস্পষ্টভাবে আধুনিক জগতের সর্ব্বপ্রকার উন্নতিশীল বিবিধ-বিজ্ঞান, সাহিত্য, কলা ইত্যাদির লীলা-নিকেতন ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী, ফরাসী, ইটালী প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল মনীষী, লেখক ও দার্শনিকগণ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের গ্রন্থরাজি হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন এবং যাহা প্রাচীন ঋষিরা সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, তাহারই কণামাত্র উপলব্ধি করিতে পারিয়া পাশ্চাত্যের এক একজন পণ্ডিত ধন্য বরেণ্য হইয়া গিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করেন। আজ আমরা এমনই হতভাগ্য যে, তবুও পাশ্চাত্যের সার্টিফিকেট না হইলে শাস্ত্র আমাদের নিকট অচল।

"স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে মানব-জীবনের প্রত্যেক স্তরেই যে সংযমী হওয়া প্রয়োজন, স্বামীজী তাহা অতি সুন্দর ও সরল ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। বিবাহিত জীবনেও সংযম অত্যাবশ্যক, নচেৎ দাম্পত্য জীবন বহু দুঃখের আকর, বিষম-জঞ্জালপূর্ণ হইয়া থাকে। প্রাচীন পন্থায় এই সংযম অভ্যাস করিলে আজ আর বাহ্যিক উপায় অবলম্বনে গর্ভনিরোধের প্রয়োজন হইত না।

"আধুনিক শিক্ষিত ও শিক্ষিতা সমাজে কলা-হিসাবে নারীনৃত্যের বহুল প্রচার যে কিরূপ সামাজিক ও নৈতিক

অপকর্ষের ইন্ধন যোগাইতেছেন, তদ্বিষয়ে সকলকে স্বামীজী অবহিত হইতে বলেন। নারীনৃত্যে জর্জ্জরিত হইয়া বৈদেশিক সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ আজ কিরূপ তীব্র ভাবে উহার প্রতিবাদ করিতেছেন ও তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শন লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, স্বামীজী তাহা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেন এবং বলেন, হিন্দুশাস্ত্র-গ্রন্থে কুত্রাপি এরূপ নারীনৃত্যের উল্লেখ দৃষ্টিগোচর হয় না। দুই একটীর কথা যাহা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা ভিন্ন স্তরের নারী-সমাজ দ্বারা পরিচালিত এবং তাহারা অপ্‌সরা নাম্নী পেশাদারী নৃত্যশীলা।

"যদিচ পদ্মপুরাণে বেহুলার দেবসভায় নৃত্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা নৃত্যের কলা-কৌশল প্রদর্শন-জন্য নহে। বেহুলার মৃত স্বামীকে পুনর্জ্জিবিত করিবার নিমিত্ত—সতী রমণীর স্বামীর জন্য। পূর্ব্বে বিজ্ঞাপন প্রদান করতঃ নানাবিধ বেশে বিভূষিতা হইয়া জনসভায় কোনও কুলকামিনী নৃত্য করিয়াছে বলিয়া শাস্ত্রে নাই।

"যৌগিক আসন ও মুদ্রা স্বামীজী স্বয়ং প্রদর্শন করতঃ উহার উপকারিতা সম্বন্ধে শ্রোতৃ ও দর্শকমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দেন এবং ক্রমাগত তিন দিন প্রাতে যুবকগণকে যৌগিক আসন শিক্ষা দিয়া সকলের কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন।

"বরিশালবাসী অনেক দিন পর্য্যন্ত এরূপ বক্তৃতা শ্রবণ করে নাই। শ্রোতৃমণ্ডলী বক্তৃতায় স্বামীজীর ভাবে, ভাষায়, উদার মতে, শাস্ত্রজ্ঞানে ও পাশ্চাত্য জগতের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণের অমূল্য

গ্রন্থরাজি হইতে যুক্তি প্রদর্শনে তাঁহার অফুরন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডারের কথঞ্চিৎ রসাস্বাদন করিতে পারিয়া ধন্য হইয়াছে, সন্দেহ নাই। স্বামীজী এই অল্প বয়সে কর্ম্মবহুল জীবনে তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডার এতদূর সমৃদ্ধশালী করিতে পারিয়াছেন দেখিয়া সকলে আনন্দিত ও আশ্চর্য্যান্বিত।

"স্বামীজী দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া মানব-সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করুন, ইহাই আমাদের শ্রীশ্রীভগবানের চরণে ঐকান্তিক প্রার্থনা।"

সর্ব্বসাধারণের নিকটে প্রদত্ত এই আটটী বক্তৃতা ব্যতীত স্বামীজীকে ১১ই ভাদ্র 'জগদীশ সারস্বত বালিকা বিদ্যালয়ে', ১৩ই ভাদ্র 'ব্রজমোহন স্কুলে', ১৪ই ভাদ্র 'স্কুল অব ফিজিক্যাল কালচারে', ১৮ই ভাদ্র দ্বিপ্রহরে ব্রজমোহন কলেজে এবং অপরাহ্নে 'মাতৃমন্দির' নামক নারী প্রতিষ্ঠানে, ১৯শে ভাদ্র প্রাতে 'হরিজন-বিদ্যামন্দিরে', ঐ দিনই দুপুরে 'টাউন হাইস্কুলে' বক্তৃতা প্রদান করেন। ২০শে ভাদ্র প্রাতে স্থানীয় বরিশাল 'শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনেও' উপদেশ প্রদান করেন।

বরিশালবাসীর শ্রদ্ধাঞ্জলি

১৯শে ভাদ্র শুক্রবার সায়াহ্ন সাত ঘটিকার সময়ে বরিশাল ধর্ম্মরক্ষিণী সভাতে বরিশালবাসিগণের পক্ষ হইতে শ্রীশ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসজীকে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করা হইল। স্থানীয় হরিজন মন্দিরের প্রধান সেবক এবং মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্তের জীবনী-লেখক সর্ব্বজনশ্রদ্ধিত শ্রীযুক্ত

সুরেশ চন্দ্র গুপ্ত মহাশয় ধর্ম্মরক্ষিণী সভার পক্ষে "শ্রদ্ধাঞ্জলি" পাঠ করিলেন এবং সেই ভক্তি-প্রীতি-শ্রদ্ধা-চর্চ্চিত অভিনন্দনখানা শ্রীমৎ স্বামীজীর হস্তে অর্পণ করিলেন। সেই অভিনন্দন-পত্রের সম্পূর্ণ অংশ এখানে উদ্ধৃত না করিয়া মাত্র কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত করিলেই বরিশালবাসীর গভীর স্নেহের পরিচয় পাওয়া যাইবে। যথা,—

"পরাবিদ্যার প্রভাবে—ওগো সত্যদর্শী! চিরপূর্ণ 'আনন্দই' তোমার একমাত্র 'স্বরূপ'।

"ঐ প্রভাবই তোমাকে স্বাবলম্বী করিয়াছে, নিষ্কাম কর্ম্মের প্রেরণা দিয়াছে ও কালস্রোতের তমসাবৃত ভিক্ষামনোবৃত্তিকে পদদলিত করাইয়াছে।

"তাই, তুমি তমসাচ্ছন্ন অনুর্ব্বর ভূমিকে স্বর্ণপ্রসূ করিয়াছ।

"তোমার অচঞ্চল শুদ্ধ রজোগুণময় কুদ্দালের আঘাতে আমাদের কলুষিত ক্ষেত্রজ আবর্জ্জনাকে বিদূরিত করিয়া দাও।

"জগদীশ, অশ্বিনীকুমার ও কালীশচন্দ্র বরিশালকে একদিন ঐ ভাবধারায় পুণ্যময় ও আদর্শ করিয়া তুলিয়াছিলেন, কিন্তু কালের অব্যাহত গতির প্রভাবে আজ সে ধারা লুপ্তপ্রায়। তোমার পুণ্যস্পর্শে আজ আবার সেই লুপ্ত পূত ভাবধারার আলোড়ন বরিশালকে প্রাণময় করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু আমাদের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে এই ক্ষণিক পরশটুকু বড়ই অকিঞ্চিৎকর।

"জানি। বাহ্যিক আড়ম্বরকে তুমি কায়মনোবাক্যে উপেক্ষা কর। ওগো! আশা করি, বিদায়ের এই সন্ধিক্ষণে আমাদের অন্তরের নিগূঢ় বেদনা তোমার অমিয় প্রাণ স্পর্শ করিবে।

শ্রদ্ধাবনত

বরিশালবাসীর পক্ষে

ধর্ম্মরক্ষিণী সভার সেবকবৃন্দ

তৎপরে স্বামীজীকে একটী অভিনব-পরিকল্পনা-সংযুক্ত মাল্য দ্বারা ভূষিত করা হয়। স্বামীজী তাঁর সুদীর্ঘ কালের নীরব কর্ম্মজীবনে কোদালি চালাইয়া স্বাবলম্বনের বলে এক অপূর্ব্ব আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া বর্ত্তমান যুগের যুবকদের নিকটে এক নবাদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, ইহাই ব্যঞ্জিত করিবার জন্য মাল্যমধ্যে কোদালি অঙ্কিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

তৎপরে ধর্ম্মরক্ষিণী সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র গুপ্ত বলেন,—

"বিগত পঞ্চদশ দিবস ধরিয়া বরিশালের নানা স্থানে স্বামীজী যে অমৃত-বাণী বর্ষণ করিয়াছেন, তাহার সম্পর্কে আমাদের কোনও মতামত প্রকাশ করা নিষ্প্রয়োজন। ধর্ম্মরক্ষিণী সভার গৃহে লোকের স্থান কুলায় নাই, টাউন-হলে যাইতে হইয়াছে, সেই সুবিস্তীর্ণ হলেও তিল ধারণের স্থান মিলে নাই;—যার মত বড় হল বোধ হয় এক কলিকাতা ছাড়া বাংলা দেশের আর কোথাও নাই,—এমন ঘটনা বিগত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে বরিশালে কখনও হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে পড়ে না। আপনারা জানেন, ইতঃপূর্ব্বে টাউন-হলে কোনও সভা নিঃশব্দ ও নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইতে দেখা যায় নাই। এজন্য আমি বারংবার টাউন-হলে সভাকে

স্থানান্তরিত করা সম্পর্কে স্বামীজী মহারাজের নিকট অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। তিনি অভয় দিলেন। টাউন-হলে কোনও গোল হইবে না, এই ব্যবস্থা তিনি করিতে পারিবেন। সংশয়ে দোদুল্যমান চিত্ত লইয়া অগত্যা সম্মত হইলাম এবং টাউন-হলেই বক্তৃতা হইবে বলিয়া প্রচার করিলাম। টাউন-হলে গিয়া দেখি, লোকে লোকারণ্য, লোকের স্থান-সঙ্কুলান হইতেছে না, বাহিরে পর্য্যন্ত শত শত লোক দাঁড়াইয়া কোলাহল করিতেছেন। প্রমাদ গণিলাম। ভাবিলাম, আজ বুঝি এই অতি-জনতাই সভার কার্য্য পণ্ড করিবে। কিন্তু স্বামীজী যখন দাঁড়াইলেন, অর্দ্ধ মিনিটের মধ্যে মুখর জনতা নিঃশব্দ হইলেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া যাইতে লাগিল, মাত্র শুনা গেল একটী কম্বু-কণ্ঠের বজ্রনির্ঘোষী বাণী। বিস্মিত হইলাম, স্তম্ভিত হইলাম। স্বামীজী ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে বলিতে আসিয়াছেন, তাঁহার এই আশ্চর্য্য ক্ষমতার ভিতরে তাঁর আবাল্য আচরিত ব্রহ্মচর্য্যের মহিমাই প্রকাশিত দেখিলাম। স্বামীজী দেশবিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা নহেন, বিজ্ঞাপন-বর্জ্জিত নীরব কর্ম্মজীবন যাপনহেতু সর্ব্বস্থলে সুপরিচিতও নহেন, তথাপি আজ সমগ্র বরিশাল শহর তাঁর মুখের বাণী শ্রবণের জন্য এত ব্যগ্র হইয়া ছুটিয়া আসিল কেন? বছর বছর কত ধর্ম্মসভা আমরা করিতেছি, কিন্তু সৎকথা শুনিবার জন্য লোক পাই না। আজ কিসের জন্য এই মরা গাঙ্গে জোয়ার আসিল? স্বামীজী ধ্বংসোন্মুখ জাতিকে বাঁচাইতে চাহেন, দধীচির ন্যায় অস্থিদান করিয়া

অসংযম-দানবকে ধ্বংস করিতে চাহেন, তাই তাঁর উপদেশ শুনিবার জন্য এত ভিড়, এত ঠেলাঠেলি। কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক দলে দলে দূর-দূরান্তর হইতে সকলে সাগ্রহে ছুটিয়া আসিয়াছেন। স্বামীজী আজ একটা নূতন শক্তির বিগ্রহ-রূপে আমাদের সমক্ষে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আমরা এই স্বাবলম্বন-প্রবুদ্ধ ভিক্ষাবিমুখ অযাচক সন্ন্যাসীর চরণে আমাদের কোটি কোটি প্রণিপাত জ্ঞাপন করিতেছি এবং ভগবৎ-সমীপে তাঁহার সুদীর্ঘ জীবন কামনা করিতেছি।"

তৎপরে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রবীণ আচার্য্য ও বরিশালের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার পূজাস্থল শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—

"স্বামীজীর সহিত মনের একটা পরিচয় আমার পূর্ব্বেই ছিল, তাঁর কর্ম্মাদর্শ ও সাধনার প্রতি গভীর একটা শ্রদ্ধা পূর্ব্বাবধিই পোষণ করিতাম, কিন্তু সেদিন তাঁকে দেখা মাত্রই অনুভব করিলাম, আমার চিত্ত অপাত্রে শ্রদ্ধা অর্পণ করে নাই। প্রায় পনের দিন ধরিয়া তিনি বরিশালে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন এবং প্রত্যেকটী বাক্যে তিনি তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য, জ্ঞানবত্তা, ভূয়োদর্শন, বিচার-নিপুণতা প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই ব্যক্তিই পূর্ণ মানুষ, যে ব্যক্তি কুশলী। স্বামীজী তাঁর অপরিমেয় জ্ঞান-সম্ভার ব্যবহারে আশ্চর্য্য কুশলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস বা শাস্ত্র, কাব্য, পুরাণ, বেদ, উপনিষদ, কোরাণ, বাইবেল প্রভৃতি

সর্ব্ববিষয়ে তিনি যে অগাধ বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা একমাত্র সংযমী পুরুষেই সম্ভবে। তাঁর বাগ্‌বিভূতি অতুলনীয়। এমন ভাবে এত বড় জনতাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখা এক অভাবনীয় ব্যাপার। স্বামীজী তাহাই করিয়াছেন। নদীপ্রবাহের ন্যায় অনর্গল বাগ্‌ধারা নিঃসঙ্কোচে প্রবাহিত হইয়াছে, একটী শব্দের জন্য তাঁকে চিন্তা করিতে হয় নাই, একটী তথ্যের জন্য তাঁকে ক্ষণমাত্র থামিতে হয় নাই, সম্মুখে কোনও নোট নাই, তথ্য-স্মারক একটা কাগজের টুকরা পর্য্যন্ত নাই, অথচ চুম্বকাকৃষ্ট লৌহখণ্ডের মত বরিশালবাসীকে তিনি সভাস্থলে আটক করিয়া রাখিয়াছিলেন। যে আসিয়াছে, বক্তৃতা শেষ না হইতে সে আর উঠিতে পারে নাই। একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে, বক্তৃতা শুনিতে বরিশাল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু কিসের বলে ইহা হইয়াছিল? স্বীকার করি, তাঁর পাণ্ডিত্য অতুলনীয়,—দেশীয় ও বিদেশীয় জ্ঞানের এরূপ অগাধ ভাণ্ডার সচরাচর চক্ষে পড়ে না, কিন্তু শুধু পাণ্ডিত্যই নহে; স্বীকার করি, তিনি সুবক্তা,—আমি বাগ্মিশ্রেষ্ঠ বিপিন চন্দ্র পালের সহিত কত সময়ে বক্তৃতা করিয়াছি, আমিও বলিব, স্বামীজীর ন্যায় বক্তা দুর্লভ, অতি দুর্লভ, কিন্তু শুধু বাগ্মিতায়ই নহে; স্বীকার করি, স্বামীজীর কণ্ঠ মধুর এবং মর্ম্মভেদী; স্বামীজীর কণ্ঠ অভ্রচুম্বী এবং প্রাণস্পর্শী, কিন্তু শুধু অপূর্ব্ব কণ্ঠ-সম্পদই নহে; স্বামীজী দেশ ও সমাজের প্রকৃত বেদনার স্থান বুঝিয়া কথা বলিয়াছেন,

দরদের দরদী রক্তমোক্ষণের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ব্যথার ব্যথী হইয়া তিনি সকলকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। যে কথা আমরা বলিতে সাহসী হই নাই, প্রয়োজন বুঝিয়াও কণ্ঠসঙ্কোচ করিয়া গিয়াছি, অতিথি তিনি, সন্ন্যাসী তিনি, ব্রহ্মচর্য্যনিষ্ঠ তিনি, অযাচক তিনি, নির্ভয়ে তাহা বলিয়াছেন, অবনতিদশাগ্রস্ত জাতিকে উঠিবার, বাঁচিবার, মানুষ হইবার আশার ঝঙ্কার তিনি শ্রবণ করাইয়াছেন। তাই এই লোকবিস্ময়কর জনতা ততোধিক বিস্ময়কর নিঃস্তব্ধতার সহিত তাঁর কথা শুনিয়াছে। বরিশালবাসী, শুনিয়াছে তাঁর বাণী, এখন মনন কর সেই বাণীর, ধ্যান কর, সঙ্কল্প গ্রহণ কর, অসংযমের স্রোতে আর অঙ্গ ভাসাইলে চলিবে না। স্বামীজীকে যদি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতে চাও, বরিশালবাসী, তাহা হইলে এই তোমার পথ।"

তৎপরে ভূতপূর্ব্ব সরকারী উকিল, রায় বাহাদুর গণেশ চন্দ্র দাশগুপ্ত বলেন,—

"একজন অযাচক সন্ন্যাসী আসিতেছেন শুনিয়া একটু কৌতূহলী হইয়াছিলাম, তাঁহাকে দেখিবার জন্য। দেখিয়া বিমুগ্ধ হইলাম, শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হইয়া পড়িল। সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত চাঁদার খাতার যন্ত্রণায় গৃহস্থ আজ অধীর। আর, সেই সময়ে এই মহাপুরুষ আবির্ভূত হইলেন, গৃহস্থকে সম্পূর্ণ অভয় দিয়া আর বেকার কর্ম্মহীন অলস যুবকের চখের সাম্‌নে এক মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট যুগোপযোগী আদর্শ লইয়া। স্বামীজীর বক্তৃতাবলি মুগ্ধ-শ্রবণে শুনিয়াছি আর প্রত্যেকটা

অক্ষর-বিন্যাসের পশ্চাতে তাঁর স্বাবলম্বনের শক্তিই যেন প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এমন সম্ভ্রান্ত সুন্দর ভাষা, এমন তেজস্বী শব্দ-বিন্যাস এবং এমন বিচিত্র সাহিত্যিকতার দাবী খুব কম বক্তাই করিতে পারেন। তিনি দুর্নীতিপূর্ণ সমাজ-জীবনে সন্নীতিকে ফিরাইয়া আনিতে চাহেন এবং তিনি অযাচক। অযাচক বলিয়াই এত সাহস, এত নির্ভীকতা তাঁর পক্ষে সম্ভব হইয়াছে। ভিক্ষাবৃত্তি-পরায়ণের পক্ষে এত সাহস অসম্ভব হইত। তিনি আলস্য-তন্দ্রিত যুবকদের মুক্তির পথ-প্রদর্শক। তিনি আমাদের সকলের নমস্য এবং তাঁর সুদীর্ঘ জীবন আমরা কামনা করি।"

অতঃপর বরিশাল আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যাপীঠের ছাত্রবৃন্দের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ চন্দ্র কর এক অভিনন্দন পাঠ করেন। তাহার কিয়দংশ মাত্র উদ্ধৃত হইল।

"হে মহাত্মন্! বহুদিন হইতেই আপনার বিরাট কর্ম্ম-শক্তির কথা লোকমুখে শুনিতে পাইতেছি। যখনই শুনিলাম, আপনি বরিশাল আসিবেন, তখন হইতেই দিন গুণিতে আরম্ভ করিলাম। যার সাথে দেখা হইল, তাকেই বলিলাম,—'বাংলার গৌরব, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানজ্ঞ সন্ন্যাসী শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব আসিতেছেন।' সকলেই আনন্দিত হইলেন। আমরা আপনার শ্রীচরণ-দর্শনে কৃতকৃতার্থ হইয়াছি। আপনার বক্তৃতা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। কেননা, বরিশাল যতদিন থাকিবে, আপনার বক্তৃতার কথা

ততদিন ঘরে ঘরে ঝঙ্কৃত হইবে; যুবক বন্ধুগণ ও মাতৃতুল্যা যুবতীগণ যখনই কুপথগমনেচ্ছু হইবেন, তখনই আপনার মন্ত্রতুল্য ব্রহ্মচর্য্য-পালনের আদেশ তাঁহাদের হৃদয়ের মধ্যে গর্জ্জন করিবে। পরমুখাপেক্ষী দরিদ্রগণ যখনই নিজের ভাগ্যের উপর ধিক্কার প্রদান করিবেন, তখনই আপনার সেই অনশন ও অর্দ্ধাশনে ক্লিষ্ট দেহ কর্ত্তৃক একশত বিঘা পার্ব্বত্য-ভূমির উপর আশ্রম ও কৃষিক্ষেত্র স্থাপনের কথা তাহাদের কর্ম্মশক্তিকে শত গুণে বাড়াইয়া তুলিবে। নৃত্যকারিণী ও তন্নৃত্যদর্শনকারীদের মন আপনার প্রতিবাদের ভয়ে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকিবে। অপ্রিয় কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য শ্রবণে অনিচ্ছুক সিনেমার মালিকগণ ভাবিবেন যে, এরূপ স্বরূপানন্দ বরিশালে দ্বিতীয় বার যেন আর না আসেন। আর, ভগবদ্‌ভক্তগণ ভাবিবেন, স্বামীজী দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া প্রতি বৎসর আমাদের পাষাণ-হৃদয় করুণায় বিগলিত করুন। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি,—'মঙ্গলময়, তোমার যেরূপ আশীর্ব্বাদে সোণার গৌরাঙ্গ হরিনামের প্রবল বন্যায় দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রেমের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ তুলিয়াছিলেন, তোমার যেরূপ আশীর্ব্বাদে বেদান্ত-কেশরী বিবেকানন্দ সমগ্র জগতের কাছে আর্য্যধর্ম্মের মহিমা প্রচারিত করিতে পারিয়াছিলেন, তদ্রূপ আশীর্ব্বাদ স্বামীজীর উপর বর্ষিত কর, স্বামীজীকে দীর্ঘজীবন দান কর, স্বামীজীর কর্ম্মশক্তি শতগুণে বর্দ্ধিত কর, স্বামীজীর অভিক্ষা-মন্ত্রে ভারতবাসীকে দীক্ষিত কর।"

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসজী বিনয়পূর্ণ ভাষায় এই সকল অভিনন্দন-বাণীর প্রত্যুত্তর প্রদান করিলে সভাভঙ্গ হয়।

কমলীকন্দর (বরিশাল)
২০শে ভাদ্র, শনিবার, ১৩৪৩
(৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬)

মহাপুরুষদের আবির্ভাবের তাৎপর্য্য

প্রাতে ছয় ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবামণি বরিশাল শহরের শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে আমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। অন্তেবাসিগণ আগ্রহ সহকারে ঘিরিয়া বসিলে শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহাদের একান্ত অনুরোধে বলিলেন,—মহাপুরুষেরা যখন আবির্ভূত হন, তখন শুধু কয়েক জন লোকের মুক্তির জন্য আসেন না, আসেন বিশ্বের সকলের ত্রাণবার্ত্তা নিয়ে। তাঁদের বার্ত্তার প্রধান কথা এই, "আমি যেমন শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তাত্মারূপে বিরাজ কচ্ছি, তোমরাও প্রত্যেকে কিন্তু তাই, এই কথাটি একজনেও ভুলো না। নিমেষের জন্যও বিস্মৃত হ'য়ো না।" তাঁহারা বলেন,—"ঠিক এই কথাটী বলবার জন্য অনন্ত কোটিবার ঈশ্বরদর্শী ঋষিগণ আবির্ভূত হয়েছেন এবং ভবিষ্যতে তার চেয়ে সহস্র গুণিত সংখ্যায় মহাপুরুষেরা আবির্ভূত হবেন,—তাঁদের দৃষ্টান্ত দেখে অনুপ্রাণিত হও এবং সমগ্র বিশ্বকে ভগবৎ-প্রেমে আপ্লুত ও আপ্লাবিত কর। পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানব-সন্তান

পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ দর্শন করবে, এইখানেই মানব-জীবন লাভের সার্থকতা।" ঋষি, মুনি, মহাজন ও অবতারেরা এই কথাটাই বারংবার স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য আসেন। এত বড় দামী কথা আমরা হেলায় খেলায় ভুলে যাই, আমরা এই কথাটা ক্ষণে ক্ষণে বিস্মৃত হই, এই জন্যই তা'দিগকে বেশী বেশী ক'রে আসতে হয়, বেশী বেশী ক'রে খাটতে হয়। আমরা অলস ও কর্ম্মবিমুখ ব'লেই তা'দিগকে দুরন্ত মেহনতে পড়তে হয়, সুতরাং আমরা যারা নিজেদিগকে ঈশ্বর-বিশ্বাসী এবং মহাপুরুষ-ভক্ত ব'লে মনে করি, তাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে কঠোর পরিশ্রম সহকারে সাধন করা।

প্রাতে সাড়ে ন'টার ষ্টীমারে শ্রীশ্রীবাবামণিকে ঝালকাটি রওনা হইতে হইবে। সুতরাং ধর্ম্মালোচনা অর্দ্ধ ঘন্টার বেশী হইল না।

পাঁঠাবলির মানসিক শোধ

ষ্টীমারে উঠিতেই একজন পুরোহিত শ্রেণীর ব্রাহ্মণ-যাত্রী পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনিই কি এই কয়দিন ধ'রে বরিশাল শহরে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি সম্মতিসূচক ভঙ্গীতে বলিলেন,—হাঁ, কিন্তু আপনি জানলেন কি করে?

পুরোহিত মহাশয় বলিলেন,—এখনও বেলা দশটা বাজে নি। আকাশে ভাস্বর সূর্য্য দেদীপ্যমান। এ সময়ে আপনাকে চিনতে কি কারো কষ্ট হয়? এমন একখানা চেহারা আপনি

(অঃ সং ১৪)—১০

বাগিয়েছেন, যাতে অমাবস্যার অন্ধকারেও আপনাকে চিনতে কারো অসুবিধে হবে না।

শ্রীশ্রীবাবামণি অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। তৎপরে বলিলেন,—থামুন মশায়, মিষ্টি লাগলেও এমন কথা শুনতে নাই।

পুরোহিত বলিলেন,—একটু অপেক্ষা করুন। ঝালকাঠি পৌঁছুবার পূর্ব্বেই দেখুন না আপনাকে কয় ঝাঁক ভীমরুলে কামড়ায়।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তা ত' বুঝলুম। কিন্তু আপনার আসল কথাটা কি, তাই আগে বলুন।

পুরোহিত মহাশয় বলিলেন,—আমার এক যজমান আমাকে মুশকিলে ফেলেছে। সে আমাকে অমনিই বসে বসে দক্ষিণা দেবে। তবু মানসিকের পাঁঠা বলি দেবে না। তার মা মানসিক করেছিল, ছেলের ফাঁড়া কেটে গেলে জোড়া পাঁঠা বলি দিয়ে কালীপূজা করাবে। ছেলে নাকি আপনারই মত কোন এক সাধুর শিষ্য। যে সাধু কালীপূজাও করেন না, শনি, শীতলা বা গ্রহাদিরও পূজা দেন না। অথচ, কালাপাহাড়ও নাকি নন। ছেলের ইচ্ছা অন্য কিছু ক'রে মানসিক শোধ করার। মায়ের ইচ্ছা পাঁঠাবলি দিয়েই কালীপূজা করতে হবে। ছেলে বলছে, বাতাসা দিয়ে হরির লুট দাও। মা বলছে, বাতাসা ত' আর বলি দেওয়া যায় না। ছেলে বলছে, তবে আমাকেই বলি দাও, মানসিক শোধ হয়ে যাবে। আমি ত' একটা গোটা মানুষ। একশোটা পাঁঠার চাইতে

আমার দাম বেশী। মা যান ক্ষেপে। কেঁদে কুঁদে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। আমি পুরোহিত। গৃহস্থের হিত করা আমার কর্ত্তব্য। এক্ষেত্রে আমি কি যে করব, বুঝতে পাচ্ছি না।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—উপায় অতি সহজ।

শ্রীশ্রীবাবামণি জিজ্ঞাসা করিলেন,—মা কালীর পূজো ত' করবেন পাদ্য অর্ঘ্য আর পুষ্প প্রভৃতি দিয়ে? কিন্তু সেই বিশ্বমাতার চিন্ময়ী মূর্ত্তিটী কোথায় পাবেন? কাঠ-খড়-মাটি-রং, শিল্প-কুশলতা আর কল্পনা দিয়ে ত'? ঠিক তেমনি পাঁঠা দুটো চিনি দিয়ে তৈরী করুন। পাঁঠার সাইজ কত বড় হবে, সেটা ট্যাকের পয়সার দিকে তাকিয়ে স্থির করলেই চলবে। আমার মতে এভাবে সমাধান চলতে পারে। তবে, আপনার পছন্দ হবে কিনা, আপনিই জানেন।

ভগবান্ ঘুষ খান না

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভগবানকে ভেট দিলে তিনি তুষ্ট হন, ঘুষ দিলে তিনি খুশী হন, অনেক অর্থ, অনেক খাদ্য না দিলে রুষ্ট হন, এসব ধারণা নিতান্তই গ্রাম্য এবং ভ্রান্ত। ভক্তলোক ভগবানের উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় করেন, ত্যাগ-স্বীকার করেন, ক্লেশ সহ্য করেন, নিজের মনকে তৃপ্তি, আনন্দ, সান্ত্বনা ও আশ্বাস দেবার জন্য। মানসিক শোধের এইখানেই সার্থকতা। দুইটা পাঁঠার দাম এখন কুড়ি টাকা হ'তে পারে। সুতরাং পঁচিশ টাকা খরচ ক'রে হরির লুট বা সমবেত উপাসনা দিলে মানসিক শোধ নিশ্চয়ই হ'তে পারে।

ছেলের মনে যে বিরাগ, সেটা দুষ্প্রাপ্যতার জন্যে নয়, পরন্তু বৃথা জীবহিংসায় অনিচ্ছাহেতু। যে সব বন্ধু-বান্ধবরা আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য বোঝেন, তাঁরা বলবেন, হরির লুটের বাতাসা কি দোষ করেছে? সমবেত উপাসনার নাড়ু, ভালই ত'। কিন্তু যারা রসনা-বিলাসী রাক্ষসগণের মানুষ, তাঁরা মনে মনে আফ্‌শোষ করবেন, হায়রে! কালীপূজার প্রসাদ ব'লে পেঁয়াজটা দিতে পারব না, তবু মাংসের ঝোলটাই ছিল বেশী সুস্বাদু।

পুরোহিত মহাশয় হাসিয়া উঠিলেন।

ভীমরুলের ঝাঁক

শ্রীশ্রীবাবামণি সুটকেশ খুলিয়া চিঠিপত্র লিখিবার আয়োজন করিতেছেন। এমন সময় আর একজন আসিয়া প্রণাম করিল। তারপরে আর একজন, পুনরায় আর একজন। বারোটায় ষ্টীমার জালকাটি পৌঁছিয়া গেল। সুতরাং চিঠি আর লেখা হইল না। প্রণামকারীরা অনেকেই শ্রীশ্রীবাবামণির কথা বরিশালে থাকিতে শুনিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু দর্শন করিতে পারেন নাই। কেহ কেহ সভাস্থলে দর্শন করিয়াছেন, বক্তৃতাও শুনিয়াছেন।

হাসিতে হাসিতে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সত্যই ভীমরুলের ঝাঁক। আফশোষ হচ্ছে, দশ বছর আগে কেন এই জেলাটায় কাজে নামি নাই।

নৌকাযোগে কমলিকন্দর পৌঁছিতে ঘণ্টাখানেক লাগিল।

বরিশালের প্রশংসা

ভক্তিমান্ শিষ্যের গৃহে অন্তরঙ্গ ভাবে কথা কহিতে কহিতে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বরিশাল শহরে প্রাণের বড়ই চাঞ্চল্য দেখ্‌লাম। প্রত্যেকটা প্রাণী যেন সৎকথা শোনবার জন্য উৎকর্ণ। মনোযোগী শ্রোতা আমি সকল স্থানেই পাই, কিন্তু বরিশালের মত এমন আর কোথাও দেখিনি।

শিষ্য চাহি না, সাধক চাহি

গৃহস্বামী জিজ্ঞাসিলেন,—কিছু লোক কি দীক্ষা নিলেন? শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কে যাচ্ছে দীক্ষা দিয়ে লোকের ভিড় জমাতে? আমি দীক্ষার কথা ঘুণাক্ষরেও কাউকে ইঙ্গিত দেই নাই। জগতে সৎলোকের সংখ্যা বাড়লেই আমার লাভ। শিষ্য বাড়িয়ে আমার কোন্ লাভ? আমি শিষ্য চাই না, তোমাদের মত নীরব গোপন একান্ত সাধকই আমি চাই। আমার বিশ্বাস এই যে, প্রকৃত সাধকের সংখ্যা বাড়্‌লে জগতে ভেদ-বিসম্বাদ আর থাক্‌বে না। ভেজাল সাধকের সংখ্যা বাড়্‌লে কলহ অবশ্যম্ভাবী।

দীক্ষামন্ত্র গোপন রাখা কেন

প্রশ্ন হইল,—আচ্ছা বাবামণি, দীক্ষামন্ত্র গোপন রাখায় লাভ কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অনেক লাভ। প্রথম লাভ এই যে, তুমি কি ধরণের সাধন কর, কথাটা প্রকাশ পেলে আসল

সাধনে রুচি ক'মে যেতে পারে, বাইরের ভড়ং এর দিকে মন বেশী ধাওয়া কত্ত গোপনতা দ্বারা এই ক্ষতিটা নিবারিত হ'ল। দ্বিতীয়তঃ, যে যেই জিনিষটাকে প্রাণের অধিক ব'লে গণ্য করে, সে কি সেই জিনিষ নিয়ে বিজ্ঞাপন ছড়ায়? মন্ত্রগুপ্তি সঙ্কল্পের শক্তি বাড়ায়, নামে নিষ্ঠা বাড়ায়।

প্রশ্ন।—বৈষ্ণবরা ত' জপনীয় নামও গান ক'রে বেড়ান।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু কোন্‌টা কার জপনীয় নাম, তা বাইরে প্রকাশ করেন না।

জপনীয় নাম ও কীর্ত্তনীয় নাম

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কীর্ত্তনীয় নামের মধ্যে জপনীয় নামটীর স্মারক ইঙ্গিত থাকে ব'লে কীর্ত্তনীয় নামের অত সমাদর। জপনীয় নামের স্মারক নয় যেই কীর্ত্তনীয় নামটী, প্রকৃত সাধক তা যত্ন-সহকারে বর্জ্জন করেন। সুতরাং কার জপনীয় নাম যে কি, তা বাইরে থেকে অন্য লোকের বুঝতে অসুবিধা হয় না। তথাপি কেউ জপনীয় নামটী প্রকাশ ক'রে বলে না। যেমন, অপরূপ ভট্টাচার্য্যের স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর নাম উচ্চারণ নিষিদ্ধ। অথচ তুমি আমি প্রত্যেকে জানি যে, ঐ স্ত্রীলোকটির স্বামীর নাম কি। ভালবাসা প্রগাঢ় হ'লে তার নাম সহজে উচ্চারণে আসে না, গুপ্তই থাকে। এটা ত' একটা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপারও বটে।

দীক্ষামন্ত্র প্রকাশ পাইয়া গেলে

প্রশ্ন হইল,—কেউ কেউ দীক্ষা লাভের পরে অনবধানতা-বশতঃ বাইরের লোকের কাছে দীক্ষা-মন্ত্র প্রকাশ ক'রে ফেলে। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি হবে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কি আর হবে? প্রতিজ্ঞা কত্তে হবে যে, দীক্ষা মন্ত্র আর প্রকাশ ক'রে কাউকে বলা হবে না। ভুল কেউ কর্ল্লে তার প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে সংশোধনে। যে ভুল একবার করা হয়েছে, দ্বিতীয় বার যেন আর সেই ভুল না ঘটে, তার জন্য প্রয়োজন সতর্ক থাকা। প্রায়শ্চিত্তের নাম ক'রে আবার গোময়, গোমূত্র থেকে সবগুলি পঞ্চগব্য সেবন কত্তে হবে না। ভুল একবার করেছ, ভুল দুইবার, তিনবার, চারবার ক'রো না। এইটুকু জিদ্ থাকাই দরকার। তা হ'লেই হ'ল।

যশোহর

২৫শে ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৪৩

(১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬)

প্রাতে আটটা আটত্রিশ মিনিটে ট্রেণযোগে শ্রীশ্রীবাবামণি যশোহর পৌছেন। ডিষ্ট্রীক্ট হেল্‌থ অফিসার শ্রীযুক্ত সুবোধ চন্দ্র সেনের গৃহে তাঁহার আতিথ্যের ব্যবস্থা হইয়াছে। সাব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র নাথ রায়ের উদ্যোগে ধারাবাহিক আট দিন বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়াছে জানা গেল।

রণক্ষেত্র পরিদর্শন

স্নান করিয়াই শ্রীশ্রীবাবামণি পদব্রজে শহর দেখিতে বাহির হইলেন। সঙ্গীয় জনৈক ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিল,—আপনি কি সভাস্থল দেখতে যাচ্ছেন?

ব্রহ্মচারীর ধারণা যে, শ্রীশ্রীবাবামণি যখন সর্ব্বত্রই বক্তৃতার আগের দিন সভাস্থল পরিদর্শন করিতে যান, তখন এখানেও সম্ভবত তাহাই করিতে বাহির হইতেছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আরে না, তা নয়। সভাস্থল দেখব কেন, টাউনটা দেখব।

শ্রীশ্রীবাবামণি একাই শহর দেখিতে বাহির হইলেন। ঘণ্টা খানেক ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—দেখে এলাম শহর। দু'একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, সভার খবর জানে কিনা। উত্তর পাওয়া গেল, না। জিজ্ঞেস করলাম, টাউন-হলটা কোথায়? সকলের মুখে একই কথা, একজন দোকানদার বললেন, তিনি বিজ্ঞাপন একখানা দেখেছেন, আরও বললেন তাতে আমার ফটোও আছে। তাতেই বুঝলুম আমাদের ছাপান যে বিজ্ঞাপন বিলি করার জন্য এখানে পাঠান হয়েছিল, জিতেন বাবু তা লোক দিয়ে বিলি করিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু বিজ্ঞাপন কেউ পড়ে নাই। একটা চায়ের ষ্টলে ছেঁড়া অবস্থায় একটা বিজ্ঞাপন দেখতেও পেলুম। অনুমান হ'লো, এখানে শুধু বিজ্ঞাপন বিলি করলেই হ'ল না, সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞাপনে কি আছে, তা ব'লেও দিতে হবে। লোকগুলো অশিক্ষিত নয়, কিন্তু কৌতূহল-বর্জ্জিত। এখানে মিটিং জমবে না রে।

জনৈক ব্রহ্মচারী বলিল,—একটা ভাষণ দিয়েই কলকাতা ফিরবেন? নইলে, বরিশাল চলুন।

গৃহস্বামী বলিলেন,—টাউন-হল দুই দিনের বেশি পাওয়া যাবে না।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু বিজ্ঞাপনে আছে, আমি আট দিন ভাষণ দেব। দিনের সংখ্যা কমাই কি ক'রে?

অপরাহ্ণ সাড়ে ছয় ঘটিকায় টাউন-হলে বক্তৃতা আরম্ভ হইল। শ্রোতার সংখ্যা হইল জনা পনেরো। সভাপতিত্ব করিলেন স্থানীয় উকিল শ্রীমন্মথ নাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জনতা কম হয়েছে ব'লে আমার আফশোষ নেই, শ্রোতা যদি একজনও না আসতেন, তাহ'লেও আমি এই টুল-টেবিল চেয়ারগুলোকে উপলক্ষ্য ক'রেই ভাষণ দিয়ে যেতাম। কারণ, এগুলো বাহ্য দৃষ্টিতে জড়-পদার্থ ব'লে প্রতীয়মান হ'লেও এদের ভিতরেও চৈতন্য-সত্তা বিরাজিত। আমি জড়কে উদ্দেশ্য ক'রে নিশ্চয় কিছু বলতাম না। আমার লক্ষ্য সেই চৈতন্যকে সেবা দেওয়া, যেই চৈতন্য আছেন ব'লেই আমি কথা বলি, আপনারা শোনেন, আপনারা কথা বলেন, আমি শুনি। সর্ব্বভূতে এক নিত্য-চৈতন্যকে দর্শন করার চেষ্টার নামই সাধন। তাঁকে অনুভূতিগম্য করার অধ্যবসায়ের নামই তপশ্চর্য্যা।

বক্তৃতা ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় দুই ঘণ্টা চলিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পরের ক'দিনও আমি ঠিক দু'ঘণ্টা ক'রে রোজ বলব।

শ্রোতারা এবং সভাপতি মহাশয় সকলেই বক্তৃতার খুব

প্রশংসা করিলেন এবং লজ্জিত ভাবে আশ্বাস দিলেন যে, আগামী দিন বন্ধু-বান্ধবদের নিয়া আসিবেন।

যশোহর সত্যই যশোহর

২৬শে ভাদ্র, ১১ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার যথাকালে টাউন-হলে গিয়া দেখা গেল যে, সদস্য মহোদয়েরা হলের মাঝখানে বিলিয়ার্ডের টেবিল আনিয়া বসাইয়াছেন, তাঁহারা বিলিয়ার্ড খেলিবেনই।

শ্রীশ্রীবাবামনি বলিলেন,—না, তা হবে না, আমি ভাষণ দেবই। শ্রোতারা এখানে থাকবেনই। হলের দু'দিনের ভাড়া আমি আগেই চুকিয়ে দিয়েছি, এই দেখুন রসিদ। প্রতিপক্ষরা শহরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।

শ্রীশ্রীবাবামনি বলিলেন,—চাঁদা তুলতে আসি নি। আপনাদের দয়াদত্ত দান সংগ্রহ ক'রে আশ্রম চালাবার ফন্দী নিয়ে আসি নি। ঠিক দু' ঘন্টা অর্থাৎ সাড়ে আটটা পর্য্যন্ত আমার ভাষণ চলবে। শ্রোতা নেই ব'লে আমার লজ্জা নেই।

বিলিয়ার্ড টেবিল হঠিয়া গেল। বক্তৃতা আরম্ভ হইল। অদ্য শ্রোতার সংখ্যা পঁচিশ।

২৭শে ভাদ্র হইতে ১লা আশ্বিন পর্য্যন্ত স্থানীয় উকিল বারের হলে প্রত্যহ অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচটায় বক্তৃতানুষ্ঠান হইতে লাগিল। অষ্টম বক্তৃতাটী উপসংহার-স্বরূপ শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আজও হল পূর্ণ হইল না। যশোহর সত্যই যশোহর। আমার একটা সুনাম ছিল যে, কোথাও গেলে হল

ভরতি হইয়া যায়, মাঠ প্লাবিত হইয়া যায়। কিন্তু আমার সেই সুনাম নিয়ে যশোহর থেকে আমি যেতে পারলাম না। যশোহরই একমাত্র স্থান যেখানে আমার যশ অপহৃত হ'ল। কিন্তু এই আট দিন ধ'রে আমি যে ভাষণ দিলাম, তা বিফলে যায় নি, কাল সকালেই আমি এখান থেকে একটী রত্ন আহরণ ক'রে নিয়ে যাব। যার ছোঁয়াচ লেগে যশোহরের অনেক প্রাণ জাগবে।

রত্ন আহরণ

পরদিন ২রা আশ্বিন প্রাতে ছয় ঘটিকায় বন্দবিলা-নিবাসী জনৈক যুবকের দীক্ষা হইল, যাহার আপ্রাণ সেবায় পরবর্ত্তী কালে অনেক শিক্ষিত ও অশিক্ষিত নরনারীর জীবনে জাগরণ আসিয়াছে। রত্নটীর নাম সুধাংশু শেখর চক্রবর্ত্তী।

যশোহরে দর্শনার্থীর ভিড় ছিল না। সুতরাং প্রাতে ও দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীবাবামণির পত্র লিখিবার নির্ব্বিঘ্ন অবসর ছিল। এই আট দিনে তিনি প্রায় দেড় শত টাকার ডাক-খরচ করিলেন পত্র লিখিতে। যে সকল পত্র তিনি এই কয় দিনে লিখিলেন, তাহার কয়েক খানার আংশিক অনুলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

অখণ্ডমণ্ডলী ও রাজনীতি

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত ধামতী গ্রাম-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,

"অখণ্ডমণ্ডলীর সহিত রাজনীতির কোন সম্পর্ক রাখা

উচিত নহে। অথচ, রাজনৈতিক চেতনা ক্রমশঃই অধিকাংশ লোকের মনে জাগরিত হইতেছে। একদিন এমনও হইতে পারে যে, শতকরা আশি নব্বই জন লোক রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে সমাজের ও রাষ্ট্রের যাবতীয় শুভাশুভ বিচার করিবে। তখন কি অখণ্ডমণ্ডলীগুলিকে রাজনৈতিক কলহের আড্ডাখানায় পরিণত করিতে হইবে? রাজনৈতিক মতবাদ এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের কলহকে বহির্দ্বারে রাখিয়া আসিয়া প্রত্যেককে মণ্ডলীর ঘরে ঢুকিতে হইবে, যেমন করিয়া পায়ের জুতো মন্দিরের বাহিরে রাখিয়া তবে প্রবেশ কর। জগতে এমন একটা স্থান থাকা দরকার, যে শান্তিময় নীড়ে বাহিরের অশান্তি উৎপাত সৃষ্টি করিতে পারিবে না। অখণ্ডমণ্ডলী তোমাদের তেমন জিনিস। অখণ্ডমণ্ডলী তোমাদের তেমন আশ্রয়। ইহার মর্য্যাদা কদাচ ক্ষুণ্ণ করিও না, লঙ্ঘন করিও না।"

স্বচ্ছ চিন্তার সৎ-শক্তি

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত পাইকপাড়া গ্রাম-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তুমি যদি তোমার নিরালা কুটিরে বসিয়া একান্ত মনে স্বচ্ছ-চিন্তার অনুশীলন কর, তাহা হইলে তাহার সৎশক্তি লক্ষ-যোজন দূরে হইলেও কোথাও না কোথাও কাহারও না কাহারও প্রাণে সৎ-সংগ্রামের প্রেরণা যোগাইবে। এই কথার যাথার্থ্য আমি সুস্পষ্ট রূপে জানিয়াছি। এই জায়গায় মানুষ

পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বলদর্পিত অসুরকে তুমি হয়ত অস্ত্রবলে নিধন করিতে পার নাই, আমি হয়ত মনঃশক্তির অমোঘ প্রভাবে তাহাকে হীনবীর্য্য করিতে পারিব। নব-জাগ্রত দেবজাতির আবির্ভাবের ইহাই হয়ত কোটি-নক্ষত্র-খচিত ছায়াপথ হইবে, তাহার প্রমাণ আমি পাইয়াছি। যাহা আমি প্রত্যক্ষ উপলব্ধিতে পাই নাই, এমন প্রত্যয়ে আমি আস্থা ন্যস্ত করি না। ইহা আমার আজন্ম স্বভাব। তোমাদিগকে আমি না বুঝিয়া আমার কথা বিশ্বাস করিতে বলিতেছি না। সৎ-চিন্তার তীব্র অনুশীলন করিয়া একথার সত্যতার পরখ লইয়া লও। অবক্ষয়কারী চিন্তা-প্রবাহ প্রবল স্রোতে বহিতেছে বলিয়াই ভয় পাইবার কিছু নাই। একদিকে যখন একদল লোক চিন্তার জগতে উচ্ছৃঙ্খলতা আনিয়া সতী-সাধ্বীকে প্রচ্ছন্ন গণিকায় পরিণত করিতে চলিয়াছে, অপর দিকে তখন আমরা মহৎ চিন্তার অমোঘ প্রভাবে এমনই বিদ্যুন্ময় ঝঙ্কার সৃষ্টি করিব, এমনই সমুদ্র-শোষণী মহাচুম্বকের অবর্ণনীয় শক্তির আবির্ভাব ঘটাইব, যাহাতে রুক্ষমূর্ত্তি মহাসমুদ্র নিমেষ-মধ্যে শ্যামায়ন-শোভান্বিত শস্য-প্রান্তরে রূপান্তরিত হইয়া যায়। স্বচ্ছ চিন্তার শক্তিতে আমরা অকল্পনীয়কে বাস্তবায়িত করিব, অসম্ভবকে নয়ন-গ্রাহ্য করিব, অভাবনীয়কে লাভ করিব। প্রত্যেকের মনে মহচ্চিন্তার এই শক্তিতে বিশ্বাস জাগাও। ইহার অপেক্ষা বড় সেবা দেশ, জাতি ও জগৎকে কেহই দিতে পারিবে না। যাহাদের আচার-বিচার-প্রচার মানুষের শ্রবণ-নয়ন-মনকে

কলুষিত করিতেছে, তাহাদিগকে প্রতিরোধ আমরা এই ভাবেই করিব।"

ধর্ম্মের নামে বীভৎস আচরণ

ময়মনসিংহ জেলান্তর্গত দিলালপুর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ধর্ম্মের নামে নানা বীভৎস আচরণ নানা যুগে নানা দেশে পৃথিবীতে বারংবার অনুষ্ঠিত হইয়াছে। যে দেশে যখনই নীতি-জ্ঞানের মান আংশিক উন্নত হইয়াছে, সেই দেশে তখনই তদ্দেশবাসী চিন্তানায়কেরা ঐ সকল আচরণকে সংশোধিত করিয়াছেন। কেহ করিয়াছেন মৃদু মধুর বচনে, কেহ করিয়াছেন অশনি সঞ্চালনে। তথাপি নানা দেশে, নানা ভাবে ধর্ম্মের নামে অনেক অপকাণ্ড এখনও ঘটিতেছে, যাহার সংশোধন বা সম্যক বিদূরণ এখনই প্রয়োজন। হিন্দু-সমাজ তাহার ব্যতিক্রম-স্থল নহে। তোমার পত্রে লিখিত ঘটনাগুলি তাহার দৃষ্টান্ত। গ্রাম-বৃদ্ধেরা উদাস-নেত্রে দেখিতেছেন বলিয়া গ্রামের যুবকেরাও উদাসীন থাকিবে, ইহা কাজের কথা নহে। ধর্ম্মের নামে মদ্যপান, ধর্ম্মের নামে পরস্ত্রী-সম্ভোগ, ধর্ম্মের নামে মলমূত্র সেবন অতি ন্যক্কারজনক জঘন্য ব্যাপার। এই সকলের সাড়ম্বর সমর্থন আমি অনেক অনুষ্টুপ-ছন্দওয়ালা পণ্ডিতকেও করিতে শুনিয়াছি। আর, বাংলা-পয়ার-ছন্দে সুন্দর সুন্দর কবিতা আবৃত্তি করিয়া সমর্থন করিবার লোকের ত' অভাবই নাই। এই সকল ঘৃণ্য মতামত প্রচারের ফলে অতীব নিরীহ

লোকের মনেও অন্যায় রিরংসা জাগিয়া থাকে। উহা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। মানুষের মূত্র পান করিলে অসাধারণ যৌগিক সামর্থ সঞ্চিত হইয়া থাকে বলিয়া প্রচারিত হইতে শুনিয়াছি, প্লীহা রোগীর পক্ষে গোমূত্র পান হিতকর হইলে হইতে পারে। কিন্তু মানুষের মূত্র পান করিলে যোগৈশ্বর্য্য লাভ হইতে পারে, ইহা আমি বিশ্বাস করি না। জগতে খাদ্য-পানীয় ও উপভোগ্য বস্তুর অভাব ভগবান্ রাখেন নাই, সেই অবস্থায় মল, মূত্র ও পরিত্যক্ত শুক্র অথবা নারীর রজোরক্ত পান করিতে যাইবে কোন দুঃখে? এই সকল ব্যবহার পৈশাচিক আচার মাত্র। তোমরা এই সকল প্ররোচনায় কর্ণপাত করিও না।"

নরনারীর অস্বাভাবিক আকর্ষণের প্রতীকারোপায় ব্রহ্মবিলাস

ঢাকা ওয়াইজঘাট-নিবাসিনী জনৈকা মহিলার পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"পুরুষ এবং নারীর মধ্যে ভালোবাসা একটা সর্ব্বজনীন ব্যাপার এবং পুরুষ-মাত্রেরই পক্ষে নারী বিশেষের প্রতি এবং নারী-মাত্রেরই পক্ষে পুরুষ-বিশেষের প্রতি মাত্রাধিক আসক্তি অনুভব করিবার সম্ভাবনা মানব-স্বভাবের মধ্যেই রহিয়াছে। তবে সুধন্য কোনও কোনও পুরুষ এবং কোনও কোনও নারী এই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম বা প্রকৃতির বিস্ময়রূপে অবতীর্ণও

হন। তাঁহারা নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের নমস্য ও নমস্যা। সাধারণ ক্ষেত্রে নারীর পক্ষে পুরুষে আসক্ত হওয়াই স্বাভাবিক, পুরুষের পক্ষে নারীতে আসক্ত হওয়াই প্রত্যাশিত। কিন্তু ইহারও ব্যতিক্রম হইতে দেখা যায়। তোমার ক্ষেত্রে সেইরূপ একটী ঘটনাই ঘটিয়াছে। একজন পুরুষকে নিয়া সমগ্র জীবন স্বামী-স্ত্রী-রূপে সুখে কাল কাটাইবার তোমার কল্পনা নাই, অথচ তুমি নিজে নারী হইয়াও অনুবয়সিনী একটী মেয়েকে নিয়াই তোমার প্রেমের সংসার। তাহাকেই তুমি পত্নীরূপে চাহ এবং নিজে পতির অভিনয় করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবে বলিয়া মনে করিতেছ। ইহা স্বভাবের নিয়ম নহে। ইহা অস্বাভাবিক ব্যাপার বা প্রাকৃতিক নিয়মের ঘোরতর এক ব্যতিক্রম। অনেক পুরুষের জীবনেও এইরূপ ঘটনা ঘটে, যাহারা বিবাহিতা পত্নীকে নিরন্তর কাছে পাইয়াও আসক্ত নহে কিন্তু অনুবয়স্ক একটী পুরুষকে নিয়া দিবারাত্র পরম সুখে কাটাইবার অভিলাষ পোষণ করে। ইহারা প্রত্যেকেই রুগ্ন। ইহাদের রোগ মনের। মনের বিকার-বশে ইহারা এইরূপ অভিলাষ অন্তরে পোষণ করে। কিন্তু ইহারও প্রতীকার আছে। প্রতীকার ব্রহ্মবিহার অথবা আরও স্পষ্ট ভাষায় বলিব, ব্রহ্মবিলাস। এই রোগ যাহাকে ধরিয়াছে, এই অবাস্তব আসক্তি যাহাকে কবলিত করিয়াছে এবং নানা অবাঞ্ছনীয় পরিণতিতে শাস্তির পর শাস্তি দিতেছে, তাহার বাঁচিবার পথ ব্রহ্মবিলাস। অর্থাৎ আমি স্ত্রী নহি, আমি পুরুষ নহি, আমি লিঙ্গাতীত পরমপ্রভু পরমেশ্বর। এই ধ্যানটিকে অনুক্ষণ অন্তরে জাগ্রত রাখা। এই একটী

অনুশীলনের দ্বারা নিতান্ত দুর্ব্বল মনোবিকারগ্রস্ত কঠিন রোগীও এই দুরবস্থার পঙ্ককুণ্ড হইতে উত্থান লাভ করিয়া ব্রহ্মবিহার করিতে পারে। আমিই ব্রহ্ম, সত্ত্ব-রজ-স্তমঃ আদি ত্রিগুণের আমি উর্দ্ধে, আমিই ব্রহ্ম, দেশ-কাল-পাত্রাদি বিচারের আমি অনেক উর্দ্ধে আমিই ব্রহ্ম, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান প্রভৃতি কাল-পরিমিতির সীমা লঙ্ঘন করিয়া আমি অনেক বাহিরে, আমি ব্রহ্ম, স্থানান্তর, কালান্তর, রূপান্তর, জন্মান্তর প্রভৃতির আমি অনেক উর্দ্ধে। আমিই ব্রহ্ম, আমি শরীরী, আমি অশরীরী, আমি দৃশ্যমান, আমি অদৃশ্য, আমি ইতিবাচক, আমি নেতিসিদ্ধ, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য এবং আমিই সেই সত্য। এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে দেহ-বিকার, ইন্দ্রিয়-বিকার, রুচি-বিকার, মনোবিকার, সবই আপনা আপনি লুপ্ত হইয়া যায়। এবং মানুষ তার স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দতায় ফিরিয়া আসে। তুমি এই উপদেশ পালন কর মা।"

প্রকৃত কর্ম্মী ও নেতার লক্ষণ

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত বালিকা-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যতক্ষণ তুমি নিরহঙ্কার, ততক্ষণই তুমি কর্ম্মী। অহঙ্কার আসিল কি, তোমার কর্ম্মিত্বও গেল, যোগ্যতাও গেল, প্রভাব-শক্তিও নাশ পাইল। প্রকৃত কর্ম্মী কয়টা কর্ম্ম হাতে পায়ে করে। অধিকাংশ কর্ম্মই ত' সে তাহার প্রভাবশক্তির মহিমায় লোককে দিয়া করাইয়া লয়। হত্যা-সঙ্কুল যুদ্ধক্ষেত্রেই

বল, আর সমস্যা-সমাকীর্ণ রাজনীতিই বল, কিম্বা সেবাসুন্দর আরোগ্যশালাই বল, সর্ব্বত্রই প্রভাব-শক্তির জয়জয়কার, নিরভিমানত্ব এই প্রভাবশক্তি দান করে। তাই ইহা প্রকৃত কর্ম্মীর শ্লাঘ্যতম অলঙ্কার। ছোট্ট একটী দলের নেতৃত্ব পাইয়াই তোমরা অহঙ্কারে গদ্‌গদ্ হইয়া যাও। আর, আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট, জুলিয়াস সীজার, নেপোলিয়ন বোনাপার্ট অগণিত সৈন্যদল হস্তমুষ্টির মধ্যে পাইয়াও যথেষ্ট হইল বলিয়া মনে করেন নাই। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে ইঙ্গিত সংগ্রহ কর। সহধর্ম্মীদিগকে ভালোবাসিবে না; অথচ, তাহাদিগকে দিয়া কাজ করাইয়া লইবে, ইহা ভ্রান্তবুদ্ধির পরিচায়ক। সহকর্ম্মীদের সম্মান রক্ষা করিয়া কথা বলিবে না, অথচ ইহাদিগকে দিয়া নিজ অভিপ্রায় পূরণ করাইয়া লইবে, এইরূপ প্রত্যাশা বাতুলতা মাত্র। সকলের সম্মান যে রাখিতে পারে, সেই সকলের নেতা হয়। সকলের যে নেতা হয়, তাহাকে সকলের সেবক হইতে হয়।"

সংগ্রাম চালাইয়া যাও

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত করিমপুর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যতকাল জীবিত রহিয়াছ, ততকালই সংগ্রাম চালাইয়া যাও। নতি স্বীকার করিবে কেন? তুমি ত' পশুপক্ষী বা কীট-পতঙ্গ হইয়া জন্মগ্রহণ কর নাই। মানুষ ইচ্ছা করিলে সর্ব্বপ্রকার কদভ্যাসকে বর্জ্জন করিতে পারে। ইন্দ্রিয়-দমন

মানুষের পক্ষেই সম্ভব কাজ। পশুপক্ষীদের ইন্দ্রিয়-দমনের জন্য সাধনার কোনও সুযোগও নাই, প্রয়োজনও নাই। তুমি মানুষ বলিয়াই তোমার সুযোগ আছে, প্রয়োজনও আছে। আমৃত্যু অধ্যবসায় লইয়া রিপুকে জয় করিবার সাধনা চালাইয়া যাও। এই অধ্যবসায় তোমাকে দেবস্বভাব প্রদান করিবে, তুমি সামান্য নগণ্য মানুষ হইতে দেবতায় রূপান্তরিত হইবে। যে যতটুকু নির্লোভ, যতটুকু নিষ্কাম, যতটুকু অক্রোধ, যতটুকু নির্লিপ্ত, সে ততটুকু দেবতা।"

খুলনা

৩রা আশ্বিন, শনিবার, ১৩৪৩

(১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬)

অদ্য প্রাতে আটটা চোদ্দ মিনিটের ট্রেণে শ্রীশ্রীবাবামণি যশোহর ত্যাগ করিয়াছেন। ষ্টেশনে শ্রীসুধাংশু শেখর চক্রবর্ত্তী আসিয়াছেন। প্রণাম করিয়া বলিলেন,—বাবামণি, আমাদের ভুলিবেন না।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমরাও আমাকে ভুলিও না।

বেলা দশটা দশ মিনিটে ট্রেণ খুলনা পৌঁছিল। স্থানীয় বিশিষ্ট মোক্তার শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ রায় মহাশয় স্বয়ং ষ্টেশনে আসিয়া নিজ গৃহে লইয়া গেলেন। তিনি বলিলেন,—আপনার স্নিগ্ধ যশোরাশি আকাশ-বাতাস মথিত করিয়া আমাদের নিকটে পৌঁছিয়াছে, তাই বড় ব্যগ্র ছিলাম আপনার চরণ-দর্শনের জন্য। আমি স্বামী দয়ানন্দের আর্য্য-সমাজ প্রচারিত ধর্ম্মগ্রন্থ-সমূহের অনুরাগী এবং পুত্তলিকা পূজা, জাতিভেদ-প্রথা

অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি কুসংস্কার মানি না। আমার মত একজনের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া আপনি কি কোন তৃপ্তি পাইবেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—আমি নিজে আপনার চেয়ে অনেক বড় কালা-পাহাড়। তাই ভাবিতেছি, আমার সংসর্গে আপনি অতিষ্ঠ হইবেন না ত'?

প্রিয়নাথ বাবু প্রণত হইলেন।

অপরাহ্নে আর্য্য-ধর্ম্মসভাগৃহে বক্তৃতারম্ভ হইল। জনতা এত হইয়াছিল যে, ধর্ম্মসভাগৃহে স্থান সঙ্কুলান হইতেছিল না। বৃষ্টির ভয়ে আর খোলা মাঠে নামা চলিল না।

খুলনাতে ধারাবাহিক আট দিন বক্তৃতা চলিয়াছিল। তাহার বিবরণ অল্পই রাখা সম্ভব হইয়াছে।

অদ্যকার সভায় শ্রীশ্রীবাবামণি সেই কথাই বিস্তারিত বর্ণনা করিলেন, যে কাজগুলি স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী দয়ানন্দ, রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতির আবির্ভাবের ফলে ভারতবাসীর সামাজিক জীবনের উপরে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

বিবেকানন্দ, দয়ানন্দ ও রামমোহন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আর্য্য-সমাজ দিয়াছেন সৎ-সাহস, ব্রাহ্ম-সমাজ দিয়াছেন স্বাধীন চিন্তা-ক্ষমতা। স্বামী বিবেকানন্দের কর্ম্ম ও মিশন দান করিয়াছে আত্মোৎসর্গের প্রেরণা। উক্ত তিন জন যুগবিপ্লাবকের চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার মান সমান নহে, কিন্তু পরস্পর পরস্পরের অনুপূরক। এঁদের নামে আমরা জয়ধ্বনিই ত' দিলাম কিন্তু সাহস ক'রে এঁদের

আচরণ অনুসরণ কর্ল্লাম না। তারই জন্য বিরাট বিরাট মহাপুরুষের আবির্ভাবও জাতীয় জীবনে ব্যর্থ হ'য়ে যাচ্ছে। প্রয়োজন হচ্ছে আদর্শানুসরনের, গল্প-গুজবের নয়। আদর্শ অনুসরণ কত্তে হলেই ব্রহ্মচর্য্য চাই, ব্রহ্মচর্য্যের জন্যই সংযত জীবন-যাপন-প্রণালী গ্রহণ করা চাই। সমগ্র জাতিটাকে একটা সৎ-শৃঙ্খলার ভিতরে নিয়ে আসা আজ প্রয়োজন। আমাদের আবেদন শুধু এইটুকুই।

বক্তৃতা দুই ঘন্টাকাল চলিল। বক্তৃতান্তে অনেক সজ্জন প্রিয়নাথ বাবুর বাড়ীতে আসিয়া দেখা করিলেন এবং নিজ নিজ জিজ্ঞাস্য বিষয় উপস্থাপিত করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন —ধারাবাহিক বক্তৃতা-প্রসঙ্গে দিনের পর দিন প্রত্যেকটী প্রসঙ্গ তিনি তুলিবেন।

দর্শনার্থীরা খুশী মনে গৃহে ফিরিলেন।

খুলনা
৪ঠা আশ্বিন, রবিবার, ১৩৪৩
(২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬)

স্ত্রীজাতিতে মাতৃভাবের প্রয়োজনীয়তা

অদ্য খুলনা আর্য্য-ধর্ম্ম-সভাগৃহে শ্রীশ্রীবাবামণির দ্বিতীয় ভাষণ হইল। তিনি বলিলেন,—আজ কুমিল্লা জেলার চাঁদপুরে আমাদের চিত্র-প্রদর্শনীর দ্বার উদঘাটন হচ্ছে। আমি খুলনায় আবদ্ধ, সুতরাং ইচ্ছা সত্বেও সেখানে যেতে পাচ্ছি না। এই

চিত্র-প্রদর্শনীতে আছে লোকহিতকর অনেক ইঙ্গিত, আছে স্ত্রীজাতিতে মাতৃভাবের শিক্ষা, স্ত্রীজাতিতে মাতৃভাব এলে পুরুষমাত্রই এমন একটা সবলতা আহরণ করে, জগতে যার তুলনা নাই। এই জন্য আজ মাতৃভাব সম্পর্কেই বিশেষ ভাবে বলব।

বক্তৃতা দুই ঘন্টা কাল চলিল।

বক্তৃতান্তে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ রায় মহাশয়ের বৈঠকখানায় একটা কনফারেন্সের মত বসিল। এক একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি এক এক রকম বলিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি মাঝে মাঝে কিছু কিছু বলিলেন।

মাতৃভাব সাধকের কালীপূজা আবশ্যক কিনা

একজনের কথার উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন— স্ত্রীজাতিতে মাতৃভাব-সাধকের পক্ষে কালীপূজা, দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতী পূজা প্রভৃতি আবশ্যক কিনা, এটা একটা প্রশ্নই নয়। লোকে কালীপূজা, দুর্গাপূজা করে আধ্যাত্মিক সাধন-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে। আজ স্ত্রীজাতিতে মাতৃভাব-পোষণের প্রয়োজন মানসিক সংযমকে অটুট রাখার আবশ্যকতা হেতু। উদ্দেশ্যের পার্থক্যের দরুণ উপায়েরও পার্থক্য হবে। রহিম বা ডেভিড কালী, দুর্গা মানে না। কারণ, তারা মুসলমান বা খ্রীষ্টান। কিন্তু স্ত্রীজাতিতে তাদেরও মাতৃভাব প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন মনুষ্যত্বের পূর্ণতা-সাধনের জন্য। অটুট অক্ষুণ্ণ ইন্দ্রিয়-

সংযমের জন্য। সুতরাং হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, খ্রীষ্টান হউক, প্রত্যেককে আগে নিজ নিজ মাতাতে ভক্তি-সম্পন্ন হ'তে হবে। নিজ মাকে যে ভক্তি করে না, সে পরের মাতা, পরের কন্যা, পরের ভগিনীর প্রতি মাতৃভাব পোষণ কত্তে পারে না।

মাতা, জন্মভূমি ও মাতৃভাষা

অপর একজনের কথার উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— মাকে ভালোবাসতে না পারলে জন্মভূমিকেও ভালোবাসা যায় না। মা ছিলেন ব'লেই ত' জন্মভূমিকে দেখলাম। মা ছিলেন ব'লেই মাতৃভাষা শিখলাম। জননী, জন্মভূমি ও মাতৃভাষাকে পৃথক্ ক'রে ভাবা কঠিন। দেশ-জননীকে ভালবাসলে, বিশ্বজননীও ভালোবাসার বস্তু হবেন। আমাদের মাতৃভক্তি নাই, এজন্যই আমরা সবগুলি ব্যাপারে পিছনে প'ড়ে আছি।

ইউরোপের মাতৃভক্তি

একজন প্রশ্ন করিলেন,—ইউরোপের লোকদের মাতৃভক্তি কি আমাদের চাইতে বেশী, না কম?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সে কথা আমি জানি না। কিন্তু ইউরোপীয়দের স্বদেশপ্রেম আমাদের চাইতে বেশী। সে স্বদেশপ্রেম অত্যন্ত উগ্র ব'লে আমাদের অনুকরণীয় নয়। কিন্তু কে জানে তাদের স্বদেশপ্রেমের উগ্রতার কারণও হয়ত মাতৃভক্তির অভাব। মাতৃভক্তি নির্ম্মল ও সবল হ'লে স্বদেশের প্রতি প্রেম আসে কিন্তু বিদেশের প্রতি বিদ্বেষ আসে না।

ভক্তি জিনিষটা বড়ই নির্ম্মল বস্তু। তার মধ্যে গোময় বা কর্দ্দমের মিশ্রণ পোষায় না।

বীর সাভারকার

অন্য প্রসঙ্গ উঠিলে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই খুলনা শহরে সম্প্রতি বীর সাভারকার ঘুরে গেছেন। তিনি একটা অদ্ভুত মন্তব্য ক'রে গেছেন। ভারতবর্ষের কত প্রদেশ তিনি ভ্রমণ করেছেন। দেখেছেন, সব মুসলমানেরা এক ভাষায় কথা বলে, সব হিন্দুরা আর একটা ভাষায় কথা বলে। তিনি বঙ্গ দেশে এসেই প্রথম দেখলেন যে, হিন্দু আর মুসলমানের মাতৃভাষা এক। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সহকারে লক্ষ্য ক'রে দেখলেন যে, ভাষার এই ঐক্য বাংলাদেশে হিন্দু ও মুসলমানের আত্মীয়তা অক্ষয় করবে। তোমাদেরই মুখে সব শুনলুম। সাভারকারের কথাগুলি আমার বড় ভালো লেগেছে।

বেশভূষার প্রশংসা

একজন সম্মানিত মুসলমান উকিল বলিলেন,—আপনার বক্তৃতা মন দিয়ে ত' শুনলাম, কথাগুলি নিরেট সত্য। সমস্যাটা আমরা কিছুটা বুঝি। সুতরাং সাধ্যমত মুসলমান যুবকদিগকে আমরা সংযত রাখার চেষ্টা করব। কোন কোন ক্ষেত্রে সুফল হবেও। কিন্তু প্রতিদিন বিকেল বেলা শহরের শিক্ষিতা যুবতীরা যে বেশভূষা পরিধান ক'রে রাস্তায় বের হন, তা দেখে দেখে

যুবকদের চপল মন উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে যায়। তার কি উপায় করি বলুন!

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—চালচলনে ও বেশভূষায় সংযম-রক্ষা ক'রে চলা প্রত্যেক মেয়ের কর্ত্তব্য। নিজের অসতর্ক আচরণের দ্বারাও অপরের মনে লালসা উদ্রেক করা অপরাধ। এ কথাটা পাশ্চাত্যেরাও বোঝে, কোন কোন দেশে যুবতীদের মাত্রাহীন বিলাসিতা দমনের আন্দোলন শুরুও হয়েছে।

ব্রাহ্ম-সমাজের দান

একজন বলিলেন,—এই ব্রাহ্ম-সমাজই যত নষ্টের গোড়া।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এ ধারণা ভুল। ব্রাহ্ম-সমাজ সামাজিক সমস্যা-সমূহকে নূতন ক'রে চিন্তা করার সাহস আমাদের দিয়েছেন। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবার প্রেরণা জুগিয়েছেন। তাঁদের ঋণ অপরিশোধ্য। তবে তাঁরা ব্রহ্মচর্য্যের উপর অতিরিক্ত একটা জোর দেন নাই ব'লে, অনেক করণীয় কাজ কত্তে পারেন নাই। যেটুকু তাঁরা করেছেন, সেটুকুর ওজন একটা হিমালয়ের সমান।

স্বামী বিবেকানন্দ

একজন বলিলেন,—স্বামী বিবেকানন্দকে হিন্দু-জাতীয়তাবাদী বলা যায়।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এটাও বিভ্রান্ত মতবাদ। স্বামী বিবেকানন্দের মতন এমন নিখাদ নিষ্কলঙ্ক জলন্ত স্বদেশপ্রেম

ভারতবর্ষে অতীতে কারও ছিল না এবং এখনও কারও নাই। তিনি হিন্দুর উন্নতি চান নি। তিনি ভারতবাসীর উন্নতি চেয়েছেন। তিনি গেরুয়া প'রে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন ব'লেই তাঁর প্রতি নাসিকা কুঞ্চন একটা চূড়ান্ত অবিচার। তিনি হিন্দু-গুরুকে মান্য করেছিলেন ব'লেই সাম্প্রদায়িক, একথা বলতে যাওয়া ঘোরতর মিথ্যাচার। যাঁদের স্বদেশপ্রেমে ঘাটতি আছে, তাঁরা ঈর্ষ্যা-প্রণোদিত হ'য়ে স্বামী বিবেকানন্দকে হেয় করার উদ্দেশ্যে এ সকল মিথ্যা অপবাদ প্রচার করেন ব'লে আমার ধারণা। বিবেকানন্দ বোমা বানান নি, রিভলবার ধরেন নি, কিন্তু গেরুয়া পরেছেন, এই জন্যই কি তিনি অপাংক্তেয় হবেন? ভুল, মহাভুল। আমরা হীরা-মাণিক চিনি না। তাই কাচের সমাদর বাড়াবার জন্য হীরা-মাণিকের কদর কমাই।

৬ই আশ্বিন খুলনার চতুর্থ বক্তৃতা দিয়া কিছু চিঠিপত্র লিখিয়া সারা রাত্রি কাটাইয়া ৭ই আশ্বিন বুধবার প্রাতে শ্রীশ্রীবাবামণি ষ্টীমার ধরিলেন। বেলা আটটা চল্লিশে কালিয়া পৌঁছিলেন। সেখান হইতে নৌকাযোগে আসিলেন বেন্দা। সারাদিন জিজ্ঞাসু লোকদের প্রশ্নের জবাব দিয়া রাত্রিতে ফিরিয়া আসিলেন খুলনা। অদ্য খুলনার বক্তৃতা হইল না।

৯ই আশ্বিন, শুক্রবার, ১৩৪৩
(২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬)

বেলা বারোটা পনের মিনিটে খুলনা ত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি দৌলতপুর কলেজে আসিয়াছেন। বিকাল তিনটা আটাইশে তাঁহাকে খুলনা ফিরিতে হইবে। কারণ, অদ্যই

খুলনার ৬ষ্ঠ বক্তৃতা। দৌলতপুরে ছাত্র ও অধ্যাপকবৃন্দ খুব মনোজ্ঞ ভাবে অভ্যর্থনা প্রদান করিলেন।

পরিচয়

কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বঙ্কু বিহারী ভট্টাচার্য্য পরিচয় প্রদান-প্রসঙ্গে বলিলেন,—তরুণ ছাত্র-বন্ধুগণ, এখন আমার বয়স নেহাৎ মন্দ হয় নি, তবু একদিন আমি তরুণ ছিলাম এবং কলেজে পড়্‌তাম। সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখিত 'আপনার জন' স্বাক্ষরিত কতকগুলি পত্র মাসের পর মাস আমি পেয়েছি, একটা অজ্ঞাত স্থান থেকে, যাতে প্রেরণা দেওয়া হ'ত আত্মগঠনের। ইঙ্গিত দেওয়া হ'ত জীবনের লক্ষ্য নির্ণয়ের। তখন কিন্তু কল্পনাও করি নি যে, এই আপনার জনকে চর্ম্মচক্ষে কখনও দেখতে পাব। আজ আর অদৃশ্য ভাবে নয়, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য রূপে সশরীরে তিনি আজ তোমাদের সমক্ষে দণ্ডায়মান। বন্ধুগণ, তাঁকে প্রণাম করো।

শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী ভট্টাচার্য মহাশয় বলিতে লাগিলেন, তাঁর রচিত গ্রন্থাবলি সঙ্গেই আছে। পড়লেই বুঝতে পারবে, জীবন-গঠনের কি সুন্দর সুযোগ তোমরা আজ পেলে। তাঁর দীর্ঘায়িত দেহযষ্টি, উজ্জ্বল চাহনি, অনাড়ম্বর বেশবিন্যাস এবং প্রভাব-ব্যঞ্জক মূর্ত্তি তোমাদের মনে নিশ্চয়ই আশা সঞ্চার করেছে। প্রত্যেকটা কথা কাণ পেতে শুনো এবং জীবন দিয়ে গ্রহণ করো।

ছাত্ররা সত্যই মন দিয়া শুনিল

অপরাহ্ণ ছয়টায় খুলনা ফিরিয়া খুলনার ষষ্ঠ বক্তৃতা দেওয়া হইল।

খুলনা

১১ই আশ্বিন, রবিবার, ১৩৪৩

(২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬)

খুলনার অষ্টম বক্তৃতাটি অপরাহ্ণে দান করিয়া রাত্রি আটটা পনের মিনিটে শ্রীশ্রীবাবামণি ষ্টীমার যোগে খুলনা ত্যাগ করিলেন এবং ভোর চারটা তিরিশ মিনিটে ঝালকাঠি আসিলেন। ঝালকাঠিতে দুই দিন থাকিয়া ঝালকাঠি ও চাঁদকাটি মোট তিনটী বক্তৃতা দিলেন।

শত কণ্ঠে বলা চাই

তিনটী স্থানেই চরিত্র-গঠন সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি পরিশেষে বলিলেন,—আমি যা একটা মাত্র কণ্ঠে এবং স্বল্প সম্বলে দেশ পর্য্যটন ক'রে একাকী ব'লে যাচ্ছি, সে কথাই শত শত কণ্ঠে উত্থিত হওয়া প্রয়োজন। তোমরা যুবকের দল এই বিষয়ে অগ্রণী হ'লে কত ভাল হয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই যে, যে নিজে চরিত্রবান্ নয়, তার কথা ত' কেউ শুনবে না।

ইহার পরবর্ত্তী অংশ "সংযম-প্রচারে স্বরূপানন্দ" গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ১৬৫ পৃষ্ঠা হইতে ১৬৭ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পুনর্মুদ্রণ করিয়া নিম্নে দেওয়া হইল।

বরিশাল

১৪ই আশ্বিন, বুধবার, ১৩৪৩

(৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬)

১৪ই তারিখ অপরাহ্ণ চারিটায় শ্রীশ্রীবাবামণি বরিশাল পৌছিলেন। স্থানীয় জজকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত রোহিণী লাল রায় এবং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ বসু প্রমুখ সজ্জনগণ স্বামীজীকে স্টেশনে সম্বর্দ্ধনা করিয়া নিয়া আসেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু হাসিতে হাসিতে বলেন,—"Barisal receives you back with joy" (বরিশাল আপনাকে পুনরায় আনন্দের সহিত সম্বর্দ্ধনা করিয়া গ্রহন করিতেছে।) সন্ধ্যা ৬টায় হরিজন বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের আহূত সভায় শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব অশ্বিনী-কুমার-দত্ত টাউন হলে "অস্পৃশ্য-উদ্ধার" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করিলেন।

স্বামীজীর বক্তৃতার পূর্ব্বেই কলসকাটির জমিদার শ্রীযুক্ত দক্ষিণা রঞ্জন রায় চৌধুরী স্বকীয় সমগ্র সম্পত্তি স্বামীজীর বরাবরে ভারত-মঙ্গল কার্য্যে ব্যয়িত হইবার জন্য দান করিয়া সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে এক প্রস্তাব করেন এবং সমবেত জনতা বিপুল হর্ষধ্বনি সহকারে এই প্রস্তাবকে অভিনন্দিত করেন। স্বামীজী বলেন,—"এইরূপ প্রস্তাব আমার পক্ষে সম্পূর্ণই অপ্রত্যাশিত।" কিন্তু তিনি এই বিপুল সম্পত্তি গ্রহণ সম্পর্কে কোনও সম্মতি

জ্ঞাপন করেন না। স্বামীজী অস্পৃশ্যতা বিদূরণের জন্য সংযম ও সচ্চরিত্রতার ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া আপ্রাণ চেষ্টা করিতে উপদেশ দিয়া আড়াই ঘন্টাকাল বক্তৃতা প্রদান করেন।

শ্রীমৎ স্বামীজীর বক্তৃতান্তে স্থানীয় উকিল শ্রীযুক্ত শশিভূষণ গুপ্ত মহাশয় বক্তাকে ধন্যবাদ দিতে উঠিয়া বলিলেন,—

"সমবেত মহিলাবর্গ এবং ভদ্রমহোদয়গণ, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র গুপ্তের আদেশে আমি একটী পবিত্র কার্য্য সম্পাদনের জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছি। কার্য্যটী শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসজীকে ধন্যবাদ প্রদান করা। কিন্তু আমি বক্তা নহি। এজন্য স্বভাবতই আমার মনে একটা কুণ্ঠা জাগরিত হইয়াছে। তাই আমি স্বামীজীকে ধন্যবাদ দিবার চেষ্টা না করিয়া আপনাদের নিকটে একটী অপূর্ব্ব দৃশ্যকে বর্ণনা করিব, যে দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, ২০।২৫ দিন পূর্ব্বে স্বামীজীর বরিশাল হইতে চলিয়া যাইবার প্রাক্কালে ধর্ম্মরক্ষিণী সভার গৃহে বিদায়াভিনন্দন-দিবসে। ধর্ম্মরক্ষিণী সভা, যাহার উদ্দেশ্য প্রাণপণে বর্ণাশ্রমকে রক্ষা করা, সেই সভার আহ্বানে স্বামীজী মাদারীপুর হইতে বরিশাল শুভাগমন করিয়াছিলেন এবং ধর্ম্মরক্ষিণী সভারই উদ্যোগে তিনি উক্ত সভাতে ও এই টাউন-হলে হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে ধারাবাহিক আট দিন বক্তৃতা দিয়াছিলেন। বরিশাল শহরে তাঁহার মোট বক্তৃতার সংখ্যা পঞ্চদশের অধিক ছিল এবং প্রত্যেক স্থানে তিনি প্রায় আড়াই ঘন্টাকাল ভাষণ দিয়াছিলেন। কিন্তু ধর্ম্মরক্ষিণী সভারই উদ্যোগে আহূত সেই

বিদায়-সম্বর্দ্ধনা-সভাতে যখন দেখিলাম, পৌরোহিত্য করিতেছেন শ্রীযুক্ত সুরেশ গুপ্ত, যিনি হরিজন আন্দোলনের জন্য জীবন বিসর্জ্জনের সঙ্কল্প করিয়াছেন, যিনি মেথরদের সহিত এক পল্লীতে বাস করিয়া তাদের সেবা করেন, যিনি মেথরের স্পৃষ্ট অন্ন ও পানীয় সানন্দে গ্রহণ করেন, তখন বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইলাম। জলে আর তেলে কি মিশ খায়?

"তারপর দাঁড়াইলেন স্থানীয় ব্রাহ্ম-সমাজের প্রবীণ আচার্য্য শ্রীমৎ মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, যিনি পঞ্চাশ বৎসরের উর্দ্ধকাল সেইরূপ ধার্ম্মিক ও সামাজিক মতবাদ প্রচার করিয়াছেন, যাহা সম্পূর্ণরূপে সনাতনপন্থী ধর্ম্মরক্ষিণী সভার চিরপোষিত ধারণার প্রতিকূল এবং যিনি জাতিভেদ মানেন না, ইত্যাদি। তখন বিস্ময়ের অবধি রহিল না। মনোমোহন বাবু নিপুণ বাগ্মী, শত শত বক্তৃতামঞ্চের লোকসমাদৃত বক্তা। তিনি অপূর্ব্ব বাগ্মিতা সহকারে স্বামীজীর গুণ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। দেখিলাম, স্থলবিশেষে জলে তেলে ত' মিশ খায়ই, জলে আর পাথরেও মিশ খায়।

"তারপর দাঁড়াইলেন রায় বাহাদুর গণেশ চন্দ্র দাসগুপ্ত, যিনি হিন্দু-সমাজের বুকের উপরে দাঁড়াইয়া হিন্দু-সমাজকে তীব্র শ্লেষ ও কষাঘাত করিতে অকুণ্ঠিত, যিনি নিজের পরিবার-মধ্যে পর্য্যন্ত বিধবার বিবাহ প্রচলন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তিনি। তখন বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলাম। আমাকে মানিতে হইল যে জলে, তেলে, পাথরে আর বাষ্পে স্থল-বিশেষে মিশ খায়।

"স্বামীজীর বক্তৃতা এইরূপ বিভিন্ন-ভাবাশ্রয়ী চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মনে কিরূপ সুগভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, ভাবিয়া পুলকিত হইলাম। বাস্তবিকই বরিশালে আসিয়া ইতঃপূর্ব্বে আর কেহ সকল প্রকার বিরুদ্ধভাবাপন্ন চিন্তাশীল ব্যক্তিগণকে যুগপৎ জয় করিতে পারেন নাই। প্রকৃত মহাপুরুষেরা সকল ভেদবিসম্বাদের অতীত,—স্বামীজীর আগমনে বরিশাল যথার্থ মহাপুরুষের পাদস্পর্শ করিল।

"বন্ধুগণ এবং জননীগণ, আজ স্বামীজীকে ধন্যবাদ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া আমি আপনাদের নিকট সেই বিদায়াভিনন্দনের দিনের অপূর্ব্ব দৃশ্য বর্ণনা করিয়াই যথেষ্ট হইল বলিয়া ক্ষান্ত হইতেছি। স্বামীজী আমাদের আপন হইয়াছেন এবং আশা করি চিরকালই তিনি বরিশাল পুনঃ পুনঃ আগমন করিবেন।

"স্বামীজীই বলিয়াছেন, হিন্দুর সমাজ যুগে যুগে যুগোপযোগী সংস্কার সাধন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছে,—আজ যেন আমরা অস্পৃশ্যতার অভিশাপ হইতে জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য সচেষ্ট হই।"

সেই রাত্রেই শ্রীশ্রীস্বামীজী চাঁদপুর রওনা হইলেন।

চাঁদপুর

১৫ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩৪৩

(১লা অক্টোবর, ১৯৩৬)

গতকাল রাত্রিতে শ্রীশ্রীবাবামণি দুইটার সময়ে ষ্টীমার

যোগে বরিশাল ছাড়িয়াছেন। অদ্য প্রায় সারাদিনই অপূরন্ত অবসর। ষ্টীমারে যথেষ্ট ভিড় ছিল কিন্তু অধিকাংশ যাত্রীদের অনেকেই শ্রীশ্রীবাবামণির বরিশাল ও খুলনার বক্তৃতাবলি শুনিয়াছেন। তাই কাজের লোকের কাজের সময়ে কেহ বিঘ্ন করিলেন না।

প্রাতঃস্নানাদি সারিয়াই শ্রীশ্রীবাবামণি লেখনী নিয়া বসিলেন।

স্বামী ও স্ত্রীর দীক্ষা-সাম্য

চট্টগ্রাম কধুরখিল-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"দীক্ষা যখন নিয়াছ এবং বিবাহ যখন করিতেই যাইতেছ, তখন তোমার পক্ষে এই আকাঙ্ক্ষাই ত' স্বাভাবিক যে, তোমার সদ্যঃ-পরিণীতব্যা পত্নীও তোমার সমধর্ম্মে সমসাধনে দীক্ষিতা হউক। কিন্তু যদি বাসর-ঘরে ঢুকিয়া শুনিতে পাও যে, সে কুমারী অবস্থায়ই অন্যত্র দীক্ষা নিয়া ফেলিয়াছে এবং তাহার উপাসনা-তত্ত্ব ও ভজন-প্রণালীর সহিত তোমার উপাসনা-তত্ত্ব ও ভজন-প্রণালীর প্রত্যক্ষ মিল কিছু দেখা যাইতেছে না, তথাপি উদ্বিগ্ন হইও না। তাহার গৃহীত সাধন-পন্থা যদি সদাচার-বিগর্হিত ও সদ্ধর্ম্মবিরুদ্ধ না হইয়া থাকে, তবে যতটা সম্ভব, তাহার এই পার্থক্যকে উদাসীন দৃষ্টিতে দেখিয়া যাইবার চেষ্টা করা উচিত। আগেকার মত শিশু-বিবাহ বা বাল্য-বিবাহ এই যুগে আর নাই এবং তাহার পুনঃপ্রবর্ত্তন সম্ভবও

নহে। সুতরাং স্ত্রীলোকের ধর্ম্মজীবন বিবাহের পরে স্বামীর গৃহে গিয়া আরম্ভ হইবে, এই সিদ্ধান্ত খুব বুদ্ধিমানের সিদ্ধান্ত নহে। অন্ততঃ আমি ত' একথা গৌরব করিয়া ঘোষণা করিতে পারি যে, কুমারী অবস্থায় আমার প্রদত্ত সাধন পাইয়া সহস্র সহস্র কুমারী-কন্যা কামাতুরতা-রূপ প্রচ্ছন্ন শত্রুর সহিত সংগ্রাম করিয়া বিজয়িনী হইবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছে। এইরূপ যদি অন্য কাহারও প্রদত্ত দীক্ষায় কোনও কন্যা কুমারী-অবস্থায় সংগ্রামের হাতিয়ার হাতে পাইয়া থাকে, তবে তাহাকে গর্হণ না করিয়া অভিনন্দিত করা উচিত। এই সকল ক্ষেত্রে স্বামীর ধৈর্য্য ও ক্ষমাশীলতা দাম্পত্য-জীবনকে সুখময় করিবার সাহায্য করে।"

সেবা, দয়া ও ভালবাসা

হাওড়া জেলান্তর্গত মুন্সীরহাট-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তুমি যে জীবসেবা করিবে বলিয়া মনে মনে অভিলাষ পোষণ করিতেছ, তাহা সত্যই সৌভাগ্যসূচক। আমরা জীবসেবা করিয়া একদিকে নিজেদেরই কল্যাণ বর্দ্ধিত করি, অন্যদিকে পরমেশ্বরকেই পূজা করি। কিন্তু সেবা করিতে হইলে সেবা করিবার অধিকার আগে অর্জ্জন করিতে হয়। সেই অধিকার দয়া হইতে আসে না, আসে ভালবাসা হইতে। দুঃখার্ত্ত জীবকে ভালবাসিয়াছ কি? ভাল যদি বাসিয়া থাক, তবেই তোমার সেবা সার্থক ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। এস, আমরা সকলে

প্রাণপণে সর্ব্বজীবের প্রতি ভালবাসা অর্জ্জন করি। আমাদের ভালবাসা বিশ্ববিঘ্নকে পরাহত করিয়া প্রকৃত আত্মদানের প্রশস্ত পন্থা উন্মুক্ত করিয়া দিবে।"

ভিন্নধর্ম্মী স্বামী ও পত্নীর মধ্যে একত্ব-স্থাপন

২৪-পরগণার অন্তর্গত কাকদ্বীপ-নিবাসী জনৈক পত্রপ্রেরকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমরা স্বামী ও স্ত্রীতে দুই জনে দুই স্থানের দুই ভিন্ন মতাবলম্বী গুরুর কাছে দীক্ষা-মন্ত্র গ্রহণ করিয়া প্রতি জনেই ভাবিতেছ যে, অপর জন তাহার নিজ সাধন পরিত্যাগ করিয়া তোমার সাধনটাই তোমার গুরুর কাছ হইতে গ্রহণ করিয়া স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে ঐক্য ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করুক। ইহা খুব অস্বাভাবিক ব্যাপার নহে। সকলেই মনে করে যে, সে যখন সব চেয়ে ভাল জিনিষটী পাইয়াছে, তখন অপরে তাহার নিকৃষ্ট পথ পরিত্যাগ করিয়া এক পথে আসিলে আনন্দ জমিবে প্রচুর। কিন্তু প্রকৃত গুরুভক্ত শিষ্যের পক্ষে কোনও অবস্থাতেই নিজ গুরু-প্রদত্ত সাধন পরিত্যাগ বাঞ্ছিত নহে। এইরূপ পরিত্যাগ অনেকের ভিতরে দারুণ মনস্তাপ ও হীনমন্যতার সৃজন করে। সুতরাং কি করিলে উভয়ের মনোভাবের প্রতি যোগ্য সম্মান রক্ষা করিয়া উভয়ে উভয়ের জীবনের পূর্ণতা সাধনে সহায়তা করিতে পার, তাহার উপায়

অনুসন্ধান করা উভয়ের পক্ষেই কর্ত্তব্য। আমার মতে, উভয়ে যদি ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ হইয়া ইন্দ্রিয়-ব্যবহার হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া নিজ নিজ ইষ্টনামে মন অভিনিবিষ্ট করে, তবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইহার প্রতীকারোপায় বা সমাধান অতি অবশ্যই মিলিয়া যাইবে। ইন্দ্রিয়ের তাড়না মানুষকে পশু করে। স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে যদি কিছুকাল পশুভাব হইতে নিজেদিগকে বাঁচাইয়া চলিবার চেষ্টায় ব্রতী থাকে, তাহা হইলে একমাত্র ইহারই ফলে ভিতরে ভিতরে এমন মানসিক পরিবর্ত্তন উভয়ের মধ্যে আসিয়া যাইতে পারে, যাহার ফলে ভিন্ন সাধন-ধর্ম্মী হওয়া সত্ত্বেও একে অন্যকে অতীব প্রিয় ও একান্ত-প্রাণারাম বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারে। স্বামী যে স্ত্রীকে জিদ্ করিয়া নিজের মতে আনিতে চাহে, তাহা ত' দুজনের মধ্যে প্রকৃত ভালবাসা মোটেই নাই বলিয়া। স্ত্রী যে স্বামীকে নিজের জিদের যূপকাষ্ঠে বলি দিতে চায়, তাহা ত' সে স্বামীকে বালবাসিতে শিখে নাই বলিয়াই। প্রকৃত ভালবাসা আসিলে জিদ্ পলাইয়া যায় বা মরিয়া যায়। তাহা ব্রহ্মচর্য্য পালনের ফলেই সম্ভব। হতাশ একজনেও হইও না। কিছুকাল সংযম পালন করিয়া দেখ, দেখিবে আস্তে আস্তে ব্যবধানের বিরাট পাহাড় চক্ষুর অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যেখানে নিত্য কলহ, যেখানে গালাগালি আর চুলাচুলি মাথার খুলিকে উত্তপ্ত ও আক্রান্ত করিতেছে, সেখানেও সযত্নে কৌপীন-বন্ধন এক অত্যাশ্চর্য্য মহৌষধ। আমার পূর্ব্ববর্ত্তীরা এসব কথা তাঁহাদের গৃহস্থ শিষ্যদের কখনো বলিয়াছেন বলিয়া জানি না। আমি

কিন্তু এসব কথা প্রকাশ্যে বলিয়া দেওয়া আবশ্যক বলিয়া বুঝিয়াছি। হাজার দম্পতীর নিগূঢ় জীবনের ইতিহাস আমি শুনিয়াছি। আমি বিশ্বাস করি যে, ব্রহ্মচর্য্য সর্ব্বপ্রকার দাম্পত্য অশান্তির শ্রেষ্ঠতম মহৌষধ।"

সমবেত উপাসনায় আচার্য্যের আসন

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত দাউদকান্দি-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমাদের জেলার অনেক পল্লীতেই আমাদের অনুশীলিত সমবেত উপাসনার আসরে তুমি একজন ভক্ত-রূপে যোগদান করিতে পারিয়াছ জানিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। এই সমবেত উপাসনায় যে যোগদান করে, তাহার সহিত আমি নিজেও সমসাধক-রূপে স্তোত্রাদি উচ্চারণ ও উচ্চতত্ত্বাদির নিদিধ্যাসন-কর্ম্মে নিয়োজিত থাকিবার অভিলাষ রাখি বলিয়া, যখন শারীরিক ভাবে আমার যোগদান সম্ভব হয় না, তখন আমার জন্য একটা আসন রাখিতে নির্দ্দেশ দেওয়া আছে। আমার সেই আসনটী কেন সকলের উপবেশনের সারির অগ্রভাগে থাকে, ইহা নিয়া তোমার মনে কেহ সংশয় জাগাইয়া দিয়াছে। সংশয়ের কোনও প্রয়োজন নাই। কারণ, আমার আসনটী একেবারে পিছনে দিয়া রাখিলেও আমি সমান খুশী। কার্য্যতঃ

আমি যখন শারীরিক ভাবে উপস্থিত থাকি, তখন অনেক ক্ষেত্রে আমার বসিবার আসনটী সকল উপাসক ও উপাসিকার বসিবার স্থানের পিছনেও থাকে। ইহাতে দোষ ধরি না। কারণ, সমবেত-উপাসনা-কালে আমার অগ্র বা পশ্চাৎ বুদ্ধি থাকে না, থাকে সমগ্র আসরের প্রতিটি প্রাণের সহিত অভেদ মিলনের বুদ্ধি। সবার কণ্ঠ একটী কণ্ঠ হয়, সবার মন একটী মন হয়, সবার দেহ একটী দেহ হয়, জাতিভেদ-জ্ঞান থাকে না, লিঙ্গ ভেদ-জ্ঞান থাকে না, ধর্ম্ম-ভেদ-জ্ঞান থাকে না, ক্রমশঃ জীব ও ব্রহ্মে যে ভেদ প্রতীয়মান, তাহার জ্ঞানও থাকে না। তখন হস্ত ও পদেরা সমান কুলীন, শিরোদেশ ও অধোদেশস্থিত অঙ্গেরা সমান সম্ভ্রান্ত। সুতরাং এই প্রশ্নটা উঠেই না যে, অন্যান্য গুরুদেবরা শারীরিক ভাবে উপস্থিত না থাকিয়াও নিজ নিজ শিষ্যদের দ্বারা তাঁহাদের জন্য একটী করিয়া এইরূপ আসন সংরক্ষণ করিতে কেন অধিকারী হইবেন না। ইহা কুতর্ক। কুতর্কে কান দিও না। যেই সামূহিক উপাসনার ঢংটী আমার মত তুচ্ছ লোককে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবান্ চালু করিয়াছেন, তাহাতে আমার জন্য একটী আসন থাকা আমার আত্মহঙ্কারের পরিচায়ক বলিয়া মন্তব্য করাও এক প্রকারের গায়ে পড়িয়া ঝগড়া করার মতন শোনায়। তোমরা এই সকল শূন্যগর্ভ বাক্য শ্রবণে কাতর, উত্তেজিত বা বিদ্বিষ্ট হইও না। আমাদের এই উপাসনায় আমরা সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিকে নিজ নিজ শ্রদ্ধানুযায়ী যোগদান করিবার পবিত্র অধিকার দিয়াছি

বলিয়াই তাঁহারা নানা গুরুর জন্য আলাদা আলাদা আসন সংরক্ষণ দাবী করিবেন, ইহা হাস্যকর। সর্ব্বক্ষেত্রে আমার জন্য একটী আসন চিরকাল সংরক্ষিত থাকিবে,—ইহা আবদার নহে, ইহা অধিকার। মহম্মদের প্রবর্ত্তিত উপাসনায় বসিয়া মহম্মদের নামের দোহাই না দিয়া কেহ কি ইরম্মদের নামোল্লেখ করে? আমাদের সমবেত উপাসনা যদি স্থায়ী হয়, তবে আমার জন্য সমসাধক-রূপে তোমাদের মধ্যে একটী আসন চিরকালই থাকিবে। তোমরা নানা জনের তালে পড়িয়া নানা কথায় চঞ্চল হইয়া সমবেত উপাসনার প্রতিষ্ঠিত প্রথার মধ্যে নূতনত্ব ও বৈচিত্র্য সম্পাদনের চেষ্টা করিও না। তাহা হইলেই ইহা স্থায়ী ও ব্যাপক হইবার আনুকূল্য পাইবে।"

সমবেত উপাসনার প্রতিষ্ঠিত প্রথা

ঐ পত্রেই শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সমবেত উপাসনার আসরে লোক-জন জমাইবার জন্য ধূমসে কিছুক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া লইলে, ইহা আমাদের প্রথা নহে। উপাসনার আসরে উপাসনান্তে চা-বিস্কুট, তামাক সিগারেট প্রভৃতির আড্ডা বসিল, ইহাও আমাদের প্রথা নহে। তিনবার ধ্বনি দিয়া অখণ্ড-সংহিতা পাঠ শুরু হইয়া গেল, কছুকাল পাঠের পরে জয় জয় ব্রহ্মপরাৎপর ধরিলে, ইত্যাদি

করিয়া হরিওঁ-কীর্ত্তনের সময়ে নির্দ্দিষ্ট কয়েক রাউণ্ড গাহিয়া নিয়াই দাঁড়াইলে অঞ্জলি মন্ত্র পাঠের জন্য। অঞ্জলি হইল, শান্তিবাচন হইল, এখন নিঃশব্দে শান্ত মনে ঘরে ফির। উপাসনা-শেষে সভা-সমিতির হট্টগোল না করাতেই উপাসনার প্রকৃত উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়। সময়মত আসিবে, সময়মত পূর্ণ শান্ত-স্নিগ্ধ মন নিয়া ঘরে ফিরিবে। উৎসবাদি উপলক্ষ্যে সময়ের অল্পতাহেতু একটার পর একটা ঠাসাঠাসি অনুষ্ঠান অনেক সময়ে রাখিতে হয়। এগুলি ব্যতিক্রম মাত্র। উপাসনা শেষ করিয়া স্থানের অভাবে সেই আসরেই সভা আরম্ভ করিতে যদি বাধ্যও হও, তবে কষ্ট করিয়া অঙ্গন পরিমার্জ্জন করিয়া মানুষের বসিবার স্থান ও দিক সঙ্গত-মত পরিবর্ত্তন করিয়া নিয়া একাজ করিবে। এই সকল বিষয়ে নানা পরিস্থিতিতে আমাকে নানা পরামর্শ দিতে হইয়াছে। সেগুলিকে স্বতোবিরোধ বলিয়া বর্ণনা না করিয়া পরিস্থিতি অনুযায়ী আপদ্ধর্ম্ম বলিতে পার। আপদ্ধর্ম্ম ও নিয়ম এক কথা নহে। আপদ্ধর্ম্ম, ঠেকিলে বাঘের ধান খাওয়ার মতন, আকস্মিক ব্যাপার, যাহা হঠাৎ অনুমোদিতব্য, সর্ব্বদার ব্যাপার নহে। আপদ্ধর্ম্ম দৈবাৎ পালনীয় বা হঠাৎ রক্ষণীয়, নিত্যকার কাজ উহা নহে। এই সরল কথাটা মনে রাখিলে অন্তরের অনেক গ্লানি হইতে মুক্তি পাইতে পার। আমাদের প্রয়াসকে অযুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রমান করিবার যে হাস্যকর চেষ্টা মাঝে মাঝে দেখা যায়, তাহা অসম্যগ্-দর্শনেরই ফল।

আমাদের সমবেত উপাসনার ঐতিহ্য

ঢাকা জেলান্তর্গত জিনারদি-নিবাসী জনৈক পত্রপ্রেরকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আগে হইতে কোনও শুভ কল্পনা বা অশুভ অভিসন্ধি আটিয়া আমি সমবেত উপাসনার প্রথাটি সৃষ্টি করি নাই। অকপট সরল চিত্তে মানুষের সঙ্গ করিতে করিতে এবং তাহাদের মধ্যে কাজ করিতে করিতে আপনা আপনি কতকগুলি স্তোত্র, মন্ত্র ও প্রকরণ আস্তে আস্তে রূপ ধরিল, যেমন করিয়া বহু বর্ষ ধরিয়া এক এক কণা বালুকা জমিতে জমিতে আস্তে আস্তে বিন্দুবৎ একটী দ্বীপ সমুদ্রের তরঙ্গতাড়ন তুচ্ছ করিয়া নিজের নগণ্য অস্তিত্বটুকু বায়ুমণ্ডলের মধ্যে জাহির করে। উপমাটী আমি নির্ভুলই দিলাম। ইহাকে উপমা কালিদাসস্য বলিয়া ঠাট্টা করিলেও দোষ হইবে না। এই ভাবে নিজের প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা পরোক্ষ অভিপ্রায়ের দিকে না তাকাইয়া কাজের ঝোঁকে কাজ করিতে করিতে কাজের মুখে আপনা আপনি সমবেত উপাসনার একটী ঐতিহ্য সৃষ্টি হইয়া গেল। তাহাতে ব্রহ্ম-বন্দনা আছে, গুরুস্তোত্র আছে, ব্রহ্মগায়ত্রী আছে, জগন্মঙ্গল-সঙ্কল্প আছে, নামজপ আছে, নিষ্কাম জপ-সমর্পণ আছে, হরিওঁ-কীর্ত্তন আছে, আছে সর্ব্বশেষে অঞ্জলিরও মন্ত্র। বিনা বিবাদে ও বিনা প্রতিবাদে আপনা আপনি ঈশ্বরেচ্ছায় যাহার বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা, তাহাকে কি এখন আর

কোনও উপায়ে ব্যাহত বা পরাহত করিতে পারিবে? সুতরাং এই দুশ্চেষ্টা হইতে প্রতিনিবৃত্তি হও।

আমাদের সমবেত উপাসনার আসন-বৈশিষ্ট্য

রংপুর জেলান্তর্গত গোপ্‌লা-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তুমি ময়মনসিংহে ও রংপুরে আমার বক্তৃতা শুনিয়াছ এবং একান্ত আগ্রহী হইয়া একবার ময়মনসিংহের ছোট্ট একটী সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া আমার অতি কাছে বসিয়া উপাসনা করিয়া গিয়াছ জানিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলাম। এই উপাসনার প্রবর্ত্তনের সময়ে আমার মনে কোনও নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য বা অভিসন্ধি ছিল না। নিছক কাজের মুখে পড়িয়া ইহা ঐরূপ ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাই, ইহাকে আমি ঈশ্বরাভিপ্রায় বলিয়া গণনা করিয়াছি। এখন আমি সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিতেছি যে, মানুষে মানুষে নিকটত্ব বাড়াইবার জন্য, জাতিতে জাতিতে বৈর কমাইবার জন্য, ধর্ম্মে ধর্ম্মে কলহ অপসারিত করিবার জন্য ইহা একটী সদুপায়, যাহাতে বাহ্যতঃ আমরা সংস্কৃত শ্লোক দিয়া বন্দনা গাহিলেও আরবি, ফারসী, হিব্রু, ল্যাটিন, বাংলা, ইংরাজি, তেলেগু, তামিল, উর্দ্দু, মালয়ালাম বা চৈনিক ও জাপানী ভাষায় নীরবে নিজ নিজ ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে পারি। ঐ

নীরবতার সময়ে আমরা জগতের মঙ্গল-সঙ্কল্প করি বলিয়াই আরবী মন্ত্র-জপকারীর পাশে বসিয়া হিব্রু মন্ত্রজপকারী বিরক্তি বোধ করিবে না, সংস্কৃত মন্ত্রজপকারীর পাশে বসিয়া তামিল মন্ত্র-জপকারীর বিরক্তি উৎপাদিত হইবার কোনও কারণ ঘটিবে না। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিরা জপমন্ত্র নিজ নিজ রুচিমতন নির্দ্ধারণ করিয়া জনারণ্যের মধ্যে বসিয়া এবং অপর প্রতিটি ব্যষ্টি হইতে নিজের পৃথকত্ব সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়াও যুগপৎ সকলের সহিত একই ঈশ্বরের সন্তান বোধে একত্বও প্রতিষ্ঠা করিয়া লইতে পারিবেন। প্রত্যেকটী বিভিন্ন ব্যক্তির ও সম্প্রদায়ের পরমেশ্বর প্রকৃত প্রস্তাবে যে মাত্র একই জন, দুই জন, তিন জন, পাঁচ জন নহেন, এই সত্যটুকুতে প্রতিষ্ঠিত হইতে উপস্থিত ভক্ত-সজ্জনদের বেশী দেরী লাগে না,—এইটাই আমাদের সমবেত উপাসনার আশ্চর্য্য একটী বিশেষত্ব। আরম্ভে ও শেষে কয়েকটা সংস্কৃত শব্দ আসিয়া গিয়াছে বলিয়া রাগ করিবার কিছু নাই। তুমি সঙ্গে সঙ্গে গাহিতে না পার, অন্ততঃ পক্ষে সেই গান শুনিতেও ত' পার। ব্রহ্ম-বন্দনায়, গুরুস্তোত্রে, ব্রহ্মগায়ত্রীতে, হরিওঁ-কীর্ত্তনে বা অঞ্জলির মন্ত্রগুলিতে কোথাও এমন একটী শব্দও নাই, যাহার দ্বারা পৃথিবীর কোনও ধর্ম্ম-সম্প্রদায় আহত হইতে পারেন। তবে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোককে খুশী করিবার জন্য ইহার সহিত কিছু কিছু নব-সংযোজনের ইচ্ছা অনেকের জাগিতে পারে। তাহা সঙ্গত বা অসঙ্গত, তাহার বিচার করিতে না বসিয়া সরল মনে এই কথাটুকু বলিয়া দেওয়াই ভাল যে, নিত্য নূতন প্রথা-প্রবর্ত্তন

ও অঙ্গোপাঙ্গ-পরিবর্দ্ধনের খেয়াল আসিলে দুদিন না যাইতেই জিনিষটীর আসল রূপ ও লক্ষ্য নষ্ট হইয়া যাইবে,—তাহা হইবে বিপর্য্যয়কর।"

সমবেত উপাসনাকে বিকৃত করিও না

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত খোল্লা-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সমবেত উপাসনাকে তোমরা যে-ভাবে আমার কাছ হইতে পাইয়াছ, তাহাকে কেহ বিকৃত করিও না। নূতন নূতন লোকের নূতন নূতন রুচিকে বিনোদন করিতে গিয়া সমবেত উপাসনার জাত মারিয়া দিও না। অতীব কলঙ্কহীন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরতায় সমবেত উপাসনা আবির্ভূত হইয়াছে। আমি ইহার প্রবর্ত্তক নহি। প্রাচীন কালে ইহা ছিল। নিত্য নূতন প্রথা-পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া ইহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। আমি জীবের প্রয়োজন বুঝিয়া যুগের দাবী অনুযায়ী ইহাকে পাইবা মাত্র তোমাদের হাতে তুলিয়া দিয়াছি। তোমরা এই সদ্যোজাত সুন্দর শিশুকে জিদাজিদির হাতে নিষ্পেষণ করিয়া গলা টিপিয়া হত্যা করিও না। নির্দ্দিষ্ট সময়ে লোকেরা আসিল না বলিয়া লোকাকর্ষণের জন্য ধুমালি পিটাইলে এবং কীর্ত্তন চালাইলে, ইহা সমবেত উপাসনার নিয়ম নহে। একজন বা দুই জন মাত্র আসিয়াছে, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময়টীও আসিয়া গিয়াছে।

সুতরাং দ্বিধাহীন চিত্তে আরম্ভটী করিয়া দাও। দুজন যদি জুটিয়াছ, তবে একটী আসন আমার জন্য দাও। এই তিনজনেই কাজ শুরু হউক। ধ্বনি দিয়া পাঠ আরম্ভ করিলেই ত' উপাসনার কাজ শুরু হইয়া গেল। ভাবিবার কিছু নাই। যাহারা দেরীতে আসিল, তাহারা সম্পূর্ণ উপাসনাটা পাইল না বটে, কিন্তু সময়নিষ্ঠার ফলে তাহারা লাভবান্ হইল, যাহারা ঘড়ি দেখিয়া কাজ করে। ঘড়ি ত' অঙ্গ-শোভা হিসাবে অনেকেই কিনে কিন্তু উপাসনা-কালে তাহার সদ্ব্যবহারও করুক। উপাসক-উপাসিকাদিগকে এই বিষয়ে অভ্যস্ত করানর প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। দশ, বিশ বা পঁচিশ মিনিটের বেশী সময় অখণ্ড-সংহিতা পাঠেই চলিয়া যাইতে পারে। সুতরাং সামান্য দেরীতে যাহারা উপাসনায় আসিল, তাহারাও উপাসনা পাইল। রামবাবু বিদ্বান্ লোক, সুতরাং তাঁর জন্য দেরী কর; শ্যামবাবু ধনী লোক, সুতরাং তাঁর জন্যও দেরী কর; যদুবাবু রাগী লোক, সুতরাং তাঁর জন্যও অপেক্ষা কর;—এই সব করিতে গেলে তোমাদের উপাসনা সারা বৎসরের মধ্যে একটী দিনও ঠিক সময়ে আর আরম্ভ হইতে পারিবে না। অখণ্ড-সংহিতা পাঠ, স্তোত্রপাঠ, বন্দনা, ধ্যান, জপ, কীর্ত্তন ও অঞ্জলি প্রভৃতির যে-কোনও একটার অমিত-পরিমাণ ভারে সমবেত উপাসনাকে ভারগ্রস্ত না করিয়া সর্ব্বসামঞ্জস্যপূর্ণ এই প্রণালীর মধ্যে নবসংযোগ হইতে প্রত্যেকে বিরত থাকিও। আলাদা করিয়া শুধুই পাঠ, শুধুই কীর্ত্তন, শুধুই জপ, শুধুই ধ্যান

প্রভৃতি অবশ্য চলিতে পারে,—তবে তাহা পৃথক্ দিনে বা পৃথক্ সময়ে হইবে। স্বপ্নে দেখিয়াছি,—বাবামণি আসিয়া অমুক রূপে সমবেত উপাসনাকে রূপান্তরিত করিতেছেন, ধ্যানের সময়ে দৈববাণী পাইয়াছি যে, অমুক অনুষ্ঠানের ভিতরে তমুক একটা কাণ্ড করিতে হইবে,—এতজ্জাতীয় দাবী বা জিদের নিকটে নত হইও না। সমবেত উপাসনার প্রকৃত সুফল দেশ, জাতি ও জগতের উপরে ফলিতে দেখিতে হইলে ইহাকে আচরণে ও প্রকরণে নির্ভেজাল রাখিয়া ইহার অনুশীলন দীর্ঘকালস্থায়ী করিতে হইবে। মজ্জাগত আলস্যের স্বভাব, বদ্ধমূল কলহের প্রবণতা, দীর্ঘকালসঞ্চিত একাকী মুক্তি-লাভের আগ্রহ এবং সর্ব্বোপরি সুযোগ পাইলেই সতীর্থদের মধ্যে হঠাৎ গুরুদেব সাজিয়া নিত্য নূতন ফরমান জারি করার কুপ্রবৃত্তি তোমাদিগকে যেন কদাচ পথভ্রষ্ট না করিতে পারে। আর্য্য, অনার্য্য, প্রায়ার্য্য, প্রাগার্য্য নির্ব্বিশেষে সর্ব্বশ্রেণীর মানুষের সহিত তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন সৃষ্টি করিতে হইবে। সুতরাং জেদাজেদি দ্বারা উপাসনার আসরকে উত্তপ্ত করা হইতে তোমাদের বিরত থাকিতেই হইবে বাছারা।"

বন-পাহাড়ের দিকে তাকাও

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও লিখিলেন,—

"ভারতবর্ষ সমুদ্রমেখল দেশ, তথাপি সমুদ্রযাত্রা করিয়া সামুদ্রিক দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপনের জন্য তোমাদিগকে উপদেশ

দিতে পারিতেছি না। কিন্তু এদেশে বনপর্ব্বত দ্বারা অধিকৃত স্থানের পরিমাণ কম নহে। কোনও কোনও বনে ও পাহাড়ে তোমাদের যাইবার প্রয়োজন আছে। বনপর্ব্বতবাসীদের কুশলার্থে ত' নিশ্চয়ই, সঙ্গে সঙ্গে তোমাদেরও কুশল হইবে। জনসেবার ব্রত লইয়া তোমাদের সেই সেই অঞ্চলে যাইতে হইবে এবং শনি, রাহু, কেতুর উপাসনা প্রচলিত করিবার জন্য নহে, অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উপাসনা-প্রচলনের জন্য তোমাদের অশেষ শ্রম করিতে হইবে। তখন আলাদা ভাবে হরিওঁ-কীর্ত্তন এবং সামূহিক ভাবে সমবেত উপাসনা তোমাদের এক পরম নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার হইবে। ইহার দ্বারা তোমরা অনেক পরকে আপন করিবে, অনেক পথভ্রান্তকে পথ দেখাইবে। ইহা এক অবিস্মরণীয় কীর্ত্তিকর কর্ম্ম হইবে। একাজে মনের বল বাড়িবে, আত্ম-প্রসাদ লাভ করিবে, অনেক রোরুদ্যমান মুখে আনন্দের হাসি ফুটাইতে পারিবে। ভগবানের সন্তানদিগকে অবহেলা না করিয়া যদি তোমরা প্রেমভরে বক্ষে টানিয়া আনিতে পার, তবে তোমাদের ধর্ম্মজ্ঞান ও ধর্ম্মানুরাগ সার্থক হইবে, সফল হইবে। তোমরা সেই দিকটাতে লক্ষ্য দাও। বাহিরের পানে তাকাইলে ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তিত্ববোধ হ্রাস পায়, অমানুষও প্রকৃত মানুষ হয়। নিজ নিজ গ্রামে বা পাড়ায় মোড়লী না করিয়া বিশ্বের বিরাট দরবারে আজ তোমাদের সর্ব্বশঙ্কা পরিহার করিয়া নামিয়া যে পড়িতে হইবে, এই কথাটী বাবা একজনেও ভুলিও না। তোমাদের কাহারও

কাহারও ব্যক্তিগত মহিমার প্রচ্ছন্ন গর্ব্ব তোমাদের গুরুগৌরবকেও ম্লান করিয়া জ্যোতির্ম্ময় দিগন্তকে তিমিরাচ্ছন্ন করিবার উদ্‌যোগ করিয়াছে, তাহা কি খোলা চখে দেখিতে পাইতেছ না? জিদ্ এবং জবরদস্তি দ্বারা কদাচ কোনও সাত্ত্বিক কাজের শ্রীবৃদ্ধি হয় না। জিদ্ অধিকাংশ সময়েই আত্মহঙ্কার-প্রসূত। খুব কম ক্ষেত্রেই জিদ্ প্রকৃত আত্ম-বিশ্বাসের সুফল, জানিও।

পত্র-লিখন-প্রকরণ

ফরিদপুর জেলান্তর্গত দাসর্ত্তা-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তুমি তোমার ময়মনসিংহে অবস্থান কালে আমার কাছ হইতে ধারাবাহিক ভাবে দশ পনেরখানা পত্র পাইয়াছিলে। পত্রে লেখকের নাম স্বাক্ষর ছিল 'আপনার জন' রূপে। হাঁ, এক সময়ে আমি লক্ষাধিক পত্র 'আপনার জন' স্বাক্ষরে ডাকে দিয়াছি। তুমি সেই সময়ে ব্রহ্মপুত্র-তীরে বসিয়া সন্ধ্যার পরে এক পূর্ণিমায় আমাদের সমবেত উপাসনাতেও যোগ দিয়াছিলে। সেদিন নিশ্চয়ই যশোদলের এক গোস্বামী, বেগুনবাড়ীর ফণীন্দ্র নাথ দত্ত, পিংলার জিতেন্দ্র দত্ত, জঙ্গলবাড়ীর খগেন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং গফরগাঁওয়ের হরেন্দ্র নাগের সহিত তোমার পরিচয় হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যেই কেহ কেহ একজন তোমার নাম ও ঠিকানাটি আমাকে দিয়াছিল, মনে হয়। তারপর হইতে

আমি আমার অভ্যাসানুসারে শত শত যুবককে পত্র লিখিবার কালে তোমাকেও অনেক পত্র দিয়াছি। এই আশা করিয়া পত্র দেই নাই যে, একদা তোমার সহিত আমার নিশ্চয়ই দেখা হইবে বা তোমার দ্বারা আমি কোনও সুনির্দ্দিষ্ট কাজ করাইব। আমি দেশ ও দশের কোটি কোটি মানুষের মঙ্গল-কামনা দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া এত পত্র লিখিয়াছি। ইহার শুভফল একদা নিশ্চিতই দেশবাসী ও জগৎ পাইবে। একই পত্রের একশতখানা অনুলিপি করিয়া আমি একশত স্থানে একশত জনের নামে পাঠাই। সুতরাং প্রথম পত্রখানা লিখিতেই আমার যা-কিছু কষ্ট। নকলগুলি ত' অনায়াসে হইয়া যায়। তবে পয়সার অভাবে আমি কার্ব্বণ পেপার ব্যবহারে বিরত থাকি। যুবকেরাই যুবকদের নাম-ঠিকানা সরবরাহ করে। আর আমি নিষ্কাম নিঃস্বার্থ চিত্তে তাহাদের কাছে পত্র প্রেরণ করিয়া আমার বুকের বোঝার লাঘব করি। এই পত্রলেখার প্রকরণটী একটী আশ্চর্য্যজনক অভিনব ব্যাপার। আমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না যে, একা আমি একাজ করিয়া যাইব, না আরও কেহ কেহ আমার পন্থানুসরণ করিবে। একটী কথাই বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্ন শব্দ-সমারোহে, বিভিন্ন রচনা-শৈলীর আশ্রয় নিয়া একটী মাত্র হৃদয়ের দুয়ারে নিয়া পৌঁছাইতে থাকিলে মরা মানুষকেও বাঁচান যায়, ইহা আমি বিশ্বাস করি। এই নিষ্ঠার নামই হইতেছে মন্ত্রের-শক্তি। আমি আমার একক জীবনে ইহাতে সফলকাম না হইলে আমার পরে আরও শত শত ভাবের পাগল একাজটী হাতে নিলেও নিতে পারেন,

এই ভরসা আমি রাখি। তোমরা ত' অনেকেই সাহিত্য-চর্চ্চা কর। মাদারীপুর মহকুমার হিন্দু-প্রধান প্রত্যেকটী গ্রামে শত শত লেখনী-বিশারদ প্রতি মাসে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, তাহাদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া তোমরা কি প্রতিজ্ঞা করিতে পার না যে, তোমরা ধর্ম্মকে, রুচিকে, আচরণকে, চিন্তাকে, আদর্শবাদকে এভাবে কাজ করিতে করিতে পবিত্রতার দিব্যজ্যোতিকে উদ্ভাসিত করিয়া দিবে? আমি হয়ত একদা অতীব বৃদ্ধ হইব এবং কাজ করিবার ক্ষমতা না থাকিলে কাজ করিবার জন্য নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস টানিব, বা হাত পা ছুঁড়িব। তোমার কি তোমাদের যৌবনকাল অপগত করিয়াও একাজে লাগিবে না? ঢাকা ও বরিশাল গিয়াছিলাম, বক্তৃতা দিয়াছিলাম, ক্ষুরধার লেখনী লইয়া কিছু যুবক কাজ চাহিতে আসিয়াছিল। কিন্তু মাদারীপুরে এতগুলি বক্তৃতা দিয়াও সেই শ্রেণীর যুবকদের চেহারা দেখিতে পাইলাম না কেন? ময়মনসিংহে ব্রহ্মপুত্র-তীরে এক পূর্ণিমার সন্ধ্যায় যে আলোক দর্শন করিয়াছিলে, তাহার স্মৃতি কি ভুলিয়া গিয়াছ? তুমি ভুলিলে ভুলিতে পার, কিন্তু আমি আমার কাজ ভুলিব না।

নিরাকার ও সাকার

দিনাজপুর জেলান্তর্গত ঠাকুরগাঁও-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"লিখিয়াছ, নিরাকার পরমেশ্বরে মন বসান যায় না বলিয়াই তুমি সাকার ব্রহ্মের উপাসনা করিতেছ এবং যাহারা

নিরাকার উপাসনা করে, তাহারা ভ্রান্ত। কথার প্রথমাংশটুকু ত' চমৎকার। তোমার পক্ষে যে ভাবে পরমেশ্বরের উপাসনা সহজ, তোমার চলিতে হইবে সেই পথেই। কিন্তু জগতে কেহই নিরাকার পরমেশ্বরের ধারণা করিতে পারে নাই, ইহা তোমার অনুমান। অনুমানকে প্রমাণের কৌলীন্য কদাচ দেওয়া যায় না। ছোটকাল হইতেই কোনও দেব-দেবী বা অবতারের কথা শুনিতে দেওয়া হয় না বলিয়া একটী মুসলমান যুবকের পক্ষে আবার সাকার পরমেশ্বরকে চিন্তা করাও অতীব কঠিন ব্যাপার। তাহার পক্ষে নিরাকার উপাসনা সহজ। সে তাহাই করিবে এবং তাহার তাহাই করা উচিত। চিরকাল কালীদুর্গা, রামসীতা, রাধাকৃষ্ণের উপাসনা দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াও পাঞ্জাবের স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী নিরাকার পরমেশ্বরেরই ভজনায় জীবনোৎসর্গ করিলেন। এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই যে, চিরকাল দেবদেবীতে বিশ্বাসী পরিবারে জন্মিয়াও কেহ কেহ অন্যরূপ হইতে পারে। সাকার বা নিরাকার, কোনও উপাসনাই বড় সহজ ব্যাপার নহে। যে যেইটা অভ্যাস করে, তাহার পক্ষে সেইটাই আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হইয়া আসে। তর্কযুদ্ধ নিষ্প্রয়োজন। আস্বাদনই বড় প্রয়োজন। বৈষ্ণবেরা বলেন, জীবের একমাত্র প্রয়োজন প্রেমের। সেই প্রেম যে ভাবে পার, আহরণ কর। ঈশ্বর-প্রেমই জীবন, ঈশ্বর-প্রেমহীনতাই জড়ত্ব।"

বৃথা আড়ম্বর

বেলা দেড়টায় ষ্টীমার চাঁদপুর ঘাটে পৌছিল। ষ্টেশানে কে বা কাহারা একটা রাজসিক সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। একটা হাতী এবং একটা ব্যাণ্ড পার্টি আনা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আড়ম্বর ভাল নয়। আড়ম্বর বা আতিশয্য চিরকাল কপটতাকে বহন করে। তোমার গুরুভক্তি আছে ত' হরিওঁ নাম-কীর্ত্তন করিয়া সম্বর্দ্ধনা কর। হাতী কেন? ব্যাণ্ড-পার্টি কেন? চাঁদপুর আমার জন্মভূমি, আমার বাল্যকালের ক্রীড়াভূমি। এই শহরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত একটী দুর্দ্দান্ত শিশু একটা শহরের গণ্যমান্য প্রায় সকলের বাড়ীতে ঘুরে বেড়িয়েছে নানা উপদ্রব কত্তে কত্তে। এ শহরের সবাই আমাকে চেনে না। আমার শৈশবে কৈশোরে আমাকে দেখেছেন, চিনেছেন, ভালবেসেছেন এমন হাজার জন বয়স্ক লোক এখনো এখানে জীবিত। কিছুকাল আগে এখানে ভাষণ দিয়ে গেলাম, তাঁরা সবাই মাঠের ধূলির উপরে খবরের কাগজ বিছিয়ে আড়াই তিন ঘন্টাকাল বসে বসে নিবিষ্ট মনে আমার কথাগুলি শুনেছেন, আর বলেছেন,—"ঐ শোন, আমাদের ছেলে কি বলছে।" সেই শহরে তোমরা আমাকে অভ্যর্থনা দেবে আড়ম্বর ক'রে? এই শহরের প্রতিকণা ধূলি আমার কাছে শ্রীবৃন্দাবন, এই শহরের প্রতিটি জলাশয়ের জল আমার কাছে বারাণসীর গঙ্গা। এখানে

আমি সম্মানের জন্য কাতর হব? এমন লজ্জায় আমাকে ফেলো না।

একই আসরে সমবেত উপাসনা ও বক্তৃতা

অপরাহ্ণ পাঁচটায় শ্রীশ্রীবাবামণি স্থানীয় কালীবাড়ীর নবনির্ম্মিত নাটমন্দিরে আসিলেন। কথা ছিল সমবেত উপাসনা হইবে। যথাকালে সমবেত উপাসনা আরম্ভ হইল কিন্তু জনতার এমন ভিড় এবং অকথনীয় গণ্ডগোল শুরু হইল যে, উপাসনা পরিচালনা করিতে গিয়া শ্রীশ্রীবাবামণির কণ্ঠস্বর ভাঙ্গিয়া গেল। অতি কষ্টে উপাসনা শেষ করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি কালীবাড়ীর উন্মুক্ত স্থানে খোলা হাওয়ায় বসিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি জিজ্ঞাসা করিলেন,—এত গোলমাল কেন?

স্থানীয় একজন নেতৃস্থানীয় উকিল বলিলেন,—আমরা প্রচার করিয়া দিয়াছি যে, উপাসনার পরে এই স্থানেই বক্তৃতা হইবে।

শ্রীশ্রীবাবামণি জিজ্ঞাসিলেন,—কার বক্তৃতা?

—আপনার।

—আমি উপাসনার আসরে উপাসনা শেষ হইবার পরে কদাচ বক্তৃতা দেই না। এটাই আমার সাধারণ নিয়ম। অতীব গুরুতর অবস্থার কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। এখানে কোনও গুরুতর পরিস্থিতি নেই। আজ রাত্রেই আমাকে শহর ত্যাগ কত্তে হচ্ছে না। বক্তৃতা ত' কালও হ'তে পারে।

উকিল বাবু বলিলেন,—আপনার অপূর্ব্ব চিত্র-প্রদর্শনী এখানে বারো দিন দেখান হইয়াছে। হাজার হাজার লোক আপনাকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র ও কথা শুনিতে চাহে। কিছু বলুন।

শ্রীশ্রীবাবামণি কণ্ঠের অবস্থা দেখাইয়া বলিলেন,—কাল বক্তৃতা হইবে, এই কথা এখনি প্রচার করিয়া দিন। উপাসনাটা যদি প্রাতে হ'য়ে থাক্‌ত, তবে বিকালে এখানে বক্তৃতা হবার পক্ষে আমার কোনো আপত্তি থাক্‌তে পারত না।

চাঁদপুর

১৬ আশ্বিন, শুক্রবার, ১৩৪৩

(২রা অক্টোবর, ১৯৩৬)

অখণ্ডমণ্ডলী সম্পর্কে

হাজিগঞ্জ হইতে আগত জনৈক জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যেখানেই মণ্ডলী থাকুক, সেখানেই তাকে শক্তিশালী করবার জন্যে চারিদিকের অনুরাগীদের লক্ষ্য থাকা উচিত। একটা মণ্ডলী গ'ড়ে উঠতে না উঠতে পাশাপাশি আর একটা মণ্ডলী গঠন ক'রে, প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করা উচিত নয়। কাছাকাছি জায়গায় দুটা তিনটা মণ্ডলী স্থাপিত হ'য়ে গেলে তাদের মধ্যে আড়াআড়ি আর কাড়াকাড়ি বড় দোষাবহ ব্যাপার। ব্যক্তিগত জেদ বা অহমিকা যাতে এই অনর্থটা সৃষ্টি করতে না পারে, তার দিকে প্রত্যেকের লক্ষ্য থাকা

উচিত। কাছাকাছি মণ্ডলীগুলির মধ্যে ঐক্য এবং সহযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রশংসনীয়। ঐক্য-বাধক, সম্প্রীতি-নাশক চিন্তা, বাক্য ও ব্যবহার সর্ব্বতোভাবে নিন্দনীয়, অতএব বর্জ্জনীয়। যেখানে ঐক্য ও প্রীতির আবহাওয়া নাই, সেখানে মণ্ডলী থাকা অত্যন্ত লজ্জাজনক। চরিত্রের মধ্যে বিনয় না থাকলে পরস্পর পরস্পরকে সহ্য ক'রে চলা কঠিন। বিনয় এবং ভদ্রতা যে শিক্ষা করতে হয়, এই মূল্যবান্ কথাটী অনেক শিক্ষিত বর্ব্বর জানে না। অনেক ধনগর্ব্বিত পাষণ্ড ভুল ক'রে মনে ক'রে থাকে যে, টাকা দিয়ে বিনয় এবং ভদ্রতার অভাব পূরণ কত্তে পারবে। প্রত্যেকে ভদ্র হও, প্রত্যেকে বিনয়ী হও, প্রত্যেকে আত্মদোষদর্শী হও, প্রত্যেকে অপরকে সম্মান করতে শিখ। তুমি যদি অপরকে সম্মান করতে না পার, তাহ'লে কি ক'রে আশা কর যে, অপরেও তোমাকে সম্মান করবে? তুমি যদি অপরকে স্নেহ করতে না পার, তবে প্রত্যাশা করা উচিত নয় যে, অন্যেরাও তোমার প্রতি স্নেহ-পরবশ হবে। মণ্ডলীর আসল কাজ সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠান হ'লেও অন্যান্য কাজ পরিচালনের জন্য আলাদা আলাদা উপসমিতি অনায়াসে থাকতে পারে। এই সকল উপসমিতির সদস্যরা যে, মণ্ডলীর অধিনায়কদের চাকর-বাকর নয়, এই কথাটা মনে রাখতে হবে। এই সকল উপসমিতির কর্ম্মিগণেরও উচিত নয়, মণ্ডলীর সম্মান ক্ষুন্ন ক'রে বা মণ্ডলীর ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে কোন কাজ করা। প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকের সহযোগ-

বুদ্ধি অটুট রাখতে হবে। তা নইলে তোমাদের বিরাট বাহ্যাড়ম্বর হাস্যাস্পদ হ'য়ে পড়বে। বাইরে থেকে লোকে শুনবে এক একটা মণ্ডলীর কত নাম-ডাক, কত শোরগোল, কিন্তু ভিতরে ঢুকে দেখবে ফোঁপড়া, অন্তঃসারহীন এবং বৃথা আস্ফালন। এই দুর্গতি যেন তোমাদের না হয়। বরং মণ্ডলী গড়বে না, তবু সমবেত উপাসনা চালিয়ে যাও। যে মণ্ডলীতে ঝগড়া-ঝাটি থাকে, আমি সে মণ্ডলীতে নাই। মণ্ডলীর কোন কর্ম্মী বা সদস্য কদাচ পরনিন্দা কর্ব্বে না। কোন স্ত্রীলোকের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করা তো কোন অবস্থাতেই চলবে না। বালিকাই হোক্, বৃদ্ধাই হোক, নারী-মাত্রই তোমার মায়ের জাত। মায়ের জাতের নিন্দায় যার জিহ্বা মুখর হয়, সে অস্পৃশ্য চণ্ডাল। তার সঙ্গে কোনও মণ্ডলীর কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। এই কথাটি প্রত্যেকে মনে রেখ। মণ্ডলী গড়বে নিজ মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণতা বিধানের জন্য, ঝগড়াটে হবার জন্য নয়।

ধর্ম্মবুদ্ধি ও একত্ববোধ

বাকিলা-নিবাসী জনৈক প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মানুষের অন্তরের অন্তর্দ্দেশে প্রবেশ কর, তার ধর্ম্মবুদ্ধি বৃদ্ধি কর, তার আস্তিক্যবোধ জাগ্রত কর, ত্যাগ-প্রেরণা এবং সেবাপরায়ণতা বিকশিত কর। এটিই তোমার কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যে যদি অবহেলা না কর, তাহ'লে দেখতে পাবে যে, আর এক পা এগিয়ে গেলেই তাকে তুমি

পূর্ণ মনুষ্যত্বে অভিষিক্ত করেছ। সেটি হচ্ছে, সমভাবের ভাবুকদের সহিত সমধর্ম্মী ও সমকর্ম্মীদের সহিত ঐক্যবোধ। একাকী তপস্যা ক'রে ব্রহ্মদর্শন, এটা আগেকার দিনের কথা। এ যুগের বাণীই হ'ল এই যে,—

সবাই মিলিবে সবার সাথে,
হাত মিলাইবে সবার হাতে
প্রাতে ও দুপুরে দিবসে রাতে
নাহিক বিরাম তার—
এই হ'ল বাণী নবযুগ-বিধাতার।

তুমি খুব ভাল কর্ম্মী, ওটাই বড় কথা নয়। কথাটা বড় হবে তখন যখন তুমি অন্যান্যের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দীর্ঘকাল নিঃশব্দে নিজ কর্ত্তব্য পালন ক'রে যেতে পারবে। আগেকার যুগে অর্জ্জুন কর্ণকে আহ্বান ক'রে বলতেন, ভীম দুঃশাসনকে আহ্বান ক'রে বলতেন, দশানন রামচন্দ্রকে আহ্বান ক'রে বলতেন, আয়রে পাপিষ্ঠ, এগিয়ে আয়, তোর সাত জন্মের রণ-পিপাসা এখনই মিটিয়ে দিচ্ছি। আর, এখনকার দিনে যুদ্ধ যেমন সামূহিক ব্যাপার, তপস্যাও তেমন সামূহিক ব্যাপার। কর্ম্মযোগও এই যুগে ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, সামূহিক ব্যাপার। সবাই মিলিত হ'য়ে কাজ কর, "সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং" এগুলি ছিল প্রাচীন কালেরই উপদেশ। কিন্তু জীবনের অধিকাংশ চর্য্যায় তপস্যা হ'য়ে পড়ল নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। বিশ্বামিত্র নূতন স্বর্গ সৃষ্টি করবেন, নূতন মানবজাতি গড়বেন, ত' বসলেন গিয়ে একক তপস্যায় গভীর

বনে। তার ভাল দিকটা এই যে, আড়ম্বরের বাহুল্য বর্জ্জিত হ'য়ে গেল। জিনিষটা সাত্ত্বিক রইল। কিন্তু বড় বিশ্বামিত্রের সাথে তপস্যা করতে ব'সে ছোট বিশ্বামিত্র, মাঝারি বিশ্বামিত্র আরও দু-পাঁচজন যে হ'তে পাত্তেন, সেটা আর হ'তে পারল না। একজন বিশ্বামিত্র, একজন বশিষ্ঠই পৃথিবীর শেষ দান, এরকম মনে করা উচিত নয়। আরও বিশ্বামিত্র, আরও বশিষ্ঠ আসবেন, এই বিশ্বাস রাখা চাই। সামূহিক তপস্যাকে অঙ্গীকার ক'রে নিলে এই আশা সফল হ'তে পারে। তারই জন্য আমি সমবেত উপাসনার প্রবর্ত্তন করেছি। কিন্তু তোমাদের মধ্যে যদি ঐক্যবোধ না থাকে, দলদলির স্পৃহা যদি না কমে, তবে তোমাদের সকল চেষ্টা প্রসব করবে অশ্বডিম্ব। মুসলমানরা নমাজ নিয়ে ঝগড়া করেন না। খ্রীষ্টানরা গীর্জ্জায় উপাসনা নিয়ে কলহ করেন না। তোমরা তা কর। কলহ করা তোমাদের মজ্জাগত স্বভাব। যেখানে কলহ কত্তে পার না, সেখানে নিয়ত তোমাদের প্রাণটা আইঢাই করে। একটু কলহ কত্তে পারলে প্রাণটা জিরায়। একত্ববোধ কলহের নির্ব্বাণ সাধন করে। ব্যক্তিত্ববোধ কলহকে উস্কে দেয়। সেবাবুদ্ধি একত্ব-বুদ্ধিরই স্বাভাবিক ফল। তাই সেবক বিনম্র হয়, মধুরভাষী হয়, ক্ষমাশীল হয়। অহঙ্কার থেকে কর্ত্তৃবোধের সৃষ্টি হয়, উগ্র কর্ত্তৃত্ববোধ একত্ববোধকে ধ্বংস করে। হিন্দুরা হাজার দু হাজার বছর ধ'রে কেবল নিজেদের মধ্যেই কলহ করেছে। তোমাদের রাজনৈতিক দুর্গতির মূল আত্মকলহ। তোমাদের অধিকাংশ সামাজিক ব্যাধির মূল আত্মকলহ। তোমরা সত্যকে

সহজ দৃষ্টিতে দেখতে চাও নি। তোমার নিজের হুকুম মাফিক সত্যকে তৈরী করাতে চেষ্টা করেছ, তাই ঐক্য আসে নি। জাগ্রত ধর্ম্মবোধ হৃদয়ে উদ্দীপিত থাকা সত্ত্বেও তোমরা তাই শুধু নরাধমই নও, জীবাধমও। তাই বলছি ধর্ম্মবুদ্ধিকে ঐক্যবুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কর।

কুমারী-অবস্থায় দীক্ষা গ্রহণ

অপর এক জিজ্ঞাসু প্রশ্ন করিলেন,—কুমারীদিগকে আপনি দীক্ষা দেন কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অমনিতেই আমি খুব কম লোককে দীক্ষা দানে আগ্রহী। খুব জোর ক'রে ধ'রে না পড়লে, আমি সাধারণতঃ কাউকে দীক্ষা দেই না। আমার তরুণতর জীবনে একটা সময় এসেছিল, যখন মাঠে-ঘাটে চলতে চলতে যাকে তাকে দীক্ষা দিতে ইচ্ছা কর্ত্ত। তখন বুঝতে পারি নি যে, এই দীক্ষা-দানের অত্যাগ্রহটা কামেরই একটা রূপান্তরগ্রস্ত অবস্থা। কামরিপু কলুষ-পঙ্কলের পথ চলতে গিয়ে বাধা পেয়ে যে দীক্ষা দানের রুচি-রূপে আত্মপ্রকাশ কত্তে পারে, একথা যখন থেকে আমার বিবেকের কাছে ধরা পড়ল, দীক্ষাদান তখন থেকে আমার কাছে একটা বিরল ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়াল। অনেক অতীতে দীক্ষাপ্রাপ্তরা কেউ কেউ যে আমাকে ছেড়ে ভিন্ন পথে চ'লে গেছে, তার হয়ত অন্যতর কারণ আমার দীক্ষাদানের বিশুদ্ধির অভাব। কয়জন দীক্ষাদাতা নিজের দীক্ষাদানের কলুষ-কালিমাটুকু দেখতে পান? ভগবানের

দয়াতেই এই অসাধ্য সুসাধ্য হয়েছে। তাই আমি গায়ে প'ড়ে আর কাউকে দীক্ষা দেই না। সুতরাং স্ত্রীলোকদিগকে দীক্ষাদানে ত' আমার অনাগ্রহ আরও অধিক। স্বামী একাকী দীক্ষা নিতে এলে বলি না, স্ত্রীটিকেও নিয়ে এস। একজন তিনটী কুমারী কন্যাকে দীক্ষার্থ নিয়ে এলে কদাচ বলি না যে, বাকী চারটিকেও এনে দীক্ষার ঘরে বসিয়ে দাও। কুমারীদের দীক্ষাদানে একটী অলিখিত অপ্রকাশিত দায়িত্ব আছে। সেইটী হচ্ছে যে, তার যখন বিবাহ হবে, তখন সে তার স্বামী-দেবতাটীকে কিরূপ স্থিতিতে পাবে, তা কেউ জানে না। আমি একটী মন্ত্র দিলাম, তার স্বামী আগে থেকেই অন্য একটা মতে দীক্ষিত গোঁড়া ভক্ত। দুজনে লাঠালাঠি লেগে গেলে আমি কি কর্ব্ব? পরের সংসারে আমার প্রবেশের অধিকার কোথায়? কোনো কোনো প্রসিদ্ধ ধর্ম্মাচার্য্য ত' প্রকাশ্যেই প্রত্যহ আমার মুণ্ডপাত করেন,—তেমন একজন মহাপুরুষের শিষ্য যদি আমার কুমারী-শিষ্যাটীর স্বামী মশায় হন, তবে ত' খটি খটি বেঁধে যাবে ফুলশয্যার রাত্রিতেই। রাত না পোহাতেই পতি-প্রবর ধনুর্ভঙ্গ পণ কর্ব্বেন,—হয় তুমি তোমার গুরু ত্যাগ কর, নয় ত' আমি আমার বিবাহকে অস্বীকার কর্ব্ব। তখন বেচারী স্ত্রীটি কোথায় যায়, বল ত'। এসব ভেবে আমি কুমারীকে দীক্ষা দিতে সব সময়ে গুরুজনদের সম্মতি, অনুমতি, অনুমোদন নিয়ে তবে আস্‌তে বলি। দীক্ষা নেবার আগেই এসব বিষয়ে বিচার করা ভাল। দীক্ষা নেবার পরে পরিস্থিতির

মোকাবিলা কর্ত্তে গেলে কখনো কখনো হিতে বিপরীতও ঘ'টে যেতে পারে।

ওঙ্কার-মন্ত্র

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একটী কুমারীকেও আমি অভিভাবকের অমতে দীক্ষা দেই না। একটী কুমারীকেও দীক্ষামণ্ডপে আসবার জন্য আমন্ত্রণ করি না। কুমারী ত' কুমারী, সধবা-বিধবা-কুমারী নির্ব্বিশেষে আমার প্রতিটি স্ত্রীলোক সম্পর্কে আচরণবিধি এই যে, আমি গোপনে তাদের সঙ্গে কথা বলি না, নিরিবিলিতে আলাপ-আলোচনা করি না, কোনও গুহ্য ব্যাপারে শিক্ষাদান করি না, পদসেবা, অঙ্গসেবা, এমন কি তালপাতার পাখার বীজন পর্য্যন্ত গ্রহণ করি না, কোনও খাদ্য বা পানীয় চাহিয়া নেই না। আমি নিজেকে নিষ্পাপ রাখবার চেষ্টা করি এবং প্রয়োজন-ক্ষেত্রেই মাত্র কুমারীকে দীক্ষা দেই, একাকিনী কোনও রমণীকে দীক্ষাদান খুব কম ক্ষেত্রেই করেছি। এত যে কঠোর নিয়ম আমি পালন করি, তার কারণ এই যে, আমি ওঙ্কার মন্ত্রে দীক্ষা দেই। এই মন্ত্র সর্ব্বমন্ত্রের আধার, মূলীভূত উৎস এবং আশ্রয়। এই মন্ত্র জপিয়া একাধারে সর্ব্বমন্ত্র জপ করা হয়। সুতরাং বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে কুমারী নিবিষ্ট মনে এই মন্ত্রের সাধন করেছে, সে বিবাহের পরে তার স্বামীর আপদ না হ'য়ে সম্পদই হবে ব'লে মনে করার বিশেষ সঙ্গত কারণ আছে। তবে, এক

এক সংসারে এক এক রকমের সংস্কারের রাজত্ব প্রচলিত থাকায়, দু-চারটি মেয়ে যে বিবাহের পরে বিপদে পড়বে, এমন সন্দেহের অবকাশ আছে। নতুবা, স্বরূপানন্দ-সন্তান অধিকাংশ স্থানে সহজেই পরিস্থিতিকে নিজের অনুকূল ক'রে নিতে পার্ব্বে। আজ সংস্কারান্ধ পৃথিবীটাকে যা দেখতে পাচ্ছ, পঞ্চাশ বৎসর পরেও ঠিক তাই থাকবে না।

অর্দ্ধ-শতাব্দী পরে

প্রশ্নকর্ত্তা প্রশ্ন করিলেন,—পঞ্চাশ বৎসর পরেও কি আপনি এই দেহে বিদ্যমান থাকবেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আরও অর্দ্ধ-শতাব্দী কাল আমার পাঞ্চভৌতিক দেহটা এই জগতে থাকলেও থাক্‌তে পারে। কারণ, নিত্য নূতন মৃত্যু-সঙ্কট উপস্থিত হ'য়ে আমার শেষ ট্রেণের ঘন্টা বাজিয়ে গেলেও শেষ পর্য্যন্ত দেখ্‌তে পাচ্ছি যে, গাড়ীটা আর ছাড়ল না, টাইম-টেবল বাতিল হ'য়ে গেল। আজ কেউ বলে না, স্বরূপানন্দ বিধবার জীবনকে শয়তানের কূটকৌশল হ'তে বাঁচাবার উপায় তারস্বরে ঘোষণা ক'রে গেছে। আজ কেউ বলে না, স্বরূপানন্দ সধবা মেয়েদিগকে সংযমের পথে চলার পাথেয় দিতে পেরেছে। আজ কেউ বলে না, স্বরূপানন্দ কুমারী কিশোরীকে জীবন-গহনের কন্টকময় পথে নির্ভয়ে পদচারণার উপায়-সমূহ তারস্বরে ঘোষণা ক'রে গেছে। কিন্তু অর্দ্ধ-শতাব্দী পরে এই কথাগুলি

সবাইকে সানন্দে সগর্ব্বে সহর্ষে স্বীকার ক'রে মানুষকে প্রেরণা দিতে হবে। সাধারণ ভাবে সামাজিক অবস্থা ও চরিত্রগত নীতিজ্ঞান অনেক নিম্নতর স্তরে গিয়ে ডুবলেও সব ঠেলে ঠুলে উপরে ওঠবার আকাঙ্ক্ষা-যুক্ত সুপ্রয়াসী আন্দোলন সেদিন চারিদিকে সঞ্জীবতা দেবে। আমি পঞ্চাশ বৎসর পরের ভারতবর্ষকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। শুনতে পাচ্ছি দরিদ্রের হাহাকার, শুনতে পাচ্ছি নারীর আর্ত্তনাদ, দেখ্‌তে পাচ্ছি যৌবনের নিদারুণ অধঃপতন। সঙ্গে সঙ্গে শুন্‌ছি আগামী যুগের দেবতাগণের শঙ্খনাদ, আগামী যুগের দেবদেবীর স্নিগ্ধ কণ্ঠবাণী, শুন্‌তে পাচ্ছি পরদুঃখকাতর দেব-মানবের সর্ব্বত্যাগ-ব্রত গ্রহণান্তে পরজন সুখার্থে আত্ম-বিসর্জ্জনের বিমলোল্লাস।

অপরাহ্ণে চাঁদপুর কালীবাড়ীর সংলগ্ন মাঠে বক্তৃতারম্ভ হইল।

ঘোড়ামারার মাঠ

শ্রীশ্রীবাবামণি সূচনা-প্রসঙ্গে বলিলেন,—ইংরাজি ১৯১৪ সালের যৎকিঞ্চিৎ আগে কোনও এক বিস্মৃত সন্ধ্যায় চাঁদপুর শহর হতে মাইল দেড় দুই দূরে পূর্ব্বদিকে অবস্থিত, রেল লাইনের সংলগ্ন দক্ষিণে এবং ডাকাতিয়া নদীর সংলগ্ন উত্তরে সুবিস্তৃত তৃণ-শ্যামল ঘোড়ামারার মাঠে এই চাঁদপুর শহরের নগণ্য তিন চারিটী তরুণ-কিশোর জ্যোছনায় উদ্ভাসিত আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করল, তারা আত্মগঠন করবে, চরিত্র-সাধনা কর্ব্বে, এবং অপরাপর বহু জনকে একাজে

উৎসাহিত কর্ব্বে এবং উদ্দীপনা দেবে। কিন্তু চরিত্র-গঠনের গোড়ায় চাই ঈশ্বর-বিশ্বাস। ঈশ্বরকে আমরা কেউ দেখিনি। এমন অবস্থায় তাঁতে বিশ্বাস ন্যস্ত কত্তে হ'লে অবিরাম তাঁর নাম স্মরণই একমাত্র উপায়। কিন্তু কোন্ নাম স্মরণ কর্ব্ব? শত শত ভাষায় তাঁর হাজার হাজার নাম আছে। এর মধ্যে কোন্টা সত্য ও আসল এবং কোন্টা অসত্য ও নকল, তা কি ক'রে বুঝ্‌ব? আমাদের মনে কুণ্ঠা এল। তবু হাল ছেড়ে দিলাম না। আমরা যার যার ঘরে ব'সে যার যার প্রিয়নাম জপতে আরম্ভ কর্‌লাম। কালক্রমে প্রত্যেকেই জানতে পারলাম যে, সব নামই এক নাম, সব নামেরই পরিণাম এক, সব নামেরই উৎসমুখ এক। মনের দ্বন্দ্ব দূর হ'ল। আমরা যার যার প্রিয় নামের মধ্য দিয়েই ওঙ্কার-দর্শন ও ওঙ্কার-শ্রবণ ক'রে কৃতার্থ হলাম। সেই ঘোড়ামারার মাঠে ঐ যে আমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তারই জের চলছে আমাদের বর্ত্তমান বক্তৃতা-মালায়। যে কাজটা আমরা ধরেছিলাম, সে কাজটা আমরা আর ছেড়ে দিই নাই। ধ'রেই রেখেছি। যেখানে সুযোগ পাচ্ছি, সেখানেই স্পষ্ট ভাষায় সকলকে ডেকে ব'লে দিচ্ছি, আমরা চরিত্র-গঠনের আন্দোলন চালাতে এসেছি এবং এই আন্দোলনের কাজে আমরা প্রত্যেকের সহায়তা চাই।

কেমন সহায়তা চাই

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আপনারা অনেকে আমাকে চাঁদপুর শহরে আমার লেংটা অবস্থা থেকে দেখে এসেছেন।

আপনারা জানেন যে, আমি কখনো কারো কাছে অর্থ-সাহায্য প্রার্থনা করিনি, কর্‌বও না। তবে আপনারা আমাদের কাজে কি সাহায্য করবেন? আমি বলি, করার অনেক পথ আছে, শুধু একটু ইচ্ছা থাকলেই হয়। আমরা এখানে কয়েক দিন ধ'রে যে কথাগুলি বল্‌ব, আপনাদের প্রত্যেকের প্রতি প্রাণের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও বিনয় নিয়েই বল্‌ব। তা আপনাদের একটু কষ্ট ক'রে মনে রাখতে হবে। দয়া ক'রে সেই কথাগুলি নিজ নিজ রুচিমতন ভাষায় নিজ নিজ গৃহবাসী ও প্রতিবেশীদের শুনাতে হবে। আমাদের নাম শুনাবার দরকার নেই, আমাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের কথা শুনালেই চলবে। আপনারা যে মন দিয়ে কথা শুনবেন, সেই ঋণই আমাদের শোধ করার যোগ্যতা নেই। তার উপরে আবার আপনাদের অর্থ-সাহায্য চাইতে যাওয়ার মত অপরাধ কি কিছু আছে? আমি বল্‌ছি, স্বতঃপ্রণোদিত হ'য়েও কেউ যেন আমাদের অর্থ দেবার চেষ্টা না করেন। কারণ, আপনাদেরই স্নেহপালিত হ'য়ে, আপনাদেরই কোলেকাঁখে মানুষ হ'য়ে যে বুলিগুলি শিখেছি, সেগুলিই রূপান্তরে আমার পুস্তকনিচয়ে পরিণত হয়েছে। ঐ যে টেবিলের উপরে সাজানো বইগুলি দেখ্‌তে পাচ্ছেন, ওতে যে সব কথা লেখা আছে, তা ত' আমি চাঁদপুরের মা-বাবাদের মুখ থেকে শুনে শুনেই শিখেছি। ঐ গুলিই আমার পক্ষে আপনাদের প্রতি অপরিশোধ্য ঋণ। ঐগুলির আয় দিয়েই আমাদের এই আন্দোলন চলছে এবং চিরকাল চল্‌বে। আপনারা একদা যে শুদ্ধ চিন্তাগুলি আমার শৈশব-শ্রবণে

শুনিয়ে দিয়ে প্রাণের ভিতরে অনুপ্রবিষ্ট ক'রে দিয়েছিলেন, তার বেশী কোনো সম্পদ আমার ভাণ্ডারে নেই। আপনাদের দেওয়া জিনিষ দিয়েই আমি জগজ্জয় কর্ব্ব,—আপনারা নিজ নিজ পুত্রকন্যাদিগকে ঐ চিন্তাগুলির অংশভাক্ করুন।—এই সাহায্য আমি চাইই চাই। সহস্র সহস্র শ্রোতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমি কত কথা সপ্তাহ ধ'রে, পক্ষকাল ধ'রে ঢাকায়, বর্দ্ধমানে, রংপুরে, ময়মনসিংহে, শ্রীহট্টে, বরিশালে বলেছি, কিন্তু এইরূপ সাহায্য ভিক্ষা আর কোথাও করি নাই। তার একমাত্র কারণ এই যে, চাঁদপুর আমার জন্মভূমি।

এমন তুমুল করতালি ধ্বনি উঠিল আর "ধন্য" "ধন্য" রবে আকাশ পরিপূরিত হইল যে, দুই তিন মিনিট কাল আর কোনো শব্দ শুনা গেল না।

বক্তৃতা আড়াই ঘন্টা চলিল।

ধন্যবাদের পালা

বক্তৃতা শেষ হইলে উৎসব-কমিটির সম্পাদক ডাঃ যোগেশ চন্দ্র শূর ধন্যবাদ দিতে গিয়া আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন,—আমরা ধন্য, চাঁদপুর ধন্য, ধন্য গঙ্গোপাধ্যায়-বংশ, ধন্য জেলা ত্রিপুরা, ধন্য বঙ্গভূমি।

ডাঃ রোহিণী কুমার বসু বলিলেন,—স্বামীজীর সঙ্গে আমি এক সঙ্গে কারাগারে ছিলাম। প্রতিদিন রাত্রি নয়টা থেকে বারোটা পর্য্যন্ত তাঁর শ্রীমুখে এই একটী কথাই কত ছন্দে, কত ঢংয়ে, কত উপকথা, কত উপন্যাসের বিবৃতি-প্রসঙ্গে

বলিয়াছেন, কত ইতিহাস ঘাটিয়া দৃষ্টান্ত দিয়াছেন যে, চরিত্র-ধন পুনরুদ্ধার হইলেই ভারতের উদ্ধার হইল।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ ঘোষ বলিলেন,—চাঁদপুর তাহার শ্রেষ্ঠ সন্তান স্বরূপানন্দের কণ্ঠে শতাধিক বক্তৃতা শুনিয়াছে। আমার সঙ্গে সকলেই এই বিষয়ে একমত হইবেন যে, প্রতিটি মানুষকে প্রতিটি ভাষণে মুগ্ধ করিবার এমন ক্ষমতা ইহার আগে আর কেহ দেখে নাই।

ডাঃ মহেন্দ্র লাল কর্ম্মকার বলিলেন,—আমরা যত জেলার যত লোক এই চাঁদপুরে বাস করি, তারা প্রত্যেকে এই স্বরূপানন্দের জন্য গর্ব্বিত।

শ্রীযুক্ত কুমুদিনী কান্ত মুখুটী বলিলেন,—তিন পুরুষব্যাপী সাধনার ফল এই একটী মানুষে স্পষ্ট প্রতীয়মান, যাঁর নাম স্বরূপানন্দ।

ধারাবাহিক তিন দিন বক্তৃতা হইবার পরে পুপুন্কী আশ্রমের একটী টেলিগ্রাম পাইয়া শ্রীশ্রীবাবামণিকে কলিকাতা যাইতে হয়।

কলিকাতা
২২শে আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩৪৩
(৮ই অক্টোবর, ১৯৩৬)

মদ্যপানের অপকারিতা

শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্র কিশোর আচার্য্যের একান্ত অনুরোধে শ্রীশ্রীবাবামণি অপরাহ্নে চারি ঘটিকার সময়ে ১৫৭।৩ নং

আপার সারকুলার রোডে ভারত-বিখ্যাত এক প্রতিভাবান অভিনেতার গৃহে আসিয়াছেন।

অভিনেতার মাতা কতকগুলি মর্ম্মদাহী বেদনার কথা বলিলেন। অভিনেতার সহধর্ম্মিণী অত্যন্ত ব্যাকুলতার সহিত কাঁদিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণিও অশ্রু-সজল নয়নে তাঁহাদের কান্নার সহিত যোগ দিলেন। বলিলেন,—ভারতের ঋষিরা সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন। এই জন্যই মদ্যপানকে তাঁরা অত নিন্দা করেছেন। মদ্য-বিক্রেতাকে তাঁরা অকুলীন জ্ঞান করেছেন। মদ্যবিক্রেতাকে তাঁরা জাতিচ্যুত অন্ত্যজ করেছেন। ইয়োরোপ প্রভৃতি দেশে শীতাধিক্য বশত মদ্যপান মানুষের পক্ষে স্বাস্থ্যের জন্যই হয়ত প্রয়োজন হ'তে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষের জন্য সেই যুক্তি চলে না। মদ্যপান বড় সর্ব্বনাশা ব্যসন। কারণ, প্রথম প্রথম মাত্রানুযায়ী সেবন করা হবে ব'লে প্রতিজ্ঞা করলেও কিছুদিন না যেতেই দেখা যাবে যে, মাত্রাজ্ঞান ক্রমশ ঝাপশা হ'য়ে যাচ্ছে। তারপরে একদিন মাত্রাজ্ঞান একেবারে লোপ পাবে এবং প্রতিভাধর এই মহান্ ব্যক্তিটী জাতির সম্পদ-ভাণ্ডারে অতি নগণ্য ব'লে নিন্দিত হচ্ছে। তোমরা তোমাদের পুত্রদের আশীর্ব্বাদ কর, তারা যেন জীবনে মদ্য স্পর্শও না করে। তোমরা তোমাদের স্বামীদের জন্য প্রার্থনা কর, তারা যেন কারো সঙ্গে প'ড়েই পানপাত্র না ওষ্ঠ-সমীপে তোলে।

একটা শ্যামল শস্য-প্রান্তর হঠাৎ মরুভূমিতে পরিণত হইলে যে নিদারুণ হাহাকার সর্ব্বজীবের কণ্ঠে জাগিয়া ওঠে, ঠিক তাহাই যেন এই গৃহটীতে ফুকারিয়া উঠিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমি অতি সাধারণ মানুষ। আমার শক্তি সীমাবদ্ধ ও সাময়িক। তবু আমি তোমাদের হৃদয়-নিধির জন্য প্রার্থনা কর্ব্ব, উপাসনা কর্ব্ব, উপবাস কর্ব্ব। ওর একখানা ফটোর কাছাকাছি কোথাও আমার একখানা ফটো রেখে দাও। আমার ফটোকে জিজ্ঞাসা ক'রো যে, আমি আমার করণীয় কাজ ক'রে যাচ্ছি কিনা। আর, মহান্ শিল্পীরা ফটোর পানে তাকিয়ে আবার জিজ্ঞাসা ক'রো যে, সে কিছু টের পাচ্ছে কিনা।—এ ব্যাপারে আর কাউকে কিছু ব'লো না।

স্বরূপ ও তার প্রতিচিত্র

স্থিতিস্থান ৩৬নং কৈলাস বসু ষ্ট্রীটে শ্রীশ্রীবাবামণিকে ফেরৎ পৌঁছাইয়া দিয়া আচার্য্য মহাশয় সুবিনীত ভাবে বলিলেন,—বাবামণি, অতিশয় কুণ্ঠার সঙ্গে আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্ব্ব। রাগ করবেন না ত'!

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—রাগ? কিসের জন্য রাগ? প্রশ্নের জন্য ত'? আমি ত' মানুষের প্রশ্নের জবাব দেবার জন্যই জন্মেছি। ওটা আমার সহজাত ব্যবসায় বা জাত-কর্ম্ম। করুন না প্রশ্ন। জগতের সকল প্রশ্নের জবাব্ জানি না। যেগুলি জানি, সেগুলি অপকটে বলব্।

আচার্য্য মহাশয় বলিলেন,—আপনি আপনার ফটোখানাকে বসাতে বল্লেন এবং তাকে প্রশ্ন কত্তে বল্লেন যে সে তার

কর্ত্তব্য ক'রে যাচ্ছে কিনা। আপনি আর আপনার প্রতিচিত্র কি এক বস্তু?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—আমি আর আমার ফটো কদাচ এক বস্তু নই, কিন্তু আমার ফটো আমারই একটা আভাস। আমার ফটো আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, সেই আমাকে স্মরণ করায়, যেই আমি শুধু সীমাবদ্ধ দেহধারী একটী জীব নই, সীমাবদ্ধ জ্ঞানসম্পন্ন একটী সসীম প্রদীপ নই, পরম-মহাশক্তির সীমাবদ্ধ শক্তিসম্পন্ন একটী স্ফুলিঙ্গ মাত্র নই। অসীমকে জানতে গিয়ে সীমার প্রান্তে দাঁড়িয়েই কাজ শুরু কত্তে হয়, সসীমকে অস্বীকার ক'রে অসীমকে উপলব্ধিতে আনা বা অনুমান করা এক দুঃসাহসী ব্যাপার। অথচ হায়, সাকার-নিরাকার নিয়ে জগতে কত কলহ কত মতভেদ!

পুপুন্‌কী আশ্রম

২৮শে কার্ত্তিক, শনিবার, ১৩৪৩

(১৪ই নভেম্বর, ১৯৩৬)

ফলবৃক্ষ-রোপণ

২৬শে আশ্বিন সোমবার শ্রীশ্রীবাবামণি পুপুন্‌কী আশ্রমে পৌঁছিয়াছেন এবং একটী দিনের জন্য বরিশাল ঘুরিয়া আসা ছাড়া অন্যত্র যান নাই। প্রধান কর্ত্তব্য গিয়াছে পুপুন্‌কীর নিকটবর্ত্তী চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামগুলির ঘরে ঘরে গিয়া ফলবৃক্ষের চারার অবস্থা নিরীক্ষণ করা ও তদ্বির করা। সমগ্র বর্ষাটা

জুড়িয়াই ঘরে ঘরে গিয়া আশ্রম-কর্ম্মীরা দ্বারভাঙ্গা হইতে আনীত ল্যাংড়া ও মালদা হইতে আনীত কলমী আমের তৈরী চারা রোপণ করিয়া আসিয়াছে। এখন দেখা যাইতেছে যে, অযত্নে বা ছাগলের উৎপাতে অনেক গ্রামেরই অনেক গাছ নির্ম্মূল হইয়াছে। বৃক্ষরোপণের বিরুদ্ধে যে উগ্র জন-সংস্কার ছিল, তাহার এখন অনেকটাই উপশম ঘটিয়াছে কিন্তু কার গাছের চারার যত্ন কে করিবে? প্রতিবেশী-সুলভ ঈর্ষ্যা এক দারুণ শত্রু, আর তার চেয়ে বড় শত্রু অরক্ষিত অবস্থায় ছাগল ও গরুর উৎপাত। কেহ কেহ ভাল করিয়া বেড়া দিলে কি হইবে? কাঠ-কুড়ানী গ্রাম্য মেয়েদের উৎপাতে সমস্ত বেড়া বোঝায় রূপান্তরিত হইয়া দূরে ও নিকটে নানা গরীব গৃহস্থের উনুন ধরাইবার সাহায্য করিয়াছে। বেড়া ভাঙ্গিয়া দগ্ধ না করিলে কি ইহাদের রান্না চলিবে না? যখন লোকে এদেশে ফলের গাছ রুপিত না, তখন কি লোকে রান্না করে নাই?

শ্রীশ্রীবাবামণি এই বিষয়ে জনমত প্রবল করিবার জন্য প্রতিদিন দুই বেলা দুইটী করিয়া গ্রামে গিয়া জনসমাবেশ ঘটাইয়া বক্তৃতা দিতেছেন এবং অতীব ক্লান্ত শরীরে আশ্রমে ফিরিয়া অরুচি বশতঃ না খাইয়াই নিদ্রায় নিমগ্ন হইবার চেষ্টা করিতেছেন। এমন সময়ে একখানা টেলিগ্রাম আসিল রংপুর হইতে যে, সেখানে অতীব স্নেহভাজন একটী যুবক হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া রুদ্ধ হইয়া মারা গিয়াছে।

মৃত্যুর আগে ও পরে

শ্রীশ্রীবাবামণি শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া একটী সুদীর্ঘ সান্ত্বনা-পত্র লিখিলেন এবং সকলকে লইয়া পরলোক-প্রস্থিতের আত্মার শান্তি কামনা করিলেন।

পত্রখানা পাঠের পরে জনৈক সেবক প্রশ্ন করিল,—বাবামণি, মরণের পর মানুষ কোথায় যায়! মরণের আগেই বা কোথায় থাকে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এ প্রশ্নের জবাব আমার জানা নাই। অথবা হয়ত সত্য সত্যই জানি কিন্তু মনে নাই। জন্মগ্রহণ করার সময়ে শরীর যে ক্লেশ পেয়েছে এবং মস্তিষ্ক এমন অগঠিত ছিল যে, তার অতীতের খবরগুলি জানা থাকা সত্ত্বেও মনে থাকার কথা নয়। আর, জন্মলাভের আগের বিদেহী অবস্থায় এই দেহের ইন্দ্রিয়গুলি ছিল না, যা হচ্ছে বর্ত্তমান জন্মের পিতামাতার অশেষ দান।

মৃতদের জন্য শোক করিও না

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মৃতদের আত্মার কুশলের জন্য প্রার্থনা করিও, কিন্তু শোক ক'রো না। ভাবতে দোষ কি যে, ভগবানের প্রিয়জন চিরদুঃখহারী ভগবানের ডাকে তাঁর কোলে আশ্রয় নিতে চ'লে গেছে। চ'লে গেছে সে সানন্দে এবং ভগবানের কাছে পৌঁছে সে জীবনের সকল দুঃখবেদনা ভুলেছে। নিদ্রা, বিস্মরণ এবং মৃত্যু এক হিসাবে মানুষের

পরম বন্ধু। পরমশোকার্ত্ত ব্যক্তিও নিদ্রাকালে ভাল থাকে। ঈশ্বরে বিশ্বাস এলে নিদ্রাও আসে। জীবনের লক্ষ লক্ষ ছোট-বড় দুঃখ আমাদের নিষ্পেষণ ক'রে মেরে ফেল্‌ত, যদি আমরা কতকগুলি দুঃখ আপনা আপনি বিস্মৃত হ'তে না পাতাম। দুঃখ, অপমান, লাঞ্ছনাকে ভুলে যাওয়া এই হিসাবে মস্ত বড় এক পরিত্রাণ। মৃত্যু তার চেয়েও বড় মুক্তি। মৃত্যু হ'লে কি আর এই পৃথিবীর দেনা-পাওনা, লাভ-ক্ষতি, যশোনিন্দা, প্রতিষ্ঠা-অপমান তোমাকে পাবে? ভাল ভাবে যদি মরতে পার, তবে তোমারই ত' পোয়া বারো। একদিন তুমি মরবে, আমি মরব, আমার ও তোমার সব প্রিয়জনেরা মরবেই মরবে,—কারণ তারা জন্মেছে। না জন্মালেই আর মরার প্রশ্নটীও উঠত না। মরার প্রশ্ন যখন সকলের পক্ষে এক এবং তার উত্তরটাও যখন সকলের পক্ষে অভিন্ন, তখন শোক ক'রে লাভ কি?

যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণদান

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ঈশ্বর সম্বন্ধে আর জন্মমৃত্যু সম্বন্ধে এক একজন লোকের এক এক রকমের ধারণা আছে। যার যে ধারণাই থাকুক, কারো বিশ্বাস, অনুমান, যুক্তির সঙ্গে তোমার কোনও সংঘর্ষের হেতু দেখি না। কারণ, তোমারও অতীতের জন্মমৃত্যুর খবর মনে নেই, তাদেরও নেই। কোনো কোনো আদিম-বংশীয় নরনারী-সমাজে এই বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, মৃত্যুর পরেই অবিরাম অবিশ্রাম ইন্দ্রিয়-সম্ভোগের সুযোগ পাওয়া যায় এবং তা ঘটে খুব সম্ভ্রান্ত পরিবেশে।

যার দৃষ্টিতে যেটা লোভনীয়, সে তার চাইতে সহস্র গুণ লোভনীয় পরিতৃপ্তির উপায় পায়। তার মন এই আনন্দেই ভরপূর যে, সে ম'রে গিয়ে ঠকে নি। এই সব ধারণা নিতান্তই গ্রাম্য, তবু কলহের প্রয়োজন নাই। মৃত্যুকে হাসিমুখে বরণীয় ব'লে ভাববার একটা কায়দা যে সে বের কত্তে পেরেছে, তার জন্য বরং তাকে প্রশংসা কর। যুদ্ধক্ষেত্রে মারা গেলে সঙ্গে সঙ্গে সে স্বর্গে যায়, এ বিশ্বাস সকল দেশের স্বদেশ-প্রেমিকদের মনে আছে। যুদ্ধমান দুই পক্ষই ত' মনে করেন যে, তাঁরা সত্য, ধর্ম্ম ও ন্যায়ের জন্য লড়ছেন আর বিরুদ্ধচারীরা মিথ্যা, অধর্ম্ম ও অন্যায় ক'রে আস্‌ছে। জিজ্ঞাস্য এই যে, দুই পক্ষেরই স্বর্গলাভ হবে কি? কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধে দুই দলের যত লোক প্রাণ দিলেন, তাঁদের সবাইকে কি যুধিষ্ঠির নরকে দেখ্‌তে পান নি? যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলেই স্বর্গ হয়, এই ধারণা কি তা হ'লে অমূলক?

সার্থক প্রাণদানের শিক্ষা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এস আমরা ভগবানের চরণে প্রার্থনা জানাই যে, মানুষ যেন এমন ভাবে প্রাণদান কত্তে শিক্ষা কত্তে পারে, যে ভাবে প্রাণ দিলে স্বর্গ বা অন্তহীন ভগবদাশীর্ব্বাদ প্রত্যেকের প্রাপ্য হ'তে পারে। নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থের সেবা করার জন্য সমগ্র জীবন আমরা প্রবৃত্তির দাসত্ব ক'রে বেড়াচ্ছি। তাই মৃত্যুকালে আত্মপ্রসাদ নিয়ে মহাপ্রস্থান

কত্তে পারি না। অর্থাৎ স্বর্গসুখ আমাদের করায়ত্ত হয় না। সার্থক ভাবে প্রাণদানের শিক্ষা আমাদের পাওয়া প্রয়োজন।

পরলোক-প্রস্থিতের প্রতি কর্ত্তব্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এস আমরা ভগবানের চরণে প্রার্থনা জানাই যেন তিনি প্রতিটি পরলোক-প্রস্থিতকে পৃথিবীতে পুনরাগমনের পূর্ব্বে যেন এমন কিছু করেন, যাতে তারা পুনরায় জন্মগ্রহণ করার ফলে অধিকতর সাত্ত্বিক ও ঐশ্বর্য্য নিয়ে আবির্ভূত হ'তে পারে। জগন্মঙ্গল সাধন তাদের লক্ষ্য যেন হয় জন্ম থেকেই। জগন্মঙ্গল সাধনের জন্য তৈরী হ'তে থাকার আমাদের এই কর্ত্তব্যটির সামাজিক ভাষায় নাম হচ্ছে শ্রাদ্ধ। একজনের শ্রাদ্ধ সেই একজনেরই কুশলপ্রদ নহে। ত্রিভুবনবাসী সকলের কুশল।

পুপুন্‌কী আশ্রম
২রা অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৩৪৩
(১৭ই নবেম্বর, ১৯৩৬)

বিক্রমপুর ভ্রমণের প্রস্তাব

এখনই পূর্ব্ববঙ্গ-ভ্রমণে বাহির হইবার কথা ছিল। ঢাকা ব্রাহ্মণ-সভার সভাপতি ও সম্পাদক মহাশয়েরা ঢাকা জেলার আঠারটী গ্রাম এবং ফরিদপুর জেলার নয়টী গ্রামে ভ্রমণ-

তালিকা করিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবামণি সম্মতি দান করিয়াছিলেন কিন্তু হৃৎপিণ্ডে একটা আকস্মিক বেদনার সঞ্চার হওয়াতে এখনই রওনা হইতে চিকিৎসকগণ কালপ্রতীক্ষা করান। বিশেষতঃ আশ্বিন কার্ত্তিক মাসেই বিক্রমপুরের অধিকাংশ স্থানে নৌকাপথে ভ্রমণ সুবিধাজনক বলিয়া ঐ সময়েই যাওয়া উচিত ছিল। এখন গেলে অনেক স্থানে পায়ে হাটিতে হইবে। শ্রীশ্রীবাবামণির এই সময়েই হৃৎপিণ্ডের বেদনাটা অত্যন্ত বাড়িয়া যায়।

গোধন-আন্দোলন

আর একটা কারণেও হৃৎপিণ্ডের অসুখটা বাড়িতে থাকে। গত তিন চারি বৎসর ধরিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি এই অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া মানুষকে কেবল প্রেরণা দিয়াছেন,—

(১) গরুর গোবর দগ্ধ করিয়া ফেলিও না, তাহাকে সারে পরিণত করিয়া ক্ষেতের কৃষিতে লাগাও,

(২) নবজাত গোবৎসকে অযত্ন করিও না, তাহাকে শৈশব-কালে প্রচুর মাতৃদুগ্ধ সেবন করিতে দাও,

(৩) গর্ভবতী ও পয়স্বিনী গাভীর স্বাস্থ্যকে অবহেলা করিও না, তাহাকে প্রচুর খাদ্য, পানীয় ও যত্ন যোগাও,

(৪) গোধনই গৃহস্থের প্রথম ধন, কৃষিক্ষেত্র দ্বিতীয় ধন, নগদ টাকা গৌণ ধন।

(৫) জীবনের সব চেয়ে বড় ধন হইতেছে, নিজ নিজ চরিত্র-ধন।

(৬) তোমরা প্রত্যেকে এই সকল ধনে ধনী হইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা কর। দারিদ্র্যের কবল হইতে মুক্তি লাভের গোধনই প্রকৃত সোপান।

তিনি নিজে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া এভাবে কাজ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। প্রচুর টাকা-পয়সা খরচ করিয়া কোথাও কোথাও দুই একটা মস্ত বড় সভাও করিয়াছেন। অথচ এই সকল ব্যয়-সঙ্কুলানের জন্য কাহারও কাছ হইতে অর্থ-সংগ্রহের চেষ্টা মাত্রও করেন নাই।

এই আন্দোলনের ফলে বিভিন্ন গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে বেশ একটা সাড়া জাগিবার পরে এবং তাঁহাদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ জাগিয়াছে বলিয়া অনুভব করিবার পরে শ্রীশ্রীবাবামণি বিহারের রাজধানী পাটনাতে সরকারী কর্ত্তাদের নিকট আবেদন করিলেন যে, অযাচক আশ্রমকে একটী গোশালা পরিচালনের জন্য পঁচিশ হাজার টাকা ঋণ-স্বরূপ দেওয়া হউক। এই ঋণ প্রতি বৎসর পাঁচ হাজার টাকা করিয়া দিয়া পাঁচ বৎসরে পরিশোধ করা হইবে। আশ্রমের সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া ইহার পূর্ব্বে জেলা-কর্ত্তৃপক্ষের কাছ হইতে দুই দুইবার জমির উন্নতি সাধনের ঋণ লওয়া হইয়াছে, এবং টাকা নির্দ্দিষ্ট মেয়াদের অনেক পূর্ব্বেই পরিশোধ করা হইয়াছে শ্রীশ্রীবাবামণির লিখিত পুস্তকের আয় দিয়া। সুতরাং গোশালা সম্পর্কিত ঋণও শোধ করিতে আশ্রমকে বেগ পাইতে হইবে না।

বলা বাহুল্য, সরকারী নীতি অনুসারে আশ্রমটী দেখিবার

জন্য পর পর জেলা-কৃষি-পর্য্যবেক্ষক, জেলার সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট, লাইভ-ষ্টক-ডিরেকটার আদি বিভিন্ন রাজকর্ম্মচারী ধূমধাম করিয়া আশ্রম দেখিয়া গেলেন। কেহ কেহ দুইবার, তিনবারও আসিলেন। তাঁহারা দেখিলেন,—গরুর থাকিবার জন্য পাকা ইটের দেওয়াল যুক্ত ৭৫ ফুট লম্বা টিনের ঘর তৈরী হইয়া গিয়াছে, পশুদের মূত্রগুলি নিরাপদে একদিকে বাহির হইবার প্রণালী চমৎকার ভাবে নির্ম্মিত রহিয়াছে, ঘাস কাটিবার নূতন যন্ত্র আসিয়া গিয়াছে, পঞ্চাশটী গরুকে কাঁচা ঘাস খাইতে দিবার জন্য প্রায় বিশ পঁচিশ বিঘা জমিতে গিনি ঘাস ও নেপিয়ার ঘাস সৃষ্টি করা হইয়াছে, গাভীদের স্নান ও পানের জন্য একটী বড় ও একটী ছোট জলাশয় কাটা হইয়াছে। সবাই বলিয়া গেলেন, "হইবে, আপনাদের হইবে, আপনাদের হইবে না ত' কাহার হইবে? হয়ত ঋণের টাকা মকুবও হইয়া যাইবে।" শ্রীশ্রীবাবামণি করজোড়ে বলিলেন,—ঋণ পাইয়া সেই টাকা শোধ না করিয়া দানরূপে গ্রহণ করিব, এত নীচে আমরা নামিতে পারিব না।

পাটনা হইতে বেসরকারী সূত্রে আশ্রমে খবর আসে যে, সবই প্রায় হইয়া গিয়াছে। কৃষিমন্ত্রী এই ব্যাপারে খুবই আগ্রহী। হিসাবটা বাজেট-ক্লার্কের হাতে গিয়াছে। এই সময়ে অন্য কোনও রকমের বাধা হঠাৎ যাহাতে না হইয়া বসে, তাহার জন্য একটু গণ-আন্দোলন দরকার।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দুএকজন বিজ্ঞ লোককে

জিজ্ঞেস ক'রে দেখি। সরকারের কাছে আবেদনমূলক কোনো আন্দোলন ত' এযাবৎ চালাই নি, চালিয়েছি স্বাবলম্বনের আবেদন। লোককে নিয়ে শোভাযাত্রা ক'রে স্লোগান শুনিয়েছি, "কর্ম্ম দাও, কর্ম্ম দাও, ভিক্ষা চাই না, কর্ম্ম দাও।"

তথাপি কয়েকটী গ্রামের প্রধানেরা আসিয়া উৎসাহ দিতে লাগিলেন। সুতরাং গ্রামে গ্রামে পায়ে হাটিয়া গিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লগিলেন,—গোপালনের জন্য সবাই আগ্রহী হও এবং সরকারের নিকট একটী গোশালা প্রতিষ্ঠার আবেদন জানাও।

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি কুমড়ী গ্রামে সভা করিতেছেন। সভাপতি করা হইল শ্রীযুক্ত হাড়িরাম মাহাতোকে।

ভারতীয় সভ্যতার মূল গোমাতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভারতীয় সভ্যতার মূল গোমাতা। একদিন হঠাৎ আর্য্যদের খাদ্যান্বেষণের প্রয়াস-পথে গাভী এসে দেখা দিল। তাঁরা তাকে বন্দিনী ক'রে ঘরে এনে রাখলেন এবং শ্যামল তৃণ খেতে দিলেন। দুচার দিনে গাভী পোষ মান্‌ল। ছেড়ে দিলেও গৃহস্থের ঘরে আবার সে ফিরে আসে, চিরতরে চ'লে যায় না। সে মলত্যাগ কর্ল, সেই মলকে আবর্জ্জনা ভেবে গৃহস্থ গৃহাঙ্গন থেকে তা দূরে নিয়ে ফেল্‌ল। কয়েক মাস পরে গৃহস্থ দেখ্‌তে পান যে, সেই আবর্জ্জনার

স্তূপে এক একটা মোটা মোটা গমের গাছ, হৃষ্টপুষ্ট যবের গাছ উঠেছে। গৃহস্থ সারের উপযোগিতা ও ব্যবহার শিখ্‌ল। যাযাবর জাতি হঠাৎ এক স্থিতিশীল সভ্যতার জনক হ'ল। ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার গোড়া-পত্তন হয়েছে ত' এই ভাবে। তাই আমরা গোকে পশু বলি না, বলি গোমাতা। তাই আমরা গরুকে হত্যা করি না, হত্যা করা পাপ মনে করি। সেই গোজাতি আজ অবহেলিত। তোমাদের সবাইকে নিজ নিজ সাংসারিক কর্ত্তব্য-হিসাবেও গোজাতির উন্নতির জন্য চেষ্টা কত্তে হবে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— আমার টাকা নেই। নইলে আমি এখনি গোধনের উন্নতির জন্য পাটনা, ভাগলপুর বা হরিয়ানা থেকে পঞ্চাশটী পয়স্বিনী গাভী এনে কাজ শুরু ক'রে দিতাম। টাকা নেই ব'লে ধার চেয়েছি। ধার আমি যত দ্রুত পারি, শোধ ক'রে দেব। আমি মূর্খ লোক হ'লেও আমার লিখিত বই বিক্রী ক'রে বৎসরে একটা মোটা টাকা আমি পাই সুতরাং ধার শোধ কত্তে আমার ক্লেশ হবে না। যদি গোশালা আমি কত্তে পারি, তবে তোমাদের জন্য আমি কি কাজ কর্ব্ব, তা বল্‌তে দোষ নেই, মাদী বাছুরগুলি মায়ের দুধ ছাড়লেই সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের মধ্যে বিলিয়ে দিব। প্রত্যেক বাছুরের খৈল-খরিদ বাবদ পাঁচটী করে টাকা মাসে মাসে পাবে। বাছুর সঙ্গত মত বড় হ'য়ে গেলে ঐ বাছুরের বাজার দাম যা হ'তে পারে, তার অর্দ্ধেক টাকা তোমাকে পরিশোধ ক'রে আমি তাকে নিজের আশ্রমে নিয়ে আস্‌ব। তোমাদের

দায়িত্ব থাক্‌বে বাছুরকে খড় ও সবুজ ঘাস খাইয়ে তাজা রাখা। অর্থাৎ এভাবে আমি তোমাদের মধ্যে গরুর যত্ন করার অভ্যাসকে কায়েমি কত্তে চাই। সুতরাং তোমরা সরকারের কাছে আবেদন কর যে, এই অঞ্চলে একটী গোশালা চাই। একটী পশুচিকিৎসালয় চাই।

পুপুন্‌কী আশ্রম
১৫ই অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৩৪৩
(১লা ডিসেম্বর, ১৯৩৬)

দশটা বিভিন্ন গ্রামে গোধন-আন্দোলনের সভা করিয়া অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি খড়্‌খড়ি রেলষ্টেশনের সংলগ্ন মঙ্গলের হাটে আসিয়াছেন সভা করিতে। কালাপাথরের শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ চক্রবর্ত্তী সভাপতিত্ব করিলেন এবং খোট্টা ভাষায় বক্তৃতা দিলেন পুপুন্‌কীর শ্রীনগেন্দ্র নাথ হালদার।

নগেন্দ্র নাথের চমৎকার খোট্টা বুলি শুনিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, নগেন, আমার যদি টাকা থাক্‌ত, তবে তোমাকে বক্তৃতা বিদ্যাটা শিখিয়ে নিয়ে গ্রামে গ্রামে খোট্টাই ভাষায় প্রচার-কার্য্য চালাতাম। তুমি কর দারুণ পরিশ্রমের কাজ, আর তাই দিয়ে সংসার চালাও। তোমাকে যে আমার কাজে আসতে বল্‌তে সাহস পাই না।

গ্রাম্য ভাষা শিখিতে হইবে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গ্রামের লোকের ভিতর কাজ কত্তে হ'লে গ্রাম্য ভাষা শিখ্‌তে হয়।

মৃত্যুভয় নাই

শ্রীশ্রীবাবামণি ত্রিপুরা জেলান্তর্গত সূচীপাড়া-নিবাসী জনৈক সমালোচক যুবককে পত্রোত্তরে লিখিলেন,—"বৃথাই আমি জীবন ভরিয়া বীর বাণী প্রচার করিয়া যাই নাই। আমি যাহা বলিয়াছি, জীবনের ধর্ম্মে বলিয়াছি, সাহিত্যের ধর্ম্মে বলি নাই। আমি যাহা লিখিয়াছি, হৃদয়ের স্পন্দনে লিখিয়াছি, কল্পনার কাকলী গ্রথিত করি নাই। আমার লেখনী সহস্র জনের মৃত্যুভয় দূর করিয়াছে, কারণ, আমার মৃত্যুভয় নাই।"

মৃত্যুভয় কেমনে দূর হয়

একজন প্রশ্ন করিল,—মৃত্যুভয় কেন হয়?

উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মৃত্যুভয়ের আসল কারণ, ঈশ্বরে অবিশ্বাস। যাঁহাকে প্রত্যক্ষ করা হয় নাই, তাঁর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস আসা কঠিন। তারই জন্য ভয়কাতর মানুষের পক্ষে শ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে ঈশ্বরকে দর্শনের জন্য দৃঢ়-সঙ্কল্প ক'রে সাধনে লেগে যাওয়া। যাঁকে প্রত্যক্ষ করিনি, তাঁকে দেখার সংকল্প কত্তেও গোড়ায় একটু সরল বিশ্বাস, একটুখানি সহজ বিশ্বাস, এককণা নির্ব্বিচার বিশ্বাসের প্রয়োজন। সেটা যেন অঙ্কশাস্ত্রের এক্স্ (X), দূরবর্ত্তী চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছবার জন্য একটা স্বাভাবিক স্বীকারোক্তি। তাকেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বীজমন্ত্র ব'লে আখ্যাত করা হয়। জন্মজাত সংস্কারের ন্যায় মানুষের সহজাত বিশ্বাস ঘনিষ্ঠ ও একনিষ্ঠ সেবা পাওয়ার ফলে দীর্ঘকালে, আস্তে আস্তে প্রত্যক্ষের আলো-

রেখারূপে রূপবন্ত হ'য়ে উপলব্ধির দৃষ্টিতে ধরা দেয়। তখন সুদৃঢ় ঈশ্বর-বিশ্বাস আসে। তখন আর মৃত্যুভয় থাকে না। সেই অবস্থায় পৌছবার অন্য উপায়ও আছে, যথা স্বদেশপ্রেম। জলন্ত স্বদেশপ্রেম নিতান্ত ভীরু অতি দুর্ব্বল লোককেও অবহেলে প্রাণদানের সামর্থ্য যোগায়। নারায়ণ-জ্ঞানে নরসেবা বৈদান্তিক কর্ম্মযোগীর পক্ষে অভ্যন্ত পন্থা।

জাতিভেদ সম্পর্কে

আর একজন প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জাতিভেদ সম্পর্কে প্রতিবাদ এই ভারতবর্ষে অনেক কাল আগ থেকেই অনেকে ক'রে এসেছেন। তার মধ্যে বুদ্ধদেবের নামটি প্রধান। তিনি ও তাঁর কৃতী শিষ্যানুশিষ্যগণ যতগুলি লোককে এমন কি সামাজিক জীবনেও জাতিভেদ সংস্কার দূর করাতে, পরিত্যাগ করাতে সমর্থ হয়েছেন, এত অধিক আর কোন ধর্ম্ম-সংস্কারকের দ্বারা ঘটে নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিন চারিশত বৎসর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে বিস্তারিত হ'য়েও পরিশেষে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত থেকে লুপ্ত-প্রায় হ'ল। মানে, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় হ'ল। অর্থাৎ জাতিভেদ আবার ফিরে এসে ভারতবর্ষের ঘাড়ে চাপল। শঙ্করাচার্য্য জীবে জীবে ব্রহ্মত্ব প্রচার করেছেন। কিন্তু জাতিভেদ-প্রথার বিরুদ্ধে সম্ভবতঃ কোন শক্তি প্রয়োগ করেন নাই। তারপরে এল মুসলমানদের রাজত্ব। তারা প্রাণপণে হিন্দুকে মুসলমান করতে লাগলেন, কেউ সামাজিক সাম্যের

প্রভাবে, কেউ ব্যক্তিগত তপস্যার মহিমায়, কেউ নানা প্রলোভন-জালে জড়িয়ে এবং অধিকাংশ স্থলেই মারাত্মক দুর্য্যোগ সৃষ্টি ক'রে প্রাণদণ্ডের ভয় দেখিয়ে। হোল অনেকে মুসলমান, কিন্তু হিন্দুরা ত' জাতিভেদ ত্যাগ করল না। জাতিভেদ-সংস্কার হিন্দুর যেন আড়ষ্ট দেহকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল। আধুনিক যুগে রাজা রামমোহন বললেন, জাতিভেদ ভুল, ব্রাহ্ম-সমাজ বললেন, জাতিভেদ বর্জ্জনীয়। দু'চারশ অসবর্ণ বিবাহ হ'য়েও গেল, কিন্তু জাতিভেদ গেল না। জাতিভেদের বিরুদ্ধে স্বামী বিবেকানন্দ তারস্বরে তাঁর ঘোষণা শোনালেন, আমরা হিন্দুরা করতালি-ধ্বনি করলাম এবং মহোৎসবাদিতে প্রকাশ্যে সবজাতি মিলে এক পংক্তিতে ব'সে কখনও খিচুড়ী খেলাম, কখনও পায়েস খেলাম, কখনও মালপোয়া খেলাম। এতে ছুৎমার্গ গেল কিন্তু জাতিভেদের কি হ'ল? সব মানুষ মিলে একটা জাতি, এ ত' দেখতে পেলাম না। সমগ্র ভারতবর্ষে পৌনে ষোল আনার অধিক লোক শূদ্র বা শূদ্রাধম, সিকি আনা বা তারও কম লোক ব্রাহ্মণ। এক পংক্তিতে ব'সে ভোজন করা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য পাঁচ শত বৎসর আগে শিখিয়ে গেছেন। আমরা তারপর আর কতটুকু এগিয়েছি। এগুলি নিশ্চয়ই সকলের বিচার্য্য-বিষয়।

ব্যাপক অসবর্ণ বিবাহ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ব্যাপক ভাবে অসবর্ণ বিবাহ

চালু হ'লেই কি জাতিভেদ যাবে? অসবর্ণ বিবাহের ব্যাপক প্রচলনের দ্বারা সব জাতিকে মিলিয়ে একটা জাতিতে পরিণত করা প্রত্যক্ষ-রূপে একটা জান্তব পদ্ধতি। এর ফলে সমাজের জান্তব ঐক্য নিশ্চয়ই স্থাপিত হবে কিন্তু প্রকৃতিগত গুণভেদকে দূর করা যাবে না। যে সর্ব্বপ্রকার সদ্‌গুণে শ্রেষ্ঠ, সে-ই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ কথাটাই এমন একটা শব্দ, যা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে মনে দিব্যভাবের উন্মেষ হয়। সেই ব্রাহ্মণ আমরা প্রত্যেকে হব, সেই বোধ, সেই উজ্জীবনা, সেই উদ্দীপনা, সেই অধ্যবসায়, সেই নিষ্ঠা, সেই একাগ্রতা, সেই নির্লোভতা, সেই নিষ্কামতা আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে এসে গেলে জাতিভেদ-বুদ্ধি দূর হ'তে কতক্ষণ? তারই উপায় অন্বেষণ করা প্রয়োজন। আমি আমার জীবনে যা কিছু করছি, তা সেই উপায়েরই অনুশীলন ও পরিশীলন। আমার দীক্ষাদান-পদ্ধতি, আমাদের উপদিষ্ট উপাসনা-প্রণালী অনুধাবন না করলে চট্ করে একথাটা সাধারণে বোধ্যগম্য হবার নয়। নিজেদের দীক্ষা-প্রণালী নিয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা আমাদের রীতি নয়, এই জন্য নিঃশব্দ আছি। তথাকথিত নিম্নবর্ণের লোকদিগকে ভাল ভাল চাক্‌রী বা অন্য রূপ নানাবিধ আর্থিক ও ব্যবহারিক সুযোগ প্রদান ক'রে কিছু দরিদ্রের উপকার করা হবে সত্য কিন্তু তাতে জাতিভেদ দূর হবে না। জাতিভেদ কি ক'রে দূর হবে, তার উপায় অন্য স্থানে। দ্বিবেদী-ত্রিবেদী, শর্ম্মা-মুখার্জ্জী, মিশ্র-ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির পুত্রকন্যাকে চর্ম্মকার, রজক, ক্ষৌরকার, ঝাড়ুদার, ভুইমালী, কপালি আদি নানা স্তরের বংশের কন্যা

ও পুত্রদের সঙ্গে বিবাহ দিলেই জাতিভেদ যাবে না। ভারতবর্ষে জাতিভেদ দূর করতে হ'লে প্রত্যেককে ব্রাহ্মণ্য-সংস্কারে ব্রাহ্মণোচিত সাধনায় ব্রাহ্মণযোগ্য চিন্তায়, বাক্যে ও আচরণে দক্ষ ক'রে তুলতে না পারলে জাতিভেদ যাবে না। আমি সেই দিকেই আমার কর্ম্মপ্রচেষ্টাকে প্রধাবিত করেছি। কিন্তু মনে রাখা দরকার, আমি একটি প্রাণীকেও ডেকে এনে দীক্ষা দেই না, "এসো দীক্ষা নাও" একথা আমি কাউকে বলি না। আমি বিশ্বাস করি, ধর্ম্ম-বলেই ভারত নিজেকে সুসংস্কৃত করবে, কৌশলের দ্বারা নয়।

পুপুন্‌কী আশ্রম
২০শে অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৩৪৩
(৬ই ডিসেম্বর, ১৯৩৬)

আশ্রম তোমার, তুমি আশ্রমের

শ্রীশ্রীবাবামণি অদ্য কলিকাতা রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটের অধিবাসিনী এক ধর্ম্মকন্যাকে লিখিলেন,—"তুমি ঠিকই বলিয়াছ। আশ্রম ত' তোমাদেরই ভবিষ্যতের এক দিব্য মহাজাতি, বহু তপস্বী ও তপস্বিনীর ত্যাগের ভিতর দিয়া আবির্ভূত হইবেন। আমার আশ্রম-প্রয়াস তাহারই ভূমিকা মাত্র। ভগবৎ-পাদপদ্মে ব্যক্তিগত সুখ, ব্যক্তিগত স্বার্থ, ভয়-ভাবনা সম্যক্ বিসর্জ্জন দিয়া যে আসিবে, সেই আশ্রমের হইবে,

আশ্রম তার হইবে। জগতের কোটি কোটি নরনারীর অপরিসীম অসহনীয় দুঃখরাশি দর্শনে মথিত-ব্যথিত-চিত্ত হইয়া যে আসিবে, আশ্রম তার, সে আশ্রমের। আমি অন্তর ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করি, যেখানে যে আছে আমার পুত্র ও কন্যা সকলেই আশ্রমের হউক, আশ্রম সকলের হউক। গৃহী গার্হস্থ্য-আয়তনে বসিয়া আশ্রমের হউক, আশ্রমকে নিজের করুক। সন্ন্যাসী বৃক্ষতলে বসিয়া আশ্রমের হউক, আশ্রমকে নিজের করুক। পুরুষ বা নারী নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়া আশ্রমের হউক, আশ্রমকে নিজের করুক। কুমারী তার কৌমার্য্যের দিব্য সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া, সধবা তার মাতৃমূর্ত্তির স্নিগ্ধ মাধুর্য্যের মধ্য দিয়া, বিধবা তার সর্ব্বত্যাগ-সাধনার অপূর্ব্ব পবিত্রতার মধ্য দিয়া আশ্রমের হউক, আশ্রমকে আপন করুক। * * * প্রেমের পবিত্রতা সকল দূরকে নিকট করুক, সকল পরকে আপন করুক, সকল অনাথকে জগন্নাথের চরণচ্ছায়ার পূর্ণাধিকারী করুক। শুভাশীষ জানিও।"

শ্বাসে-প্রশ্বাসে নামজপ

জনৈক আগন্তুকের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নামজপ করার বহুবিধ প্রণালী আছে। তার মধ্যে কতকগুলি খুবই উৎকট, কতকগুলি অত্যন্ত শ্রমবহুল, কতকগুলি স্বল্পায়াস-সাধ্য, কোনো-কোনোটা স্বাভাবিক। শরীরের নানা প্রকার আকুঞ্চন ও প্রসারণের সুনির্দ্দিষ্ট পদ্ধতির

সঙ্গে সঙ্গে নামজপ করাকে আমি কঠিন বা উৎকট আখ্যা দিচ্ছি। ঐগুলির অনুসরণে নামজপের আসল উদ্দেশ্য যে চিত্তপ্রশান্তি, তা হ'লেও হ'তে পারে কিন্তু শরীরের নানা প্রকার বিক্ষেপের দরুণ মন বহির্গামী হয়। করে জপ করা, মালায় জপ করা তার চেয়ে অনেক সহজ পথ। কিন্তু তার চেয়েও স্বাভাবিক হচ্ছে শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম স্মরণ করা কিন্তু শ্বাসে-প্রশ্বাসে জপ কত্তে যাদের কষ্ট হবার কথা, যেমন শ্বাস-রোগী, বা গর্ভবতী নারী বা রুগ্ন ব্যক্তি, তাদের পক্ষে শ্বাসে-প্রশ্বাসে নামজপ ছেড়ে ঐ অসুবিধার সময়টায় ছোট্ট একটী মালার সাহায্যে নামজপ চলতে পারে। শ্বাসে-প্রশ্বাসে নামজপ কত্তে হ'লে নীরবে তা কত্তে হয়। আওয়াজ কত্তে নেই। কিন্তু যার পক্ষে কোনও কারণে শ্বাস-প্রশ্বাসে জপ কষ্টকর হবে, সে ওষ্ঠ দ্বারা নাম উচ্চারণ ক'রে মালা বা করের সাহায্যে জপ কত্তে পারে। তবে ঠোঁট নড়লেও আওয়াজ যেন না হয়। অন্যে যেন তার নামোচ্চারণ শুনতে না পায়, এইটুকু দেখ্‌তে হবে।

মাতাপিতার কলহে সন্তানের কর্ত্তব্য

অপর এক প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মাতা ও পিতা যেখানে বিবদমান, জনকে ও জননীতে যেখানে কলহ, সেখানে সন্তানের কর্ত্তব্য কি, এই প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক নয়। কারণ, বর্ত্তমান যুগে পত্নীর পাতিব্রত্য

এবং সহধর্ম্মিণীর প্রতি পতির বিশ্বস্ত থাকার কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে প্রাচীন ধারণার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটেছে। স্ত্রী যদি দাবী করে, "স্বামী আমার বন্ধু বা সঙ্গী মাত্র, আর কিছুই নয়", স্বামী যদি দাবী করে, "স্ত্রী আমার ভোগসঙ্গিনী মাত্র, তার প্রতি আমার অন্য কোনও দায়িত্ব নেই", তাহ'লে তাদের দুজনের মধ্যে বর্গ বা মিল খুব কম স্থলেই সম্ভব হ'তে পারে। কিন্তু স্ত্রীর উপরে স্বামী যেখানে অপ্রসন্ন, সেখানে ভৃগুমুনি অনায়াসে পরশুরামকে মাতৃহত্যার আদেশ দিতে পার্ল্লেন এবং পরশুরামও সে আদেশ নির্ব্বিচারে পালন কর্ল্লেন। এক্ষেত্রে পরশুরামের বুদ্ধি-বিবেচনার কোনও আবশ্যকতা অনুভূত হয় নাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মা রেণুকা যদি পুত্র পরশুরামকে আদেশ দিতেন,—"পিতৃহত্যা কর", তাহ'লে পরশুরামের মতন বশংবদ পুত্রের কি করণীয় ছিল, বল ত'? মাতৃহত্যার ঠিক পরেই তিনি নিশ্চয়ই পিতৃহত্যা-রূপ পবিত্র কাজটুকু সম্পাদন ক'রে তবে ছাড়তেন। ভীষ্ম ও কর্ণের অস্ত্র-গুরুর পক্ষে অন্য কোনও পথ উন্মুক্ত থাক্‌ত কিনা, সন্দেহ। কিন্তু আমি যদি পরশুরাম হ'তাম, তবে আমি পিতা এবং মাতা এই দুই জনেরই পায়ে লুটিয়ে পড়ে প্রার্থনা করতাম, 'হে পিতা ক্রোধ সম্বরণ কর, হে মাতা ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, ক্ষমা কর।' বিবদমান পিতামাতার সম্মুখে পুত্র ও কন্যা যে কত অসহায়, তা বল্‌তে নেই।

দাম্পত্য ব্রহ্মচর্য্য

তৃতীয় এক ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি

বলিলেন,—দাম্পত্য ব্রহ্মচর্য্য-পালন একটা অসাধ্য ব্যাপার, বিবাহিত জীবনে ইন্দ্রিয়-সংযম একটা অলীক ধারণা, ইত্যাদি কথা কিছু কাপুরুষের মুখে সব সময়েই শুনতে পাবে। কিন্তু যাঁরা নিজেরা গার্হস্থ্য জীবন গ্রহণ ক'রেও প্রাণপণে ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন, এমন লোকের সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু তোমরা জান না। জান না এই কারণে যে, প্রকৃত সাধক তাঁর ব্রহ্মচর্য্যের কথা বাইরে কখনো প্রকাশ করেন না। বাইরে এই ব্যাপার নিয়ে জন-গুঞ্জন সৃষ্টি হ'লে অভিমান আর অহঙ্কার এসে সাধকের বলহানি ক'রে দিয়ে যায়। ব্রহ্মচর্য্য-পালকেরা নিজেদের জয়ডঙ্কা বাজান না ব'লেই যে তাঁরা নেই বা তাঁরা দিনের পর দিন সংখ্যায় বাড়ছেন না, এরূপ মিথ্যা ধারণা মনে রেখো না। আমার মতন ক্ষুদ্র এক ব্যক্তির প্রচারণায় যদি কিছু কিছু লোক এই পথের পথিক হ'য়ে থাকেন, তবে দেশব্যাপী প্রচারণার উৎকৃষ্ট আবহাওয়া পেলে তাদের সংখ্যা কল্পনাতীত ভাবেই বাড়বে, এই বিশ্বাস অন্তরে পোষণ করার পক্ষে হাজার কারণ রয়েছে।

সমাজ-সংস্কারিতা বুদ্ধি ও সমাজসেবা

চতুর্থ এক ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অনেকের মনে সমাজসেবার আগ্রহ অত্যন্ত প্রবল। এই বিষয়ে তাঁরা অনেক ভাবনা-চিন্তা করেন। বিবেচনা ক'রে

দেখেন যে, এই সব ভাবনা-চিন্তা যদি শত শত মানুষের মনে সঞ্চারিত ক'রে না দেওয়া যায়, তাহ'লে এই ব্যাপারে আবশ্যকীয় কর্ম্মস্পৃহা জাতির মনে জাগ্‌বে না। ফলে তাঁরা কোনও একটা সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রচার কত্তে থাকেন। এই পর্য্যন্ত ব্যাপারটা খুবই স্বাভাবিক এবং খুবই সুন্দর। কিন্তু তাঁরা যদি তাঁদের প্রচারণী বক্তৃতায় বিষয়বস্তু নির্দ্ধারণ করেন "চাদর-নিবারণ" তবে তা কতটা প্রশংসনীয় হবে, তা বিবেচ্য। গঙ্গা-স্নান বা নিরামিষ-আহারে আজকাল খুব কম লোকেরই রুচি, সারাদিন মন্দিরে ব'সে চখ বুজে ঠাকুরের নামজপ আজকাল খুব কম লোকেই করেন। এগুলি সবই ধর্ম্মের বাহ্যাড়ম্বর মাত্র ব'লে বিবেচনা ক'রে যদি সমাজ-সংস্কারকেরা মন্দির-গমনোন্মুখ বা গঙ্গাস্নানে ইচ্ছুক বা নিরামিষাহারে অনুরক্ত ব্যক্তিদের "ধর্ম্মধ্বজী" নামে খোঁটা দিয়ে বিরত কত্তে চায়, তবে জান্‌বে, এর চেয়ে অনেক বেশী লোক অনেক বেশী বড় বড় পাপ যা ক'রে থাকে, যা তার প্রতীকারের চেষ্টার জন্য অবসর পাবার সুযোগ এরা নষ্ট কচ্ছে। যারা অনেক দামী কাজ কত্তে পাত্ত, তারা নিতান্ত সস্তা কাজে সময়ক্ষেপ ক'রে সমাজের হিত-সম্ভাবনা কমিয়ে দিচ্ছে। গঙ্গাস্নানে কোনও পুণ্য হয় না, একথা ব'লে বেড়াবার চাইতে অনেক বেশী ভালো কাজ হচ্ছে লোককে ভাল ভাবে, সুন্দর ভাবে, নিখুঁত ভাবে, পরিচ্ছন্ন ভাবে স্নান কত্তে শিক্ষা দান করা। চাদর-নিবারণী সভায় বক্তৃতা দিয়ে সময় নষ্ট না ক'রে তারা অনায়াসে অসংযম-নিবারণী-সভার প্রচার কত্তে

পারে এবং তাতে সমাজের বেশী কুশল হয়। মন্দিরে গেলে পুণ্য হয় না, বলার চেয়ে তাসের আড্ডা, চায়ের আড্ডা, জুয়ার আড্ডা থেকে দূরে থাকার জন্য উপদেশ দান সমাজের পক্ষে অধিকতর মঙ্গলদায়ক। সমাজের যাবতীয় গ্লানির বিরুদ্ধে কথা বলার প্রত্যেকেরই সমান অধিকার কিন্তু কথাই যখন বল্‌তে হবে, তখন সব চেয়ে বেশী জরুরী বিষয়ে কেন বল্‌ব না? আমার মতে নারী-পুরুষ, তরুণ-যুবক-বৃদ্ধ প্রভৃতি নির্ব্বিশেষে সাধ্যমত ব্রহ্মচর্য্য-পালনের অর্থাৎ সাধ্যমত ইন্দ্রিয় দমনের উপদেশ দেওয়ার চেয়ে বড় সমাজসেবা আর কিছু নেই। তোমরা যে যত দিকে যতটুকু পার, সেই লক্ষ্যেই কাজ কর। আমি সমগ্র জীবন এই একটী কাজই ক'রে যাব,—কর্‌ব চরিত্র-গঠন-আন্দোলন। গঙ্গা-স্নান কর আর না কর, ওটা গৌণ। আমিষ খাও আর নিরামিষ খাও, ওটাও গৌণ। জাতিভেদ মান, কি না মান, ওটাও গৌণ। চরিত্রই মুখ্য এবং সর্ব্বপ্রধান।

পুপুন্‌কী আশ্রম
২৭শে অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৩৪৩
(১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৩৬)

ঘাবড়াইও না

শ্রীশ্রীবাবামণি আজ তাঁহারি এক রোগক্লিষ্ট ছেলেকে লিখিলেন,—

"অর্থাভাব, অনটন, অসুবিধা বা অচিকিৎসা এসব কোন কিছুতেই ঘাবড়াইও না। আরোগ্য তোমার প্রয়োজন এবং ভগবান্ যদি তোমাকে দিয়া জগতের কোনও মহৎ কার্য্য সম্পাদন করাইতে চাহেন, তাহা হইলে আরোগ্য লাভ তুমি নিশ্চিতই করিবে। যদি আরোগ্য-দান তাঁর অভিপ্রেত না হয়, তবে শত ব্যাকুলতাও কাহাকেও রক্ষা করিতে পারিবে না। এই পরম সত্যে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া জীবনের প্রতি সকল মমতা পরিত্যাগ কর এবং আমি যে-ভাবে জীবনের দুই পরম-সঙ্কট-সঙ্কুল অবস্থাতে বাঁচিবার জন্য একবারও কামনা না করিয়া শুধু ঈশ্বরাভিপ্রায় প্রতীক্ষা করিয়াছিলাম, তুমিও তাহা কর। আজও আমার শরীর পুনরায় সঙ্কটের সীমান্ত-প্রদেশেই আসিয়া অপেক্ষা করিতেছে, তোমার প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিতে পারি নাই বলিয়া নিজ শরীরের দিকে তাকাইতে পারিতেছি না। কিন্তু বাঁচিবার বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষা রাখি না। স্বরূপানন্দ জগতে শত শত জন্মিয়াছে এবং মরিয়াছে তাহাতে জগতের কল্যাণ বাধে নাই। মানব-জীবনের মূল্য এত অধিক নহে যে, এই জীবনের জন্য আবার অন্তরে উদ্বেগ রাখিতে হইবে, শঙ্কা রাখিতে হইবে। ইহা যদি যাইবারই হয়, শত দুঃখের মধ্য দিয়াও ইহা যাউক। দুঃখ দেখিয়া সাধক কখনো ভয় পাইতে পারে না।

"শরীরকে সুস্থ রাখিবার জন্য যত দিক দিয়া সম্ভব দৃষ্টি রাখা তোমার কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা জীবনের প্রতি মমত্ব-নিবন্ধন নহে, জীবনের প্রতি কর্ত্তব্য-নিবন্ধনমাত্র। কর্ম্মের প্ররোচিকা

হইবে কর্ত্তব্যবুদ্ধি, আসক্তি নহে। চিকিৎসার প্রণোদিকা হইবে কর্ত্তব্য-বুদ্ধি, জীবনের প্রতি মমত্ব বোধ নহে।

"রোগের সময়ে দেহবুদ্ধি ও রোগের চিন্তা পরিহার করিয়া, অতীত-ভবিষ্যৎ ভুলিয়া যাইয়া সমগ্র চিত্তকে নিমজ্জিত কর ভগবানে। তাঁর পরে দেহ থাকিলে তাঁরই কাজ হইবে, না থাকিলে তাঁর জিনিষই যাইবে। নিজের উপর দায়িত্ববোধ আনিও না, নিজের উপর দায়িত্ব রাখে বলিয়াই রোগীরা স্রোতোজলে তৃণখণ্ড ধরিয়া তীরে উঠিতে চায়, আবার মহীরুহ অবলম্বন করিয়াও জলবেগ-দর্শনে হতাশ হয়। ভাল হউক, মন্দ হউক, সব কিছুতে উদাসীন হও এবং সকল দিক্ হইতে শুধু ঈশ্বরাভিপ্রায়ই দর্শন কর। মৃত্যু যদি ঈশ্বরাভিপ্রায় হয়, তবে তাহাই সানন্দে বরণীয়, আরোগ্য যদি ঈশ্বরাভিপ্রায় হয়, তবে তাহাই সাহ্লাদে গ্রহণীয়।"

পরিবেশ-পরিবর্ত্তনে কর্ত্তব্য

জনৈক প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এমন একটী স্থানে এতদিন ছিলে, যেখানে তোমার বিচারে যেটী জগতের শ্রেষ্ঠ সাধন-পদ্ধতি, তারই অনুকূল ভাবে উপাসনাদি কত্তে পেরেছ। এখন যেখানে এসেছ, সেখানেও ছাত্রাবাস-পরিচালকদের নিজস্ব উপাসনা-পদ্ধতি অনুসারে রোজ প্রার্থনাদি হয় কিন্তু তুমি তাহাতে আনন্দ অনুভব কর না। এটা তোমার ত্রুটি বা দোষ নয়, কারণ চিনি খেয়ে রসনা একবার মাতোয়ারা হ'লে আর গুড়ে তার রুচি থাকে না।

কিন্তু যাঁদের তত্ত্বাবধানে তুমি আছ, তাঁদের প্রবর্ত্তিত শৃঙ্খলা ভঙ্গ ক'রে চলা তোমার উচিত নয়। সুতরাং অন্য সময়ে তাঁদের প্রথানুযায়ী প্রার্থনাদিতে আনন্দ-সহকারে যোগ দেবে কিন্তু শয়নকালে নিজ বিছানায় ব'সে তোমার নিজের গৃহীত শ্রেষ্ঠ পন্থাতেই একাজটী সারবে।

পুপুন্‌কী আশ্রম
১৯শে পৌষ, রবিবার, ১৩৪৩
(৩রা জানুয়ারী, ১৯৩৭)

বহিরঙ্গ সাধন ও অন্তরঙ্গ সাধন

ত্রিপুরা রাজ্যান্তর্গত সোনামূড়া-নিবাসী জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"হাঁ" বাবা, বহিরঙ্গ সাধন অনেকটা চিত্ত-বিক্ষেপেরই কারণ হয়। অন্তরঙ্গ সাধনে মজিয়া যাওয়াই বড় কথা। কীর্ত্তন, আরতি প্রভৃতি অত্যন্ত বহির্ম্মুখ মনকে আংশিক অন্তর্ম্মুখ করে। কিন্তু অন্তর্ম্মুখ মন কীর্ত্তন, আরতি প্রভৃতি বহিরঙ্গ অনুষ্ঠানের দ্বারা চিত্ত-বিক্ষেপ অনুভব করে এবং অনেক স্থলে নিদারুণ ও নির্দ্দয় ভাবে নিপীড়িতই হয়। যাঁহারা কীর্ত্তন, আরতি প্রভৃতি করেন, তাঁহারা অত্যন্ত বহির্ম্মুখ মনকে অন্তর্ম্মুখ করিবার জন্যই তাহা করেন এবং মন অন্তর্ম্মুখ হইতে আরম্ভ করিলেই কীর্ত্তন আরতিও তাঁহাদের নিকট বিষবৎ মনে হয় এবং সচ্চিদানন্দ প্রেমরসে একেবারে নিঃশব্দে নিস্তব্ধ ভাবে নিঝুম হইয়া ডুবিয়া

যাইবার জন্য তাঁরা ব্যগ্র হন। আশীর্ব্বাদ করি, তদ্রূপই তোমার হউক। কীর্ত্তন-আরতিকারীদিগকে নিন্দা, অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা করিও না এবং মনের অত্যধিক বহির্ম্মুখ ও অসম্ভব চঞ্চল অবস্থায় তুমিও কীর্ত্তনারতি প্রভৃতি সদুপায়ের মধ্য দিয়া নিজেকে অন্তর্ম্মুখ রুচিসম্পন্ন করিতে প্রয়াস পাইতে দ্বিধাহীন হইও। যত উপায় আছে, সবই সদুপায়, যদি ঠিক প্রয়োজনের মুহূর্ত্তে অবলম্বিত হয়। আমাদের অবলম্বিত সাধন-পদ্ধতিকে আমরা সমবেত উপাসনাতে বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ উভয়বিধ সাধনার ক্রম কিছুটা রক্ষা করিয়াছি কিন্তু মৃদঙ্গ-করতাল লইয়া উদ্দাম নৃত্য বা পঞ্চপ্রদীপের আরতি-বাতি বা ধূনচি লইয়া আরতি-কার্য্য ইচ্ছা করিয়াই রাখি নাই। যাহা আমরা চিত্তবিক্ষেপ মনে করিয়া বা গৌণ ব্যাপার বলিয়াই রাখি নাই, তাহাকে উহার মধ্যে কেহ গুঁজিয়া দিতে চেষ্টা না করে, ইহা আমাদিগকে দেখিতে হইবে। অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা ঐ সব করেন, তাতে অশ্রদ্ধা করি না কিন্তু আমরা এই অকারণ হৈ-চৈকে যুক্ত করিয়া নিজেদের সমবেত উপাসনার তাৎপর্য্য নষ্ট করিতে পারি না।"

দীক্ষা লাভের পূর্ব্ববর্ত্তী জীবনাংশে করা মানসিক শোধ করার উপায়

জনৈক প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— দীক্ষা নিয়ে একটা সুনির্দ্দিষ্ট পন্থার আশ্রয় নিয়েছ। সুতরাং

দীক্ষা লাভের পূর্ব্বে যদি তুমি কোনও ঠাকুর-দেবতার কাছে কোনও কারণে কোনো মানসিক ক'রে থাক, তবে তার পরিশোধ তোমার নবগৃহীত পন্থার অনুকূল কোনও উপায়েই করা উচিত, চিরাচরিত পথে নয়। পাঁঠাবলি, মহিষ-বলি, ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক রকমের মানসিক তুমি ক'রে থাকতে পার, কিন্তু একমাত্র সমবেত উপাসনা দ্বারা সেই মানসিক শোধের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হ'তে পার। মানসিক করার সময়ে নিশ্চয়ই ব্যয়-বরাদ্দের একটা মোটামুটি ধারণা মনে মনে ক'রে নিয়েছিলে। সমবেত উপাসনটীতেও তার কাছাকাছি পরিমাণ ব্যয় স্বীকার কত্তে চেষ্টা ক'রো। অর্থাৎ পথান্তর মিলে যাওয়ায় তোমার ত্যাগের চর্চ্চাটা যেন না শিথিল হয়। দেবতাকে কোনও বিশেষ মানসিক করার মানেই হচ্ছে, কোনো বিষয়ে ত্যাগ বা সংযমের প্রতিজ্ঞা করা। সমবেত উপাসনা দ্বারা কাজ সেরে ফেলছ ব'লে ত্যাগ ও সংযমের বহরটা যেন কমিয়ে দেওয়া না হয়।

ঈশ্বর-বিশ্বাস ও জাতি

অপর এক প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সংসারে সহস্র বিপত্তিতেও টল্‌বে না, এইরূপ অভ্যাস কর। এ জিনিসটা অনুশীলন-সাপেক্ষ। একদিনের চেষ্টায় এই অভ্যাসটী প্রতিষ্ঠিত হয় না। ঝড়-ঝঞ্ঝা, বন্যা, মহামারী, ভূমিকম্প, মহাযুদ্ধ বা রাষ্ট্র-বিপ্লব অনেক লোকের

মনে পরমেশ্বরের প্রতি এক আনুগত্যের ভাব আনে বটে কিন্তু সেটা নিতান্তই ক্ষণিক এবং জল-বুদ্‌বুদের ন্যায় অস্থায়ী। তারই জন্য, উৎকোচ, অবৈধলাভ, কুৎসিত অনাচার, কদাচার-ব্যভিচার, প্রবঞ্চনা-প্রতারণা প্রভৃতির সুযোগ মিলা মাত্র মানুষ পরমেশ্বরকে ভুলে যায় এবং দেহেন্দ্রিয়াদিগকে সর্ব্বস্ব জেনে তাহার সুখ-সাধনে বিভোর হয়। যুদ্ধক্ষেত্রের অগণিত মৃত মানুষের শবগুলোর মাঝখানে উন্মত্ত কামুক, অসহায় নারীকে ধর্ষণ করছে, এ দৃশ্য পৃথিবীর অনেক দেশেই দেখা গিয়াছে। নৈতিক হিতবুদ্ধি-প্রদানের দ্বারা মানুষের ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তিকে স্তব্ধ ক'রে দেওয়ার চেষ্টা এসব ক্ষেত্রে খুব নির্ভরযোগ্য প্রতিকার নয়। মানুষের মনে ঈশ্বর-বিশ্বাস জাগিয়ে দিতে পারলে, তার মন সব সময় তাকে সর্ব্বশক্তিমান্ এক পরমেশ্বরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে ব'লে দিতে পারে যে, মানুষের এমন বিপদের দিনেও তাঁর অপমান করার কোনও অধিকার নেই। হাসপাতালে রোগিণীর উপর চিকিৎসক বা Medical শিক্ষার্থীরা কেউ কেউ দৈহিক উৎপীড়ণ করছে, এমন ঘটনা বিরল নয়। যাকে দেখলে করুণা হওয়া উচিত, তার প্রতি কামোন্মত্ততা মানুষের আসে কি ক'রে? এটাই তো একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার। রেল-ষ্টেশনে ছিন্নবস্ত্র-পরিহিতা যে রুগ্ন-মেয়েটি কামরায় কামরায় ভিক্ষা সংগ্রহ করে, তার প্রতি দয়া মায়ার ভাব না এসে, বলাৎকারের রুচি কি ক'রে মানুষের আসতে পারে? মাতৃহারা যে কচি মেয়েটি মাকে খুঁজতে খুঁজতে

অজানা শহরে অজ্ঞাত লক্ষ্যের দিকে কেঁদে কেঁদে ক্ষুধার্ত্ত জঠরে অবিরাম পথ-পরিক্রমা করছে, তার প্রতি কামার্ত্ত ভাব মানুষের আসে কি ক'রে? জাতীয় চরিত্রের মান অবনত হ'য়ে গেলে অপসম্ভাবনার বীজগুলো জনে জনের মনের ভিতরে বাতাসে উড়ে এসে উপ্ত হয়। তখন ছোটলোকেরা প্রকাশ্যে যা করে, বড় মানুষেরা গোপনে তাই করে। বড় মানুষদের অনেক টাকা সুতরাং তারা তাদের পাপকে ঢেকে রাখবার জন্যে আব্রু সৃষ্টির প্রয়োজনে অর্থ ব্যয় করতে পারে। ছোটদের অর্থ নাই; তাই তারা কিছু গোপন রাখতে পারে না এবং অনেক ক্ষেত্রে ধরাও পড়ে। ছোটরা একটি ছারপোকা মারলে সে খবর ফলাও ক'রে খবরের কাগজে বের হয়। বড়রা সিংহ-ব্যাঘ্র, হাতী গণ্ডার প্রভৃতি মারলেও তাদের বিদ্যার দাপটে, তাদের সাহিত্যের জৌলুসে, তাদের কাব্যের তরঙ্গে, তাদের শিল্প-কলার মাধুর্য্যে, তাদের বাক্‌-চাতুরির নৈপুণ্যে সব পাপ, সব অপরাধ, সব অন্যায় ঢাকা প'ড়ে যায়, চাপা প'ড়ে থাকে। বাহিরে থেকে মনে হয় এঁরা দেশকে রূপে-রসে, শব্দে-গন্ধে, পবিত্রতার ও পেলবতায়, স্নিগ্ধ হ'তেও স্নিগ্ধতর, সুন্দর হ'তেও সুন্দরতর ক'রে তুলবেন কিন্তু জাতির সার্ব্বাঙ্গিক ক্ষয় বা হাড়-ভাঙ্গা-রোগ তাতে প্রশমিত হয় না। জাতির কল্যাণ-কর্ম্মীদের মধ্যে যাঁরা সর্ব্বসাধারণের প্রাণে নির্ব্বিদ্বেষ ঈশ্বর-বিশ্বাস স্থাপন ক'রে যেতে পারেন, তাঁরাই সত্যি সত্যি জাতির ও জগতের কুশল সম্পাদন করেন।

পুপুন্‌কী আশ্রম
২০শে পৌষ, সোমবার, ১৩৪৩
(৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৩৭)

শিক্ষা-গুরু

হাওড়া-নিবাসী জনৈক পত্রপ্রেরকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—"সদাচার শিক্ষার জন্য বহু গুরু হইতে পারে। তাহাকেই শিক্ষা-গুরু বলে। যেখানে যে ব্যক্তিকে দেখিবে তোমার চেয়ে উৎকৃষ্ট জীবন-যাপন করিতেছেন, অমনি তাঁহার চরিত্রের ও আচরণের শ্রেষ্ঠ অংশটুকু নিজ চরিত্রে ও আচরণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চেষ্টার নাম শিক্ষা-গুরু গ্রহণ। মন্ত্রদান বা পুনর্দীক্ষাদান শিক্ষা-গুরুর কর্ত্তব্য নহে, প্রয়োজনও নহে। এই জন্যই অবধূতের অসংখ্য গুরু ছিলেন। বক, ভেক, কুক্কুর, ব্যাধ প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর জীবের নিকট হইতে আমাদের শিক্ষণীয় রহিয়াছে। অতএব, যখনি ইঁহাদের চরিত্রের ও আচরণের শ্রেষ্ঠ অংশের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইব, তখনি ইঁহারা শিক্ষা-গুরু। কিন্তু ইঁহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে মন্ত্র-গ্রহণ এক প্রকারের আধ্যাত্মিক বেশ্যাবৃত্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। স্ত্রী যেমন শ্বশুর, ভাসুর, দেবর, গৃহাগত অতিথি সকলেরই সেবা করে, কিন্তু স্বামী ব্যতীত অপরের শয্যায় শয়ন করে না, তদ্রূপ উন্নতিলিপ্সু সাধক-ব্যক্তি প্রত্যেক মহাপুরুষেরই সেবা-পূজা দ্বারা নিজের মধ্যে তাঁহাদের জীবনের

সদ্‌গুণ-সমূহকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু কাহারও নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে না। কিন্তু পল্লীগ্রামে শিক্ষা-গুরু নামে এক প্রকারের ধর্ম্ম-যাজকেরা অন্যত্র দীক্ষিত নরনারীদের লইয়া যাহা করিতেছেন, তাহা প্রকৃত-প্রস্তাবে গুরুগিরির এক অতি উৎকট ও নিরতিশয় আপত্তি-জনক কদর্য্য ব্যভিচার ও অসঙ্গত ব্যাপার মাত্র। যে নাম পাইয়াছ, নিষ্ঠা নিয়া লাগিয়া থাক। ঐ নামের মধ্য দিয়াই জীবনের পূর্ণ শান্তি অর্জ্জন করিতে পারিবে। দশ দিকে যে মন দেয়, সে নিজের পায়ে কুঠারাঘাতই করে। বহু জনকে যে নিজ-বল্লভ বলিয়া জ্ঞান করে, তার অবস্থা আর বাজারের গণিকার অবস্থার অধিক তফাৎ নাই,—বহু পথে পাদচারণা করিতে যে ব্যগ্রতা অনুভব করে, তার মত দুর্ভাগা ব্যক্তিও কেহ হইতে পারে না। এক জায়গাতেই কূপ খনন করিতে থাক, কালক্রমে জলের আস্বাদন পাইবেই।"

পতেঙ্গা, সমুদ্রতীর
২৮শে মাঘ, বুধবার,১৩৪৩
(১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৭)

একটী প্রাণীও যেন বাদ নাহি যায়

নোয়াখালি জেলান্তর্গত রাজগঞ্জ-নিবাসী জনৈক ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমরা যে সুমহৎ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছ, তাহা জয়যুক্ত হউক। এই প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া তোমরা দিকে দিকে জড়বুদ্ধি নরনারীর প্রাণে চেতনা ও ভগবৎ-সাধনের জন্য তীব্র ব্যকুলতা সৃষ্টি করিতে থাক। একটী প্রাণীও যেন অসাধক না থাকে। প্রত্যেকের অন্তরে তপস্যার তীব্র উন্মাদনা সৃষ্টি কর।

"প্রাণমন সমর্পণ করিয়া কীর্ত্তন করিবে। সকল নির্জ্জীব প্রাণ সজীব করিয়া কীর্ত্তন করিবে। সকলকে সকল কার্য্যে সাদরে আহ্বান করিবে। প্রত্যেককে তনুমন সমর্পণের সুযোগ দিবে। নিজেকে ছোট ও অপ্রধান রাখিবে। ইহাই প্রকৃত সেবকের লক্ষণ। সেবক কখনও যশোমান, কর্তৃত্ব বা প্রশংসা চাহে না, প্রতিষ্ঠাকে সে শূকরী-বিষ্ঠা জ্ঞান করিয়া বর্জ্জন করে।"

পতেঙ্গা, সমুদ্রতীর
২৯শে মাঘ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪৩
(১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৭)

বাংলার বাহিরে প্রবাসী জনৈক নব-বিবাহিতকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"Give your wife the best possible thought, and share with her an endeavour to spirtualise yourself. Whenever sexual intercourses be needful, try to impress on your mind that this has a spiritual purpose and a spiritual bearing. Don't invite her to

any physical intimacies of the extreme type before you have cultivated a deep friendship between yourselves. When you enjoy the wife's company, be thinking that through her you are getting in touch with the master of your soul, who enjoys Himself through you in her, the same idea should pervade throughout her whole existence also".

(বঙ্গানুবাদ)

তোমার পত্নীকে সর্ব্বোত্তম বিচার-ধারার সহিত পরিচিত করাইও এবং তাহার সাহচর্য্যে নিজেদিগকে দিব্যায়িত করিবার চেষ্টায় উভয়ে নিয়োজিত হইও। যখনই যৌন-মিলনের প্রয়োজন অনুভূত হইবে, তখনই উপলব্ধি করিতে প্রয়াস করিবে যে, ইহার এক আধ্যাত্মিক প্রয়োজন এবং এক অপার্থিব অভিপ্রায় আছে। তাহার সহিত নিবিড় মৈত্রী স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে তাহাকে কখনও চরম দৈহিক সম্বন্ধের জন্য আকর্ষণ করিও না। স্ত্রীসঙ্গ উপভোগ করিবার কালে সর্ব্বদা মনে মনে চিন্তা করিবে, তুমি তোমার হৃদয়াধিপতির সহিত অভিন্ন-রূপে অবস্থান করিতেছ এবং সেই পরমপ্রভুই তোমার মধ্য দিয়া তোমার পত্নীর সহিত রমণ করিতেছেন, তাহারও সমগ্র সত্তার মধ্যে সেই প্রত্যয়ই সমভাবে ব্যপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত চুরিয়া (ডোঙ্গরগড়)-নিবাসী জনৈক নববিবাহিত যুবক সন্তানকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"I desire that you should write regular letters to your newly married wife specially dealing with high and noble topics. She is almost a disciple to you. By instructing her, you will improve yourself. It is for this reason that I did entrust you with the care of boys during your earlier days. Now you have got your constant companion through life. Be up and doing in elevating yourself by trying to elevate her.

"Sorry that B—has proved worthless in complying with similar instructions for maintaining a series of inspiring letters to his wife. His wife is not only cultured, but also beautiful to the very core both in body and mind, untarnished and uncontaminated by the evils of the undesirable civilisation, and this was the soil that would yield the heaviest crop if only the seeds were sown. But he has

utterly failed in being able to infuse any spirit in his letters, all to my entire surprise and great dismay. He has lost the fire in his pen only because he has lost the fire in his heart. I only sigh at my by–gone days when I worked for tremendous jobs even at the cost of everything on earth. Still I hope for the future. I believe at least you will stand by me in my mission to carry out a scheme of purifying the atmosphere.

(বঙ্গানুবাদ)

আমি চাহি যে, তুমি তোমার নববিবাহিতা পত্নীকে উচ্চভাব ও মহচ্চিন্তা-মূলক বিষয়গুলি লইয়া সর্ব্বদা পত্র লিখিবে। তাহাকে তোমার প্রিয়শিষ্যা বলিয়া মনে করিবে। তাহাকে শিক্ষাদান করিয়া তুমি স্বীয় অভ্যুন্নতি লাভ করিবে। এই কারণেই তোমার প্রথম বয়সে আমি তোমাকে বালকদিগের শিক্ষাদান-কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছিলাম। এখন তুমি তোমার জীবনের সতত-সঙ্গিনী লাভ করিয়াছ। তাহার অভ্যুন্নতি-বিধানের জন্য বদ্ধপরিকর হও। তাহার উন্নতি-সাধনের দ্বারা নিজের অভ্যুন্নতি-সাধনে যত্নবান্ হও।

দুঃখের বিষয় ব—তাহার পত্নীর নিকট অনুপ্রেরণামূলক পত্রধারা লিখিবার ব্যাপারে অনুরূপ নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া

অপদার্থতার পরিচয় দিয়াছে। তাহার পত্নী শুধু বিদুষীই নহে, সে দেহে এবং মনের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত অত্যন্ত সুন্দর এবং বর্ত্তমান অসার ও অবাঞ্ছিত সভ্যতার অশুভ প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও নিষ্কলঙ্ক-স্বভাবা। উপযুক্ত বীজ বপন করিতে পারিলে উহা সমৃদ্ধতম ফলপ্রসব করিবার যোগ্যতম ক্ষেত্র। কিন্তু সে তাহার চিঠিপত্রের দ্বারা পত্নীকে উচ্চভাবে অনুপ্রাণিত করিতে অপারগ হইয়াছে। ইহাতে আমি যুগপৎ বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছি। তাহার লেখনী অনলশূন্য হইয়া পড়িয়াছে, কারণ, তাহার হৃদয়ের অনল নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে। যখন আমি পার্থিব সর্ব্বস্বের বিনিময়েও বিরাট বিরাট কর্ম্মযজ্ঞে ঝাঁপাইয়া পড়িতাম, সেই বিগত দিনের কথা স্মরণ করিয়া শুধু দীর্ঘশ্বাস মোচন করি। তথাপি আমি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাশীল এবং আমার বিশ্বাস এই উদ্দেশ্য-সাধনের প্রচেষ্টায় তুমি আমার পাশে দাঁড়াইয়া বাতাবরণের শুদ্ধিকরণ-সংসাধনে সর্ব্বান্তঃকরণে সহযোগ প্রদান করিবে।

পতেঙ্গা, সমুদ্রতীর,
৩০শে মাঘ, শুক্রবার, ১৩৪৩
(১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৭)

স্বপ্ন-বিকার

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত বহরিয়া-নিবাসী জনৈক যুবকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"স্বপ্নবিকারের জন্য মোটেই দুশ্চিন্তা করিও না। স্বপ্ন-

বিকার যদি এই জন্মেও না সারে, তবে তাহাতে তোমার কি? তুমি এই সব উৎপাত সত্ত্বেও অবিরাম মধুময় শ্রীভগবানের নাম জপিয়া যাইতে থাক। এই জন্মে উপযুক্ত দেহ পাও নাই, তার জন্য বৃথা অনুতাপ করিও না। অতীতে শরীরের অপব্যবহার করিয়াছ, এখন তার জন্য কাঁদিয়া সময় কাটাইলেও লাভ হইবে না। এই জন্ম যদি বৃথা গিয়া থাকে, তবে আগামী জন্মের জন্য তৈরী হও। দেহের উপর দিয়া যত উৎপাতই যাউক, মনকে অবিরাম ভগবন্মুখী করিবার জন্য চেষ্টা কর। এই সুমহতী চেষ্টা করিতে করিতে যদি জীবন শেষ হইয়া যায়, তবে জানিবে, তাহার ফলে আগামী জন্মে পরম মঙ্গলময়কে পাইবার যোগ্য দেহ, মন, সুযোগ ও রুচি নিয়া আবির্ভূত হইবে। এই জন্মেই ভগবানকে না পাও, পরজন্মে বা কোটি জন্ম পরে হইলেও ত' পাইবে! তিনি তোমার, তুমি তাঁর। হতাশ হইবার কি আছে বাবা?"

আধ্যাত্মিক পিপাসা

ঢাকা জেলান্তর্গত লৌহজং হাইস্কুলের জনৈক ছাত্রের নিকট শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ভগবৎ কৃপায়ই তোমার প্রাণে আধ্যাত্মিক পিপাসা জাগিয়াছে। এই পিপাসা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হউক, এই আশীর্ব্বাদ করি। সত্য, সংযম, সাধনা তোমার জীবনের মূলমন্ত্র হউক। সাধনা করিলে সংযম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, সংযম প্রতিষ্ঠিত হইলে সত্য-লাভ সহজতর হয়। তোমার জীবন ক্রমশঃ এই তিনটী

পরমকল্যাণের সহিত দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হউক, তোমার জীবন পূর্ণ হউক, পবিত্র হউক, প্রাণবন্ত হউক।"

মহাপুরুষদের মহত্ত্বকে স্মরণ

শ্রীহট্ট জেলান্তর্গত কাণেহাত (ছপাকান) নিবাসী জনৈক যুবককে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—"মহাপুরুষদের চরিত্রের ত্যাগ ও সংযমের কথা মনে মনে আলোচনা কর। "তুমি সংযত ও পবিত্র থাকিবে", এই সচ্চিন্তার দিবারাত্রি অনুশীলন কর। মহৎ কার্য্যের মধ্যে নিজের সমগ্র কর্ম্মশক্তিকে নিমজ্জিত কর। কামরিপু আপনিই পরাজিত হইবে।

স্বপ্নযোগ বীর্য্যক্ষয়ের জন্য দুশ্চিন্তা করিও না। যাহা যাইবার যাউক। মলমূত্র ত্যাগের পরে কি কেহ দুঃখ করে? তদ্রূপ ভাবিবে। ইচ্ছা করিয়া যখন বীর্য্যক্ষয় কর নাই, তখন আর অনুতাপ কেন? নিজেকে দেহে মনে পবিত্র রাখিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা কর এবং নিষ্কাম ভাবে সেই চেষ্টার ফলাফল ভগবানে অর্পণ কর। দিবা ভাগে বা রজনীকালে ইচ্ছাপূর্ব্বক কোনও কদর্য্য চিন্তা করিও না বা কদর্য্য কার্য্যে নিজের দেহ, মন, বাক্যকে নিয়োজিত হইতে দিও না।"

উপাসনা তোমাকে করিতেই হইবে

বরিশাল-নিবাসিনী জনৈক মহিলা-ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"উপাসনা কর না? আমার ইচ্ছা, তুমি উপাসনা কর। উপাসনা করিতে জান না বলিয়া ত' ? জানিতে হয় না মা। মানুষের অন্তরের ভিতরে উপাসনার মূলমন্ত্র গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে। নিজেকে বিশ্বাত্মার সহিত যুক্ত করিবার চেষ্টারই নাম উপাসনা। এখন আর্ত্ত ভাবেই তাহা হউক, প্রার্থী ভাবেই তাহা হউক বা প্রেম-ভাবেই হউক। নিজেকে ভগবানের পায়ে লুটাইয়া দিবার চেষ্টারই নাম উপাসনা। গীতা বা চণ্ডী পাঠ করিলেই উপাসনা হয় না, মনোযোগ ও ভক্তি সহকারে গীতা বা চণ্ডী পাঠ করিলে উপাসনায় একাগ্রতা হয়। আপাততঃ এইটুকু অন্তরে সুন্দর রূপে উপলব্ধি করিয়া লইয়া তোমার মন যে ভাবে রুচি পায়, সেই ভাবে উপাসনা করিতে থাক।

"মেয়েলোকের আত্মা নাই, একথা বলে বর্ব্বরে। আত্মা না থাকিলে গার্গী, মৈত্রেয়ী, বিশ্ববারা, দেবহূতি, ইহারা কি ছিলেন শুধু গাছ আর পাথর? গোঁড়ারা শালগ্রাম-শিলা স্ত্রীলোককে ছুঁইতে দেন না। কিন্তু ইহা তাঁহাদের ভ্রম মাত্র। অনেকে স্ত্রীলোককে ওঙ্কার ও গায়ত্রী উচ্চারণে বাধা দেন। ইহাও অজ্ঞানতাই মাত্র। এসব কুসংস্কারকে মানিও না। তবে কাহারও শালগ্রাম-শিলা তুমি ছুঁইলে যদি সে মনে ব্যথা পায়, তাহা হইলে তাহাকে ব্যথা দিতে বিরত থাকিও। এই পর্য্যন্তই।"

মদ্যপান বর্জ্জন

জনৈক জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—

লোকটী সুরাপান ক'রে ক'রে শরীর মনের সর্ব্বনাশের সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যকেও চিরতরে নষ্ট ক'রে দিচ্ছে, জানার পরে তোমাদের কারো আর চুপ ক'রে থাকা উচিত নয়। মদ্যপান কেউ একা একা শিখে না, সঙ্গী-সাথীদের পাল্লায় প'ড়েই এই পথে লোকে গোল্লায় যায়। সুতরাং একটী মাতালকে সংশোধন কত্তে হ'লে তার সঙ্গী ও সাথীদের মধ্যেই কাজ কত্তে হবে। একাজ প্রত্যক্ষ ভাবে কত্তে যাওয়ার অনেক অসুবিধা আছে। "ওরে মাতাল" ব'লে তুমি কদাচ কাউকে সম্বোধন কত্তে পার না। "মদ খেয়ে পয়সা নষ্ট কচ্ছ কেন" ব'লে কাউকে তুমি ধমকাতে পার না। অশান্তি, উৎপাত, উপদ্রব ও কলহ-বৃদ্ধির ভয়েই তোমাকে অন্য পথ নিতে হবে। সেইটী হচ্ছে, একটী দুটী লোকের জন্যই সমগ্র শহরব্যাপী বা সমগ্র অঞ্চলব্যাপী মদ্যপানবিরোধী আন্দোলন সৃষ্টি কত্তে হবে। বিলাতে বা আমেরিকায় শত শত সুরাপান-নিবারণী সভা আছে, যাঁরা ধারাবাহিক ভাবে নিজ নিজ অঞ্চলব্যাপী মদ্যপান-নিরোধক বিরাট বিরাট আন্দোলন চালান। সেই তুলনায় আমাদের দেশ একেবারেই অন্ধ ব'লে বল্‌তে পারি। অথচ এই দেশেই, সম্ভবত দশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে, শাস্ত্র রচিত হয়েছিল যে, মদ্য যে বিক্রয় করে, তার স্পর্শ করা জলও পান কর্ব্বে না। কিছু কিছু লোক কতক দিন ক'রে কোনো কোনো স্থানে মদ্য-বর্জ্জন-অন্দোলনকে অনুশীলন করার চেষ্টা করার পরে নানা রূপ অভিজ্ঞতা

লাভের ফলে হয়ত সহজে আবিষ্কার হবে যে, এই আন্দোলনকে ভবিষ্যতে কি ভাবে পরিচালন কর্ল্লে প্রকৃত সফলতা লাভ হবে। গরীব লোকেরা অনেকে মদ খায় ক্ষুধার জ্বালা ভুলে থাকার জন্য। সম্পদশালী লোকেরা অনেকে মদ খায় নিজেদের পশুস্বভাব-প্রণোদিত কুকার্য্যগুলি নির্ল্লজ্জভাবে ক'রে যাওয়ার অবাধ মানসিক স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য। দোকানদারেরা মদ বেচে পয়সা উপার্জ্জনের জন্য। গণিকারা মদ্যপান করে ও পান করায় তাদের সাময়িক প্রণয়ীদের মনোরঞ্জনের জন্য। এইরূপ নানা জনে নানা কারণে মদ খায় বা বেচে। তান্ত্রিকেরা অনেকে মদ খায় তথাকথিত ধর্ম্মাচরণের জন্য। তান্ত্রিকদের এই বীভৎসতার নিন্দা খ্রীষ্টান মিশনারীরা অনেকেই শত মুখে করেছেন কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে, ভারতে খ্রীষ্টান-মিশনারীদের শুভাগমনের পর থেকে এদেশে ভদ্রবেশে যে পরিমাণ মদ্যপানাসক্তির প্রাবল্য ঘটেছে, তা মোঘল-পাঠান-যুগের মধ্যাহ্ন কালেও লক্ষ্য করা যায় নি। পাশ্চাত্য মদ্যপায়ীরা ভারতবর্ষের মদ্যের প্রচলন-বৃদ্ধির ব্যাপারে কল্পনাতীত অবদান রেখেছেন ব'লে অনেকেই তাঁদের ধিক্কার দিচ্ছেন। হয়ত, সেই ধিক্কার অমূলক নয়। ভোগবিলাসের প্রতি জাতির দৃষ্টি যত অবাধ হবে, আনুষঙ্গিক পাপ-রূপে মদিরা ততকাল ষোড়শোপচারে পূজিত হবে। সুতরাং পাশ্চাত্য ভোগবাদ বা ভারতীয় ভোগবাদের নানা সংস্করণের নানা দার্শনিক মতবাদের উপরে খড়্গাঘাত করার যোগ্য ধ্যানী

চিন্তাশীলদের এই সময়ে কাজে লাগাতে হবে। মদের দোকানের সংখ্যাবৃদ্ধিতে রাজ্য-সরকারের অর্থাগমবৃদ্ধি ঘটে। সুতরাং গুরুতর কারণ না ঘটলে সরকার নিজেরা অগ্রণী হ'য়ে দেশ থেকে মদ্যপান তুলে দেবেন বা দিতে পার্ব্বেন, এটা মনে করা যায় না। ভোগবাদীদের হাতে রাজশক্তি ন্যস্ত হ'লে বরং এর বিপরীত ঘটনাই ঘটতে পারে। চারিত্রিক দুর্নীতির প্রাদুর্ভাব ঘটাতে মদ আর জুয়াখেলার জুড়ী আর কোনও বস্তু নেই। এর প্রকৃত এবং প্রত্যক্ষ প্রতীকার চিরকালই দেশের সরকারের হাতে থাকে এবং থাক্‌বে।

মদ্যপানের পরোক্ষ প্রতীকার

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তাই ব'লে কি বলতে হবে যে, এর পরোক্ষ প্রতীকারে আমরা যত্ন নিব না? নিশ্চয়ই নিব। বল্‌বে, উপায় কি? আমি উপায় ব'লে দিচ্ছি। একটী নির্দ্দিষ্ট মদ্যপায়ীকে মনে মনে ঠিক ক'রে ফেল। মাত্র পাঁচটী বন্ধুতে মিলে সঙ্কল্প কর যে, এই লোকটীর মদ্যপান-রুচি নাশ করার জন্য তোমরা কাজ কর্ব্বে। নিজেদের সংখ্যা কিছুতেই পাঁচের বেশী হ'তে দিও না এবং এই সঙ্কল্পের কথা বাইরে ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ কর্ব্বে না। প্রত্যহ একই নির্দ্দিষ্ট সময়ে পাঁচ জনে একটী নিভৃত স্থানে বসবে, অর্দ্ধ ঘণ্টা নামজপ কর্ব্বে। তারপরেই মনে মনে সঙ্কল্প কত্তে থাকবে,—"হে অমুক, তুমি মদ্যপান ছাড়।" পনের মিনিট এই সঙ্কল্পটা ক'রে কিছুক্ষণ

নাম-কীর্ত্তন ক'রে নিজ নিজ ঘরে ফিরবে। যার চরিত্র-সংশোধনের জন্য কাজটুকু কচ্ছ, তাকে বা তার কোনও আত্মীয়কে এই বিষয় ঘুণাক্ষরেও জানতে দেবে না। কিছুকাল করার পরে দেখ্‌তে পাবে, লোকটীর চরিত্রের পরিবর্ত্তন সত্য সত্যই আরম্ভ হয়েছে।

উত্তেজনাহীন কাজ

অপর এক জিজ্ঞাসু প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যে সৎকাজটুকু তুমি করবে ব'লে মনে মনে স্থির করেছ, তাকে যতটা সম্ভব, উত্তেজনাহীন ভাবে কর্ব্বার চেষ্টা ক'রো। উত্তেজিত মন নিয়ে কাজ কর্ম্মে অনেক সময়ে কাজে এমন অনেক ভুল-ত্রুটি এসে যায়, যা অবশ্যই এড়ানো যেত। অত্যধিক গোঁয়ারের মনোভাব নিয়ে কাজ কত্তে গেলে অনেক সময়ে সহকর্ম্মীদের সঙ্গে বিরোধ আসে এবং তার পরিণাম হচ্ছে কর্ম্মের গতি-শৈথিল্য। অত্যধিক আশাশীলতা নিয়ে কাজ কর্ম্মে, কাজের সতর্কতার দিক্‌গুলি অবহেলিত হয়, ফলে কর্ম্মের বিপরীত প্রতিক্রিয়ার দিকটা প্রবলতর হওয়ার সম্ভাবনা জন্মে। অত্যধিক আশাহীনতার দ্বারা প্রভাবিত হ'য়ে কাজে নাম্‌লে প্রায় প্রতি পদে আত্মবিশ্বাসহীনতা এসে যেতে থাকে এবং পরিণামে অসাফল্য উৎপাদন করে। যে কাজে হাত দিয়েছ, ধীরে হোক্ দ্রুত হোক সে কাজ চালিয়েই যে যাবে, মধ্যপথে ছেড়ে দেবে না, এই পণ নিয়ে কাজ কর।

পতেঙ্গা, সমুদ্রতীর
২রা ফাল্গুন, রবিবার, ১৩৪৩
(১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৭)

নামে ডোব

হাওড়া-নিবাসী জনৈক পত্রপ্রেরকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন—

"অবিরাম পরম মঙ্গলময় নামের ভিতর নিজেকে ডুবাইয়া রাখিবে। জগতের সহস্র কোলাহল-সঙ্কুল আসক্তি-মূলক ব্যাপার-সমূহ হইতে নিজের চিত্তকে সর্ব্বতোভাবে বিযুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা পাইও। ইহ-জীবনের ক্ষুদ্র সুখ শারীরিক শ্রমের দ্বারাই সাধিত হইতে পারে। কিন্তু ইহা-পর-জীবনের অনন্তসুখ অবিরাম মনকে ভগবানে সংলগ্ন রাখার মধ্য দিয়াই লাভ হইবে।"

শূদ্র ও ব্রাহ্মণের জাতি-নির্ণয়-বিচার

নোয়াখালীর অন্তর্গত ব্রহ্মপুর-হুগলী-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"জন্মমাত্র জীব শূদ্র হয়, সৎসংস্কার দ্বারা দ্বিজ হয়। একথা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। অর্থাৎ জন্মকালে জীব অজ্ঞানে থাকে, অজ্ঞানতাই শূদ্রতা এবং মহৎ জীবনের দীক্ষা-গ্রহণের দ্বারা সে নবজন্ম প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ জ্ঞানী হয়। জ্ঞানই ব্রাহ্মণত্ব,

অতএব ব্রাহ্মণত্বের প্রকৃত নির্ণায়ক জ্ঞান বা দিব্যানুভূতি। জন্মদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন জাতি বলিয়া গণিত হইলেও জ্ঞান লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত সবাই শূদ্রই থাকে।

"তথাপি জন্ম-দ্বারাই বহুকাল ধরিয়া জাতি-নির্ণয়ের প্রথা চলিয়া আসিতেছে। এই প্রথার সাংসারিক ভাল ও মন্দ দুই দিকই আছে। তাহা এস্থলে আলোচনা করিব না। কিন্তু মহৎ-সঙ্কল্পের দীক্ষা-দ্বারা সকলেরই সত্য জ্ঞান লাভের পথ খুলিয়া যায়। অতএব, এক মন্ত্রে দীক্ষা লইলে সকলের এক জাতিত্ব অর্থাৎ জ্ঞানিত্ব লাভের পন্থা খুলিয়া যায় ইহা অবশ্য-স্বীকার্য্য। কিন্তু একমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণের পরে যদি কেহ সাধন না করে, তাহা হইলে সে কখনো সত্যকে লাভও করে না এবং সত্য লাভকারীদের সহিত সমত্বও অর্জ্জন করিতে পারে না।

"আমার ত' ইচ্ছা নহে যে, আমার নিকট দীক্ষিত শিষ্যরা ভিন্ন ভিন্ন সমাজ বা জাতির লোক হইলেও নিজেদিগকে পৃথক্ পৃথক্ জাতির লোক বলিয়া মনে করুক। তাহাদের জীবনে, ব্যবহারে, আচারে, আদর্শে, শৃঙ্খলায় ও শোভনতায় সকল দিক দিয়া একজাতিত্ব বা সমত্বই প্রকটিত হউক, ইহাই ত' আমি কামনা করি। কিন্তু সকলে মিলিয়া অজ্ঞান থাকিয়া এক শূদ্র-জাতিতে পরিণত হউক, ইহা আমি চাই না। সকলেই এক মহাজাতিতে সংগঠিত হউক এবং সেই জাতি হউক দেবজাতি বা ব্রাহ্মণ।

দ্রুত অসবর্ণাদি বিবাহের প্রচলনের চেষ্টা করিলে সমাজ-মস্তিষ্কের চিন্তাশক্তি এত অধিক পরিমাণে সামাজিক কলহ-

কোলাহলের মধ্যে ব্যয়িত হইতে বাধ্য হইবে যে, শূদ্রের আভ্যন্তরীণ ব্রাহ্মণত্ব সম্পাদনের সাধনা করিবার সময়, সুযোগ ও রুচি অধিক থাকিবে না। আবার আবশ্যকীয় স্থলে অসবর্ণাদি বিবাহকে প্রশ্রয় না দিতে গেলেও বর্ত্তমান সমাজের পক্ষাঘাতগ্রস্ত বহু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে অনেক দুষ্টব্রণ সৃষ্টির সুযোগ করিয়া দিয়া সমাজকে সমূলে নির্ম্মূল হইয়া যাইবার আনুকূল্য প্রদান করা হইবে। সুতরাং এই বিষয়ে মধ্যপন্থার আশ্রয়ই আপাতত দেশ ও সমাজকে অন্ততঃ করিতে হইবে। কিন্তু যে দিক দিয়াই সমাজের ভিতরে যেরূপ সাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হউক না কেন, দেবত্ব বা ব্রাহ্মণ্যের চরম লক্ষ্যে নিষ্ঠা হারাইয়া অগ্রসর হইলে কোনও দিক্ দিয়াই মঙ্গল নাই।

আমি চাহি না, আমার সন্তান-সন্ততিগণের মধ্যে একজনও সাধনহীন থাকুক। তপস্যার আলোকে নিজেদের পথ তাহারা নিজেরাই দেখিতে পাইবে। আমাকে প্রত্যেক কথারই উত্তর চিঠি লিখিয়া বা বক্তৃতা দিয়া দিতে হইবে না। আমার আবাল্য সঞ্চিত শুদ্ধ ইচ্ছা তোমাদের ইচ্ছাকে তপস্যার পথে, সাধনার দিকে, চিত্তশুদ্ধির প্রতি, আত্মোৎকর্ষের জন্য উৎসাহিত, প্রণোদিত ও অগ্রগতি-সম্পন্ন করুক।"

সামার্থ্য, দায়িত্ব, ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতা

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত গোঁসাইপুর-নিবাসী, কাছাড় শিলচর-প্রবাসী জনৈক ভক্ত সন্তানকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যদিও আমার অসুস্থতা অত্যন্ত কঠিন, তথাপি তোমরা আমার জন্য চিন্তিত হইও না। জগৎকল্যাণের জন্য যতকাল দেহের আবশ্যকতা, ততকাল দেহ থাকিবেই। যখন জগৎকল্যাণের জন্য দেহ অযোগ্য হইবে, তখন ছেঁড়া কাগজের টুক্‌রার ন্যায় ইহা ঝড়ের বাতাসে উড়িয়া যাইবে। ইহা বিধি-নির্দ্দিষ্ট বিধান। আমি এই জন্য কণামাত্রও চিন্তা করি না, তোমাদিগকেও চিন্তা করিতে নিষেধ করি।

"আমার সন্তানবৃন্দ আমার আরব্ধ জীবসেবার কর্ম্মের যোগ্য হইল না বলিয়াও যেমন দুঃখ করি না, যাহারা যোগ্য হইয়াও এই কার্য্যে আসিয়া আত্মনিয়োগ করিল না, তাহার জন্যও দুঃখ করি না। কেহ কেহ সত্যই জীবসেবার বুদ্ধি লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে নামিল, কিন্তু মাত্র ব্যক্তিত্ব-বুদ্ধির তাড়নায় সহকর্ম্মীদের সহিত এক মঞ্চে দাঁড়াইবার সুযোগ গ্রহণ করিল না। এই জন্যও দুঃখ করি না। কাজ করিবার শক্তি যার আছে, কাজ করিবার দায়িত্বও তার আছে। ভগবান্ সৎকাজের শক্তি যখন দিয়াছেন, তখন সেই শক্তিকে কাজে লাগাইবার অধিকার এবং কর্ত্তব্যও দিয়া দিয়াছেন। তৃণগুচ্ছকে আন্দোলিত করিবার ক্ষমতাটুকু যার আছে, সেও তার শক্তির সদ্ব্যবহার করিতে বাধ্য।

"আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটী এক চমৎকার পরিণতি পাইয়াছে। তৃণগুচ্ছ নাড়িবার ক্ষমতাটুকু যার, সে একক প্রযত্নে তৃণগুচ্ছ নাড়িয়াই নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করিল। সম্মিলিত হইয়া অপরাপর তৃণগুচ্ছ-আন্দোলনকারীদের সহিত নিরভিমান

প্রযত্ন দিলে যাহারা হিমাদ্রিশৃঙ্গ উপড়াইয়া আনিতে পারিত, তাহারা অতি ক্ষুদ্র, অতি তুচ্ছ, অতি নগণ্য প্রতিষ্ঠার পায়ে ব্যক্তিত্বের মোহে আত্মবলি দিয়া বিশাল জগতের প্রতি উপেক্ষার স্পর্দ্ধা প্রদর্শন করিতেছেন। কিন্তু ইহাতেও আমার দুঃখ নাই। কারণ, আমি জানি, আমার কাজ যাহারা করিবে, তাহারা আসিতেছে। আমার দেহ যদি ইহার মধ্যে খসিয়াও যায়, তবু তাহারা আমার জন্য আসিবে, আমার হইয়া খাটিবে। আজ আমি শত শত কর্ম্ম-সামর্থ্য-সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব-বুদ্ধির ক্রীতদাসদিগকে কর্ম্মক্ষেত্রে পাইয়াও পাইলাম না, এজন্য দুঃখ করি না।

"কথাগুলি কি লিখিতাম? নিশ্চয়ই না, কিন্তু তুমি তোমার পত্রে সে বিষয় লইয়াই বড় দুঃখ করিয়াছ বাবা। কাহারও জন্যই জগতের শুদ্ধ সেবা আটক হইয়া থাকে না। সময় হলে কাজের লোক আসিয়াই যায়। আবাল্য-সঞ্চিত জীবকল্যাণেচ্ছা আমার কোনও ব্যক্তি-বিশেষের ত্যাগ বা ভোগের সহিত সম্পর্কান্বিত নহে। আমি আমার ইচ্ছার শুদ্ধতাতেই বিশ্বাসী, তাই স্থির রূপে জানি, আমার কর্ম্মী আমার কাছে আসিবেই। আমার নিকট দীক্ষিত হইলেই সে আমার কর্ম্মী হইবে, এমন কোনও কথা নাই। অবশ্য, যদি সে হয়, তবে কর্ম্মসাধনার ভিতর দিয়া তাহার ধর্ম্ম-সাধনা সহজতর হইবে। ইহা তাহার পক্ষেই সুবিধাজনক, আমার পক্ষে সুবিধা বা অসুবিধা কিছুরই উৎপাদক নহে। ব্যক্তিগত প্রেরণায় নিজেকে সংহত-চেষ্ট হইতে দূরে রাখিয়া চিত্তশুদ্ধি

অর্জ্জন করা প্রত্যেকের পক্ষেই সম্ভব, অতএব ব্যক্তিত্বাভিমানীও যদি নিজ আরব্ধ ক্ষুদ্র কার্য্যের ভিতর দিয়া চিত্তশুদ্ধিকেই অন্বেষণ করে, তবে তাহাও প্রকৃত-প্রস্তাবে তাহার কল্যাণেরই হেতু হইবে। কিন্তু দুঃখার্ত্ত জগতের বৃহত্তম বা সার্থকতম সেবার সহিত নিজেকে যুক্ত করিয়া যদি চিত্তশুদ্ধি কেহ চাহে, তবে তাহাকে ব্যক্তিত্বের মিথ্যা অভিমানে শতবার পদাঘাত করিয়া নিজের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা-বুদ্ধি আংশিক হইলেও খর্ব্ব করিয়া অপর দশ জন সমভাবের ভাবুকদের সহিত সম্মিলিত হইতে হইবে। ইহা আধুনিক যুগের কর্ম্ম-সাধনার প্রধানতম কথা। তোমাদের স্বাধীনতা তোমরা বিসর্জ্জন দাও, ইহা কখনও কাম্য বা আদেশের বিষয় হইতে পারে না। কিন্তু স্বেচ্ছায় যে ব্যক্তি সমাজহিতকল্পে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিবার শিক্ষা অর্জ্জন করিবে না, স্বাধীনতা পাইবার সে উপযুক্ত অধিকারী নহে এবং এই জন্য সর্ব্বকর্ম্মে ক্রমশঃ তাহার স্বাধীনতা আপনিই লুপ্ত হইবে। ইহা সার্ব্বভৌমিক সামাজিক সত্য।

অখণ্ড-সংহিতা চতুর্ব্বিংশ খণ্ড এখানেই শেষ হইল।

অখণ্ড-সংহিতা চতুর্ব্বিংশ খণ্ডের বর্ণানুক্রমিক সূচী-পত্র

(১)

হে প্রভো, করহ মোরে তেজোবীর্য্য দান,
বাহুতে অমিত শক্তি, বুকে ব্রহ্মজ্ঞান॥
দেহে, মনে প্রাণে তুমি হও আপনার,
কোমল পরশে দূর কর অন্ধকার॥
পরদুঃখে কর মোরে চঞ্চল অধীর।
নিজ দুঃখে রাখ মোরে অবিচল স্থির॥
অসত্য অধর্ম্ম হ'তে মুক্ত রাখ মোরে
মম চিত্ত বাঁধ তুমি তব প্রেম-ডোরে॥
কুবুদ্ধি কুমতি মম করহ দমন।
সর্ব্বজীবহিতে রত কর মোর মন॥
সৎসাহস দাও মোরে সম্পদে বিপদে।
বীরত্বে মণ্ডিত মোরে কর প্রতি পদে॥
নিজেরে জানিয়া প্রভো তোমারি কিঙ্কর,
কোটি বজ্রাঘাতে যেন নাহি পাই ডর॥
চরণারবিন্দে তব করি নমস্কার,
হে অমৃত, হে সুন্দর আনন্দ আমার।

---

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '১৭৭' নং গান।

(২)

যে আছ যেখানে নিখিল ভুবনে
নিকট অথবা দূর
এস হে সকলে; প্রাণ-ফুল-দলে
পূজা হবে শ্রীপ্রভুর॥

হবে উপাসনা শুভ উপচারে,
হৃদয়ের প্রীতি-ধন-সম্ভারে,
সবারে আনিয়া সকলেরে নিয়া
হব প্রেমে ভর-পুর॥

সকলের হৃদি স্নেহে ভ'রে দিব,
সকলের শত দুখ হ'রে নিব,
হরষ পরশে সরস দরশে
নাচিবে যে ব্যথাতুর॥

মুছিয়া যাইবে সকল অতীত,
ঘুচিয়া যাইবে অখিল অহিত,
প্রণব-মন্ত্রে প্রাণের যন্ত্রে
মূর্চ্ছনা সুমধুর,
জীবন জাগাবে;—উদ্ধার হবে
যত আছে সুরাসুর॥

---

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '৬' নং গান।

অখণ্ড-সঙ্গীত

খণ্ড আজিকে হোক্ অখণ্ড
অণু-পরমাণু মিলিত হোক্;
ব্যথিত পতিত দুঃখী দীনেরা
ভুলুক বেদনা, ভুলুক শোক।।
ছোট বড় সব এক হ'য়ে যাক্,
প্রাণে প্রাণে হোক্ নব অনুরাগ,
জীবে জীবে হোক্ প্রেম-বন্ধন,
সৃষ্ট হোক্ আনন্দ-লোক।।

দূরে থাকা আর চলিবে না,
জগতের কাছে আছে দেনা;
জনমে জনমে প্রাণ-বলি দিয়া
ফুটুক নয়নে বিমলালোক।।
অপগত হোক্ আত্ম-কলহ,
স্বার্থ-প্রসূত দুঃখ-নিবহ;
শরণ্য হোক্ ত্যাগের মন্ত্র,
ত্যাগেই অমৃত, নহেক ভোগ।।

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '৩৫৮' নং গান।

অখণ্ড সংহিতা

বা

চতুর্ব্বিংশ খণ্ড

শ্রী শ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের

উপদেশ - বাণী

অখণ্ড - সংহিতা

চতুর্ব্বিংশ খণ্ড

অখণ্ড সংহিতা

বা

চতুর্ব্বিংশ খণ্ড

শ্রী শ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের

উপদেশ - বাণী